কুমকুম

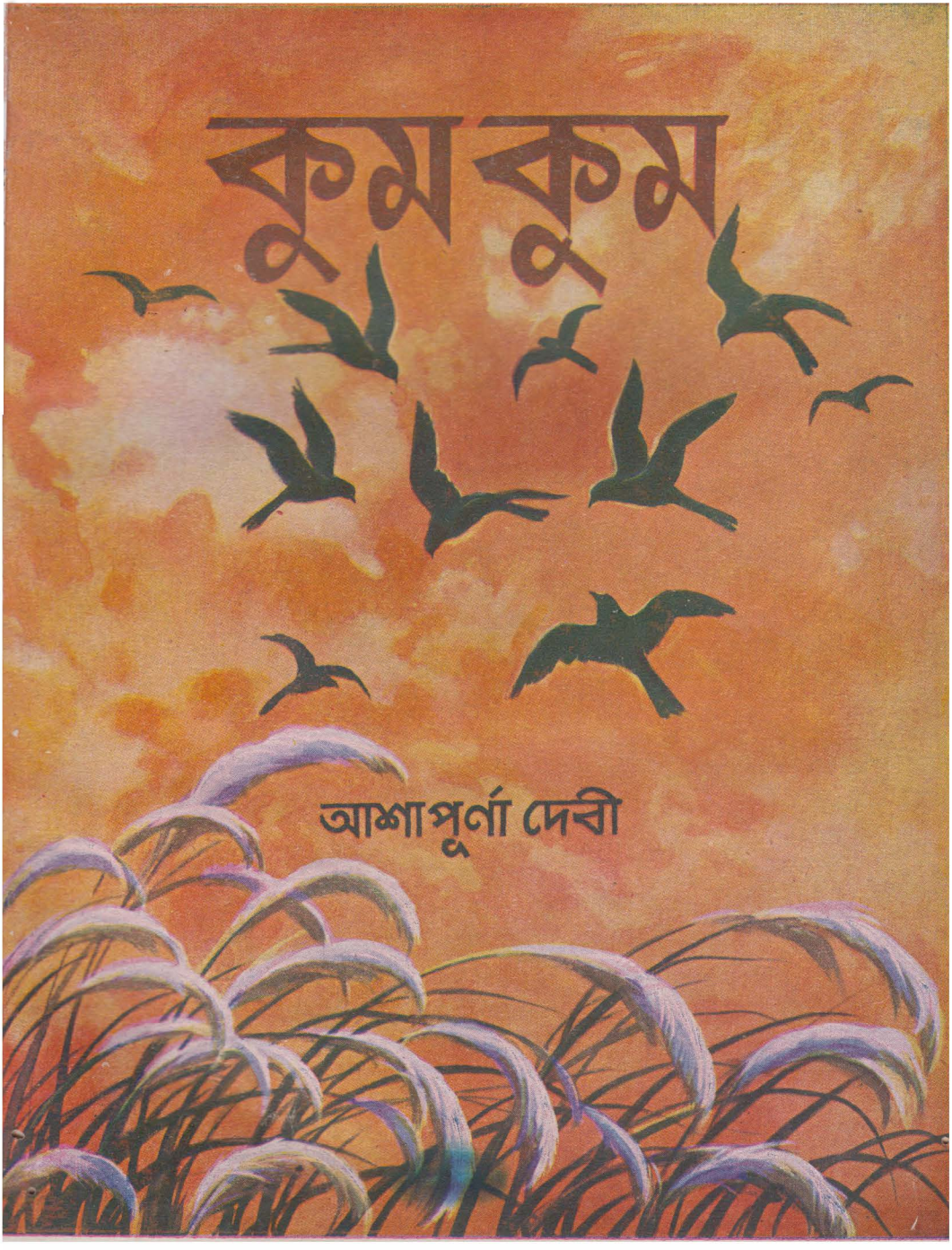

আশাপূর্ণা দেবী

কুমকুম—

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

মহালয়া
১৩৭৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
পাঁচ টাকা

উপহার

আমাদের কথা

দেখতে দেখতে শ্রাবণের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। কালো মেঘ রূপান্তরিত হচ্ছে শুভ্র মেঘে। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে অপূর্ব রং ধরেছে। কখনো বা' কালো মেঘ রূপান্তরিত হচ্ছে রক্ত-বর্ণে। সমস্তটা আকাশ দেখে মনে হচ্ছে কে যেন তাকে **কুমকুম** ছুড়ে মেরেছে। আবীরের গোলা ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে গেছে সারা আকাশে। কচি ছেলেমেয়ের দল তাই দেখে বলছে এইবারে বর্ষণ শুরু হবে।

প্রকৃতি জুড়ে চলেছে তাই শরতের খেলা। তার সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে বিশ্বজননীর আগমনীর গান। সকলকার মুখে সেই একই কথা "মা আসছেন"। এই আনন্দের সময় "দেব সাহিত্য-কুটীর"ও তাঁদের পূজোর ডালি নিয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রথম অর্ঘ্য—"**কুমকুম**"। লব্ধপ্রতিষ্ঠা সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর নানান ধরনের ছোট-গল্প নিয়ে এই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। "**কুমকুম**" যেমনি ছেলেমেয়েদের কাছে প্রিয়, তেমনি এই পুস্তকটিও তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে এই আমাদের আশা।

নিবেদক—

"দেব সাহিত্য-কুটীর"

মহালয়া—১৩৭৭

সূচীপত্র

গল্প		পৃষ্ঠা
১।	কিম্ভূতের পুঁথি	১
২।	ললাটের লিখন	১৩১
৩।	মজার জিনিস	১৪০
৪।	পেল্লাদ	১৪৯
৫।	কী হয় কী না হয়	১৬৩
৬।	মুক্তির উপায়	১৭৪
৭।	অবশেষে	১৮৭
৮।	লায়ন দি গ্রেট	২০১
৯।	ছাঁটা গোঁফ ও ঝাঁটা গোঁফ	২১৪
১০।	সেই পা	২২৫
১১।	জ্ঞানচক্ষু	২৪৯
১২।	মিস্টুর খুকু	২৫৬
১৩।	মায়ার অবতার	২৬১
১৪।	কারেক্ট ঘড়ি	২৭০
১৫।	বেচারা ননীগোপাল	২৭৮
১৬।	পাকা খেলোয়াড়	২৯২

চিত্রসূচী

● ত্রিবর্ণ চিত্র ●

পৃষ্ঠা

● **সেই পা**

নিধুমামা সিঁড়ি কাঁপাতে কাঁপাতে……চেঁচাতে চেঁচাতে নেমে এলেন ! ১

● **কিম্ভূতের পুঁথি**

এখন আমার ফেরার রাস্তাটা চিনিয়ে দাও……শুয়ে পড়িগে। … ৬৫

টুটু মার কোলে মুখ চেপে বলে, 'না'। … … … ১২৯

● **মজার জিনিস**

মিথ্যে বলব না, কষে একটা থাপ্পড় দিতে উঠিয়েছিলাম হাত … ১৪৫

● **মুক্তির উপায়**

তার ওপর জন বারো আরশোলা আর জন তিনেক ইঁদুর বসে। … ১৭৭

● **অবশেষে**

ফটো তুলছে বুঝতে না দিয়ে,—তুলে ফেললো কয়েকখানা ছবি … ১৯৩

● **লায়ন দি গ্রেট**

কুকুরকে যারা কুকুর বলে, তারা কত নীচ, কত নোংরা,… … ২০৯

● **মায়ার অবতার**

গোল গোল মোটাসোটা হাতটি ঘুরিয়ে বলে, আহা রে ! … ২৫৭

● **বেচারা ননীগোপাল**

একটুকরো একটুকরো কাগজ……বাড়িয়ে ধরে ধরে বলে,… … ২৮৯

হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লো লোকটা, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল।

এ স্টেশনটায় গাড়ি মাত্র এক মিনিট থামে, সেই এক মিনিটের পঞ্চান্ন সেকেণ্ড পার হয়ে গিয়েছিল শেষ পাঁচ সেকেণ্ডে এই ব্যাপার।

অবশ্য গাড়িতে একটা লোক উঠে পড়াকে টুটু কিছু ব্যাপার মনে করে না, লোকেরা চড়বে বলেই তো গাড়ি! ব্যাপার মনে করেন বরং টুটুর মামা।

মামার বাড়িতে যেতে আসতে বেশির ভাগ সময় তো মামার সঙ্গেই যায় টুটু, দেখেছে রেলগাড়িতে মামার মেজাজ! মামা গাড়িতে উঠে বসার পর আর কোনো প্রাণীর ওঠা যেন বেআইনী। মানে মামার মতে—মামার পর আর কারো গাড়িতে উঠে পড়া হচ্ছে অনধিকার প্রবেশ, জবরদখলের চেষ্টা, তপোবনের শান্তিভঙ্গ।

অতএব এই অন্যায়, অসহ্য আর অপছন্দকর ব্যাপারটার বিরুদ্ধে মামা ঘোরতর লড়াই শুরু করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি 'ব্যাপার'ই করে তোলেন! প্রায় দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

কুমকুম

এমন কি রেলপুলিসকেও ডাকতে হয় কখনো কখনো।

কিন্তু এখন তো টুটু মামার সঙ্গে যাচ্ছে না, যাচ্ছে বাবার সঙ্গে। যিনি নাকি কম কথার জন্যেই বিখ্যাত। টুটুর মা যদি একশোটা কথা বলেন তো টুটুর বাবা বলেন একটা।

আর টুটুর মাসী-মামারা বেড়াতে এলে, টুটুর বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে পালান। পালান অবশ্য কাজের ছুতো দেখিয়ে। শুধু যা টুটুর কাছেই সত্যি কথাটা বলে যান, 'ওরা এখন চার ভাই-বোনে গল্প করবে। আর প্রত্যেকেই তো আগে কথা কইতে চাইবে? তা হলেই বোঝ অবস্থা? সরে পড়ছি আমি। কানটা বাঁচাতে হবে তো!'

অবশ্য কান বা প্রাণ বাঁচাবার উপায় টুটুর বাবার হাতেই আছে। এই তো রেলগাড়িতে উঠে বসা মাত্র সেই যে একখানি বই খুলে তার মধ্যে ডুবে বসে আছেন, তার থেকে কি ভেসে উঠছেন? একবারও না। এত শব্দ এত ঝাঁকুনি, কিছুই টের পাচ্ছেন না টুটুর বাবা! টুটু বলে যে একটা বছর দশ-এগারোর ছেলে আছে তাঁর, আর সেই ছেলেটাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, সে কথাটুকুও মনে আছে কিনা সন্দেহ।

কাজেই ওই যে লোকটা প্রায় শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে পড়লো, টুটুর বাবা টেরও পেলেন না। শুধু টুটুর কাছেই এটা একটা 'ব্যাপার' বলে মনে হল।

কারণ এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার লোক টুটু জীবনেও দেখে নি। কলকাতার রাস্তায় কখনো কখনো চানাচুরওয়ালা কি ছোলাচেপ্‌টিওয়ালা দেখেছে বটে নানা রকম উদ্ভট জিনিসপত্র গায়ে চাপিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে লোক জড় করতে, কিন্তু সে অন্য রকম। এ যেন অন্য এক জাতের মানুষ।

না কি আজব দেশের মানুষ!

কি ও? পাহাড়ী? ভুটানী? মারাঠি? পাঞ্জাবী? উড়িষ্যাবাসী? অসমিয়া? মাদ্রাজী? রাজপুত? কাশ্মীরী? ছোটনাগপুরী? না কি বাঙালী?

উঁহু। বাঙালী হতে পারে না।

অত বড় বড় গোঁফ থাকে বাঙালীর?

কুমকুম

টুটুদের 'ভূগোল পরিচয়' বইয়ে ভারতবর্ষে যত রাজ্য আছে সব রাজ্যের লোকের সাজ-পোশাকের বর্ণনা আছে, আর তাদের চেহারারও নমুনা আঁকা আছে, সেই সব বর্ণনা জলের মত মুখস্থ বলতে পারে টুটু। কিন্তু এই লোকটাকে তাদের কারো দলেই ফেলা চলছে না!

লোকটার গায়ে এই বোশেখ মাসের দুপুরে একটা গলাবন্ধ লোমের কোট, আর মোটা কম্বুলে হাফপ্যাণ্ট, দুপায়ে দুরঙা মোজা। তার একটা মোটা গরমের, একটা মিহি সিল্কের!

পায়ে?

পায়ে হচ্ছে বাঁ পায়ে ডার্বি স্যু, ডান পায়ে কাবুলী চপ্পল।

এই হচ্ছে মূল পোশাক, কিন্তু ছোট ছোট আড়ম্বর আরো অনেক আছে। যেমন—কানে সোনার মাকড়ি, গলায় নানা রঙের পাথরের মালা (হ্যাঁ সেই লোমের কোটের ওপরই), কপালে সিঁদুর আর চন্দনে আঁকা ত্রিশূল চিহ্ন, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, এবং কাঁধে একটি লাল টকটকে সিল্কের চাদর।

টুটুর জীবনে টুটু এমন সাজসজ্জা দেখে নি।

অতএব টুটু ভয়ানক একটা আগ্রহ আকুলতা আর মন-উচাটন-করা আকর্ষণ অনুভব করে।

অথচ এগিয়ে গিয়ে ভাব করবার জো নেই। টুটুর মা বার বার নিষেধ করে দিয়েছেন। রেলগাড়িতে কারো সঙ্গে ভাব জমাতে যেও না। কত রকম দুষ্টু লোক ওঠে রেলগাড়িতে। ছোট ছেলেদের সঙ্গে ভাব করে তাদের খারাপ জিনিস খাইয়ে অজ্ঞান করে দেয়, পাগল করে দেয়, জন্মের শোধ 'বোকা' করে দেয়।

টুটু একবার সবেগে প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, 'বাঃ তাদের কী দরকার? ছোটদের কাছে তো আর টাকা থাকে না যে কেড়ে নেবার জন্যে—'

টুটুর মা ছেলের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে দিতে কাহিল হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই ক্লান্ত গলায় বলেন, 'আরে বাবা, কিছুর জন্যেই নয়, শুধু অনিষ্ট করবার জন্যেই—'

'ধ্যেৎ! শুধু অনিষ্ট করবার জন্যে? চেনা-জানা নেই, শত্তুরতা টত্তুরতা কিচ্ছু

নেই, কেবল মাত্র অনিষ্ট করবার জন্য অনিষ্ট করতে আসবে?' টুটু অবিশ্বাস আর করুণার গলায় বলেছিল, 'তোমার যত উলটো-পালটা ভাবনা।'

টুটুর মা ক্লান্ত গলাকে জোরালো করে তুলেছিলেন, অতএব, 'বললেই হল? তুমি পৃথিবীর কী জানো? কতটুকু দেখেছো পৃথিবীর? কদিনই বা দেখছো? শুধু শুধু অন্যের অনিষ্ট করাই কাজ থাকে অনেকের। এই যে ইতিহাস পড়ো, দেখো না শুধু শুধু যুদ্ধ বাধিয়ে মানুষ কেমন করে হাজার হাজার মানুষ মারে,—এক একটা দেশ ধ্বংস করে দেয়, কত সুন্দর সুন্দর মন্দির-প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়! তোমার রাজ্যে তুমি আছো, আমার রাজ্যে আমি, তুমি হঠাৎ সৈন্য টৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার রাজ্যে। এসব শুধু শুধু নয়? যাক ওসব কথা—বাজে তর্ক করতে হবে না, যা বলছি তাই শুনো। কারো সঙ্গে গল্প কোরো না। কারো কাছে কিছু চেও না; কারো দিকে তাকিও না। এই টিফিন-কৌটোয় টিফিন দিচ্ছি, খিদে পেলেই খাবে, আর অনেক গল্পের বই দিচ্ছি পড়বে। ব্যস—'

টুটু এ সময় প্রবল প্রতিবাদ জানায়, 'গল্পের বই পড়বো? শুধু বসে বসে গল্পের বই পড়বো? আকাশ দেখবো না? মাঠ বন পাহাড়দের ছুট মারা দেখবো না? জলের মধ্যে ফুল ফুটে থাকা, মাঠে ধোবাদের গাদা গাদা কাপড় শুকোতে দেওয়া, সব কিছুই না দেখা হয়ে থাকবে? মাইল গুনবো না? ইস্টিশানের নাম মুখস্থ করবো না?'

টুটুর মা হতাশ গলায় বলেন, 'আমি সঙ্গে যাচ্ছি না, তবু তোমার এই সমস্তই করতে হবে? থাক না এবারটা। যাচ্ছ তো একা তোমার বাবার সঙ্গে, ভয়ে কাঁটা হয়ে রইবো আমি। যে মানুষ! কোনো ছেলেধরা যদি তোমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ভুলিয়ে কোনো স্টেশনে নামিয়ে নিয়ে যায়, খেয়ালও করবেন না। আমি সঙ্গে গেলে এত কথার কিছুই বলতে হতো না! এ রকম তো হয়নি কখনো।'

তা কথাটা সত্যি।

মাকে ছেড়ে এই প্রথমই টুটু কোথাও একা যাচ্ছে। যাচ্ছে অবশ্য পিসীর বাড়ি, তবু মার ভয়-ভাবনার শেষ নেই।

কুমকুম

এদিকে টুটুর পিসী কেবলই চিঠি লেখেন 'এই মার আঁচলের খোকা, আঁচলতলা থেকে বেরিয়ে পড়ে আয় না একবার আমার কাছে। এত বড় ছেলে হয়ে গেলি তবু দু-দশ দিন মার কাছ ছাড়া হতে পারিস না?' সম্প্রতি আরো লিখেছেন 'আমাদের এখানে কী সুন্দর বাগান, কত ফুল ফুটেছে, তোর 'তরমুজ দিদি' শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, জামাইবাবুও এসেছে…' ইত্যাদি ইত্যাদি—

টুটুর বাবা বললেন, 'আর না নিয়ে গেলে ভালো দেখায় না।'

তাই এই বেরোনো টুটুর।

'ভালো দেখাতে।'

কাজে কাজেই বেরোবার আগের সেকেণ্ড পর্যন্ত উপদেশ দিয়েছেন মা। আর সেই জন্যেই টুটু ওই ভীষণ আকর্ষণীয় লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে পারছে না।

কি জানি বাবা সত্যিই যদি ছেলেধরা হয়? সত্যিই যদি কোনো ওষুধ-বিসুদ শুঁকিয়ে জন্মের শোধ বোকা করে দেয়?

লোকটা উঠে পড়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিল এতক্ষণ, বসবার মত জায়গা পাচ্ছিল না। টুটু লক্ষ্য করেছিল ও গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, গাড়িসুদ্ধু লোক যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে দরকারের অতিরিক্ত ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসতে শুরু করছে। যার হাতে বই কি খবরের কাগজ ছিল, সে হঠাৎ সেটাকে পাশে রেখে জায়গা দখল করে ফেলছে।

তার মানে ওকে পাশে ঘেঁষে বসতে দিতে কারুরই ইচ্ছে নেই।

টুটুর প্রাণে মার নিষেধ-বাণীর ভয় তাই। তা নয় তো টুটু নিজে গুটিয়ে বসে ওকে জায়গা করে দিত। যদিও টুটু ওটা ঠিক বিশ্বাস করে না, মানুষ যে শুধু শুধু অন্যের অনিষ্ট করবে—বলেই করে, একথা ওর কাছে একটা হাস্যকর কথা, তবু ভয় জিনিসটা একবার ঢুকিয়ে দিলে স্বস্তির মনটা ঘুচে যায়।

টুটু তাই আশা করছিল যে সব বুড়ো ধাড়ী লোকগুলোর ছেলেধরার ভয় নেই, অজ্ঞান হয়ে যাবার, কি জন্মের শোধ বোকা হয়ে যাবার ভয় নেই, তারা একটু সরে

বসে জায়গা করে দিক ওকে। বেচারাকে ভারী যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। যেন আর দাঁড়াতে পারছে না।

কিন্তু কোথায় ?

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছেই খালি এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। অথচ দু একজন একটু ভদ্রতা করলেই হয়ে যেত জায়গা।

ভারী রাগ ধরে যায় টুটুর। যেমন রাগ হয় মামার, রেলে চড়ার ব্যাপারে। ও মনে মনে ওই লোকগুলোকে উদ্দেশ করে বলে, 'কেন রে বাপু, এত কেন ? রেলগাড়িটা তো তোদের চিরকালের জায়গা নয়। নিজের কেনা জায়গাও নয়। তোরাও যেমন পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছিস, ও-ও তেমনি কিনেছে। দু'চার ঘণ্টা পরেই তো যে যার নিজের জায়গায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসবি, তবে এইটুকুর জন্যে এত অভদ্রতা কেন ?'

কথাগুলো টুটুর মুখস্থ।

মামা যখন 'ব্যাপার' ঘটায় টুটু তখন রেগে বলে ওই সব। মানে মনে মনে। মার সামনে মার ভাইকে কিছু বললে রক্ষে আছে ? তা হলেই তো টুটুর অসভ্যতার চূড়ান্ত দেখবেন।

আর ওঁর ভাইয়েরটি কি ?

খুব সভ্যতা ?

তা এখন যদিও মা নেই, আর এরা মার ভাইও নয়, তবু মনে মনেই বলতে হয়। চেঁচিয়ে তো আর বলা চলে না। হয়তো যাঁরা নিজেরা অন্যায় করছেন তাঁরাই বলে বসবেন, 'আচ্ছা ফাজিল ছেলে তো ! এতটুকু ছেলের কথা দেখ !'

জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তো দেখে আসছে টুটু এটা। নিজেরা দোষ করলে কিছু না, টুটু সে কথা বললেই মহা দোষ।

তবু টুটু ঠিক তার পাশে বসা একটি মহিলাকে বলেই বসলো, 'লোকটা তো বসতেই পাচ্ছে না ? সবাই দিব্যি বসে আছে, আর ও বেচারা—'

পাশের মহিলাটি গুছিয়ে একটি পান গালে ফেলে বলেন, 'কে ওকে

পাশে বসতে দেবে বাবা, এখান থেকে বোটকা গন্ধ ছাড়ছে। আমার তো গা গুলিয়ে আসছে।'

শুনে রাগে গা পিত্তি জ্বলে যায় টুটুর।

—দিদি, যদি একটু তফাৎ বৈঠেন,—

বোটকা গন্ধ ছাড়ছে!

আহা!

চিড়িয়াখানায় যাও না তুমি কখনো?

বাঘের খাঁচার পাশ দিয়ে হাঁটো না?

কিন্তু বলা তো চলে না সে কথা।

তাই আস্তে বলে, 'ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, দাঁড়াতে পাচ্ছে না।'

মহিলাটি ব্যঙ্গহাসি হেসে বলেন, 'ওসব দেখানো ঢং, বুঝলে খোকা। তুমি ছেলে-মানুষ অত কি বুঝবে! একবার বসতে পেলেই দেখো অন্য মূর্তি।'

'তা বলে সবাই বসে থাকবো, আর ও দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'থাকুক না, ক্ষয়ে যাবে না।' বলে মহিলাটি আর একটি পান বার করেন।

আর ঠিক এই সময় ঘটে সেই কাণ্ডটি।

লোকটা কোন মতে ঠেলে ঠুলে এদিকে সরে এসে মহিলাকে বলে ওঠে, 'দিদি, যদি একটু তফাৎ বৈঠেন, তো হামি এই খোকাকো পাশ বসে যাই।'

কুমকুম

দিদি !

চমকে ওঠে টুটু ! এ তো প্রায় পুরো বাংলা। আর এতক্ষণ টুটু ভেবে মরছিল, একেই কি যাযাবর বলে ? না কি বেদুইন ?

অবশ্য নামগুলো গল্পের বইতেই পড়া। ঠিক ধারণা নেই তারা কেমন।

তাই এই প্রায় বাংলা শুনে মনটা লাফিয়ে ওঠে টুটুর।

কিন্তু ইত্যবসরে মহিলাটি নিজেই সেরেফ লাফিয়ে উঠেছেন !

'কাহে ! কাহে এইসা বাৎ বোলেগা ? তোমকো পুলিসমে দেনে পড়েগা।'

'পুলিস !'

লোকটা একটু ক্লান্ত হাসি হাসে।

টুটু চঞ্চল হয়, টুটু ওই বেঞ্চে বসা বাবার দিকে তাকায়। কিন্তু বাবা সেই অথই জলে।

মহিলাটি তীব্র স্বরে বলেন, 'রেলগাড়িতে এত্না এত্না লোক থাকতা হ্যায়, তব্ হাম্‌কো পাশ কাহে ?'

গাড়ির মধ্যে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে যায়। মহিলাটির দুর্দশা দেখেই হাসি। এটাও টুটু লক্ষ্য করে আসছে চিরকাল, কাউকে দুর্দশায় পড়তে দেখলে কি অসুবিধেয় পড়তে দেখলেই যেন সবাইয়ের আমোদ।

লোকটা সত্যিই যেন আর দাঁড়াতে পারছে না, হাত বাড়িয়ে বাঙ্কের ধার চেপে ধরে টলে পড়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে শিথিল শিথিল গলায় বলে, 'আপোনি মায়ের জাত, আউর আপ ভি বাংগালী, হামি ভি বাংগালী ওইসি বাস্তে'—

'তুমি বাঙালী ?'

এবার লাফিয়ে না উঠে পারে না টুটু ! এবং আবেগের বশে 'তুমি'ই বলে বসে।

'আমি অনেকক্ষণ বসেছি, তুমি এবার বোসো !' বলে টুটু নিজের জায়গাটা ছেড়ে দেখিয়ে দেয়।

জানলার ধারের সেই পরম মূল্যবান জায়গাটি।

যেটি সংগ্রহ করবার আশায় টুটু বাবাকে বলে বলে ট্রেন ছাড়বার এক ঘণ্টা আগে এসে বসেছে।

কুমকুম

টুটুর বাবাও অবশ্য অনেকক্ষণ সময় হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে আসাই পছন্দ করেন, তার ওপর আবার টুটুর 'জানলা জানলা' বাতিক! মানে জানলা হারানো —জানলা হারানো বাতিক।

কিন্তু বাতিক হবে না?

টুটু তার এই সামান্য দশ বছরের জীবনেই কি কম দেখলো? ফাঁকা গাড়িতে উঠেও দেখেছে সব কটা জানলার ধারে ঠিক একটা করে লোক পুতুলের মত সাজানো আছে। আর এত উদাসীন মুখ নিয়ে জানলার বাইরে আকাশ পানে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তারা যে, পৃথিবীতে কি ঘটছে না ঘটছে, সে সম্পর্কে খেয়ালই নেই। আর নড়ে বসবে না এক তিল, এ বিষয়ে নিশ্চিত।

অথচ টুটুরও তো ইচ্ছে যে ওই একটি জানলার ধারে বসে।

রেলগাড়ির জানলাতেই যদি বসতে না পেলো, তবে আর সুখ কি?

জানলা দিয়েই তো ধরা দেবে আকাশ বাতাস মাঠ বন পাহাড় নদী!...

তাই টুটুও এক ঘণ্টা আগে এসে সাইডিঙে গিয়ে একটি জানালার ধার সংগ্রহ করে পুতুলের মত বসেছিল।

আর মুহুর্মুহু কম্পিত হচ্ছিল, উল্লসিত হচ্ছিল, আর মা কাছে না থাকায় কাউকে কিছু বলতে না পাওয়ায় ব্যাকুলিত হচ্ছিল।

অবশ্য চুপি চুপি বললে বলতেই হয় মাকে ছেড়ে একা আসতে বেশ 'মন কেমন' 'মন কেমন' ভাব এলেও, ভিতরে ভিতরে একটু পুলকিত ভাবও ছিল।

জীবনে প্রথম পাওয়া স্বাধীনতা!

এর স্বাদ তো কম রোমাঞ্চময় নয়।

মার সঙ্গে যাওয়া মানেই তো প্রতিটি মিনিটে পঁচিশটি করে উপদেশ—

'টুটু, জানলার অত ধারে বসিসনে, চোখে কয়লা-গুঁড়ো লাগবে (ইলেকট্রিক ট্রেনেও মা কয়লা-গুঁড়োর বিভীষিকা দেখেন।)...টুটু, জানলার বাইরে হাত বাড়াসনে, টুটু, পা নাচাচ্ছিস কেন, সভ্য হয়ে বসতে পারিস না?'...

কিছুর মধ্যে কিছু না, অকারণেই বলবেন, 'টুটু, তোর জ্বালায় কী করবো বল দিকি ?'

তা'ছাড়া—মামার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেও তো উপদেশের বন্যা বইতেই থাকে। তাও আবার অন্য সকলের আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে 'টুটু, আসবার আগে কি বলেছিলাম ?···টুটু, তুমি কি চাও আমি আজই চলে যাই ?'···ইত্যাদি প্রভৃতি।

এই বারেই শুধু টুটু স্বাধীন মুক্ত—প্রথম !

বাবা তো পৌঁছে দিয়েই চলে আসবেন। আর গরমের ছুটির শেষে যখন মোহনদা কলকাতায় ফিরবে কলেজ খুলে যাওয়ায়, তখন তার সঙ্গে চলে আসবে টুটু।

মন কেমনের দুঃখ আর স্বাধীনতার সুখ এই দুটি ভাব নিয়ে গাড়িতে উঠে বসেছিল টুটু, আর আস্তে আস্তে সব কিছুই ভুলে পৃথিবীটাকে দেখছিল, কারণ টুটু একটা জানলার ধারের অধিকার পেয়ে গিয়েছিল।

সেই অধিকারটি ছেড়ে দিতে চাইল টুটু ওই কিম্ভূত লোকটাকে।

টুটু শিশুর স্বভাব বশে কিম্ভূতের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করলো, টুটু লোকটার ওপর একটু মমতা বোধ করলো।

তাছাড়া যাকে দেখে টুটু আকাশ-পাতাল ভাবছিল, সে 'বাঙালী' শুনে টুটু যেন আহ্লাদে গলে গেল।

অবশ্য বাঙালীর মত বাংলা বললো না, তা অনেকদিন বিদেশে থাকলে অমন হয়। লোকটা হয়তো পৃথিবী পর্যটক ! ওকে দেখে যেন তাই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ঘণ্টা কয়েক পরেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে হবে ওর সঙ্গে। পৃথিবীর কত রহস্যই জানা হয়ে যেতে পারতো টুটুর, কিছুই হবে না।

আরও একটা কথা—একটু ভাব হয়ে গেলে টুটু চুপি চুপি জিগ্যেস করে নিতে পারতো এত গরমে লোমের কোট পরেছে কেন ও ; দু পায়ে দু রকম জুতো মোজা কেন, কপালে সিঁদুরের অর্থ কি ? বেটাছেলে গলায় এত মালা কিজন্যে ?

আহা কতটা সময় বৃথায় গেল।

মা ওই রকম বারণ করে না রাখলে তো টুটু কখন ওকে ডেকে নিত।

তা ডাকলেই কি আসতো? বসতো টুটুর জায়গাতে?

এখনও তো বসলো না।

বলে উঠলো, 'শরম আছে না হামার?'

'শরম' কথাটার মানে জানে টুটু, তাই বলে ওঠে, 'কাহে শরম? আমি তো অনেকক্ষণ বৈঠেছি।'

এতক্ষণ পরে টুটুর বাবার যেন খেয়াল হলো টুটু বলে একটা ছেলে আছে তাঁর। তাই কথা বললেন। তবে বই থেকে চোখ তুলে নয়; চোখ রেখেই।

বলে উঠলেন, 'টুটু, হঠাৎ রাষ্ট্রভাষা ধরলে যে?'

টুটু এবার বলে উঠলো, 'বাবা, ইনি বাঙালী!'

টুটুর বাবা বইতেই মুখ রেখে বললেন, 'ভাল।'

'বৈঠো, বৈঠো না তুমি। শুনলে না বাবাজী বোলেগা ভালো।'

টুটু ওর কোটের একটা কোণ ধরে টেনে বসাতে চেষ্টা করে।

লোকটা যে বসতে পেলে বেঁচে যায়, তা বোঝা যাচ্ছে তাকে দেখে। তবু সে পাশের মহিলাটির দিকে সসংকোচে তাকায়।

টুটু এবার অধিকারবোধ খাটায়।

সদম্ভে বলে, 'ওঁর দিকে তাকিয়ে কি দরকার? তুমি তো আমার জায়গায় বসছো।'

মহিলাটি এবার ছিটকে উঠে বলেন, 'তোমার জায়গা, তবে আমার ঘাড়ের কাছে। দেখতে পাচ্ছো না লোকটা পাগল! বদ্ধ পাগল! আর তুমিও একটি পাগল।...দু দুটো পাগল, তার ওপর এই বুনো রামছাগলের গন্ধ! এখানে বসে থাকার চাইতে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়াও ভাল।'

বলে মহিলা নিজের প্রকাণ্ড বটুয়াটি উঠিয়ে নিয়ে চলে যান ওদিকে।

'বাঁচা গেল!' বলে টুটু একমুখ হেসে বসে পড়ে বলে, 'তুমি জানলার ধারে বোসো। যা গরম কোট পরেছ!'

লোকটা বসে পড়ে।

আরামের শব্দ করে একটা। কিন্তু আঃ নয়।

টুটু গুছিয়ে বসে চোখ বড় বড় করে বলে, 'তুমি যদি বাঙালী তো বাংলা ভালো করে বলতে পারো না কেন?'

(২)

লোকটা জানলার ধারে মাথাটি হেলিয়ে আরামসে চক্ষু বুজে হাওয়া খাচ্ছিল, টুটুর কথায় চোখ খুলে বলে, 'হামাকে বোলছে?'

টুটু হেসে উঠে বলে, 'বাঃ তোমাকে বলছি না তো কি ওই জানলাটাকে বলছি? বলছি—তুমি যদি বাঙালী তো ভাল করে বাংলা কথা বলতে পারো না কেন?'

'পারে না? কোন্ বলছে পারে না?' লোকটা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, 'জরুর বলতে পারে। তো কথা এই হচ্ছে হামি বহুৎ বরষ আন্য দেশে থাকছে, ওইসি বাস্তে থোড়া ভুল হয়ে যাচ্ছে। এখন হামি দেশে যাচ্ছে, হামার বাড়ি যাচ্ছে, এখন তো বিলকুল সব মিটে যাচ্ছে। এখন হামি বড়িভাজা খাবে, মোচা ঘণ্ট খাবে। ব্যস একদম বাংগালী হয়ে যাবে।'

টুটু হেসে ওঠে।

বলে, 'বলছো যে বাঙালী, আবার বলছো বাংগালী হয়ে যাবে। হি হি—হয়ে 'যাবে' নয় মশাই, হয়ে 'যাবো'। কোথায় থাকতে তুমি? অনেক অনেক দেশে, তাই না?'

লোকটা যদিও খুব ক্লান্ত ক্লান্ত ছিল, তবু টুটুর প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে উৎসাহিত গলায় বলে, 'ওই কথাটা কোন্ বলেছে তোমাকে!'

টুটু গম্ভীর ভাবে বলে, 'কে আবার বলবে? তোমার এই কিম্ভূত সাজই বলেছে! 'কিম্ভূত' মানে জানতা হ্যায়? জানতা হ্যায়? তা হলে তো হামকো কথা সবই বুঝতা হ্যায়।'

কুমকুম

লোকটা কেমন একটা ভাঙা গলায় হেসে ওঠে বলে, 'বাংগলা বোলো, বাংগলা বোলো। বিলকুল সমঝাবে।'

টুটু ওর কাছ ঘেঁষে বসে ছিল।

কাজে কাজেই টুটু ওর গায়ের সেই বোটকা গন্ধটি বিলক্ষণই পাচ্ছিল। আর ভাবছিল ওই গিন্নীটি যা বললেন, তা মিথ্যে নয়। স্রেফ ছাগল-ছাগল গন্ধ। ওর গায়ের এই কোটটা নির্ঘাত ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। কিন্তু কি করা যাবে? একটা কিম্ভূত লোক দেখতে পাওয়া, তার কাছ ঘেঁষে বসতে পাওয়া, তার সঙ্গে কথা বলতে পাওয়া, এ সব তো কম মজা নয়। জীবনে কবারই বা এমন সৌভাগ্য আসে মানুষের?

আর টুটুর জীবনে যে একবারও আসবে না, সে তো পড়েই আছে কথা।

এই একবার না হয় টুটুর অনেক জন্মের ভাগ্যে মা টুটুকে একা বাবার সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছেন, বার বার তো আর দেবেন না?

মার দেওয়া না দেওয়াটাই মনে আসে টুটুর, মাকে বাদ দিয়ে চট্ করে কিছু ভেবে ফেলতে পারে না?

ভবিষ্যতে, টুটু বড় হলে যে ওসব কথা থাকবে না, বরং টুটুই মার ব্যাপারে গার্জেন হবে, তাও খেয়াল হয় না।

অথচ দেখেছে তো? দিদিমা তাঁর ছেলের অনুমতি ব্যতীত এক পাও নড়েন না। বলেন, 'ও বাবা ফটকেকে বলা হয়নি, গেলে রক্ষে রাখবে না।'

তা সব সময় অত তলিয়ে মনে পড়ে না, তাই টুটু ভাবে, এই একবারই যা হলো।- এর পর তো সব সময়ই মা সঙ্গে থাকবেন।

অতএব?

অতএব এ রকম কিম্ভূত-টিম্ভূত দেখলে, এই মহিলাটির মতই সরে যাবেন এবং টুটুকেও টেনে নিয়ে সরে যাবেন। টুটু যদি যেতে না চায়? সেরেফ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলবেন, 'তোর জ্বালায় কি করবো টুটু? বিষ খাবো? জলে ঝাঁপ দেব? গলায় দড়ি দিয়ে মরবো?'

কুমকুম

তখন ?

তখনও কি সাহস হবে টুটুর সে রকম লোকের কাছ ঘেঁষে বসে থাকবার ?

সাহস হবে তার সঙ্গে কথা বলবার ?

হবে না নিশ্চয়ই।

তবে ?

তুচ্ছ একটু ছাগুলে গন্ধর জন্যে এমন সুযোগ হেলায় হারাবে টুটু ?

তা ছাড়া কতক্ষণই বা ?

একটু পরেই তো নেমে যেতে হবে টুটুকে।

কিম্ভূতকিমাকার লোকটা যে কত কত দেশ ঘুরেছে, কত কত দৃশ্য দেখেছে, সে সবের তো সমস্তই অজানা রয়ে যাবে টুটুর।

টুটু একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

বলতে গেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

ও চমকে বলে, 'কী হচ্ছে ?'

'কিছু না।'

'তোমার মন খারাপ লাগছে মালুম হচ্ছে।'

'মালুম ? মালুম কি ? হালুমের মাসতুতো ভাই বুঝি ?' টুটু হেসে গড়িয়ে পড়ে' মালুম ! হালুম ! ভুলুম ভালুম !'

হঠাৎ ও বেঞ্চ থেকে বাবা বই থেকে মুখ না তুলেই বলেন, 'টুটু, অসভ্যতা কোরো না ! ভদ্রভাবে কথা বলো।'

বোঝো ব্যাপার !

টুটু নামে যে একটা ছেলে আছে বাবার, তা ভুলে গেছেন বাবা, অথচ তাকে সভ্যতা শেখানোর কথাটি ঠিক মনে আছে।

একেই বলে পৃথিবী !

একেই বলে গুরুজন !

টুটুর অভিমান হয়।

কুমকুম

টুটু তাই গম্ভীর গলায় বলে, 'অসভ্যতা কিছুই করি নি। তোমরা যদি হাসলেও অসভ্যতা বল তো, আমি কি করবো? আমি এঁর সঙ্গে ভাব করছি।'

'ভাব করা মানে বিরক্ত করা নয়।' বাবা তাঁর বইয়ের দুর্গের আড়াল থেকেই বলেন, 'মনে হচ্ছে কাউকে খুব বিরক্ত করছো তুমি।'

'মোটেই না।' টুটু সবেগে বলে, 'শুধু কথা বলছি। শুধু ভাব করছি, তা ও তো এক্ষুণি ফুরিয়ে যাবে। এক্ষুণিই তো পিসীর দেশ এসেই যাবে। রেলগাড়িরা যা জোরে জোরে ছোটে।...যাক গে তুমি বল তো কোন কোন দেশে ছিলে তুমি।'

আস্তে আস্তে গল্প জমে ওঠে।

কিম্ভূত লোকটা বলে, 'কোতো কোতো দেশ দেখলাম, কোতো কোতো মুল্লুকে গেলাম, ও কি খেয়াল আছে? তব কি হামি একটা—'

এই সময় গাড়ি একটা স্টেশনে এসে থামলো, এবং বেশ কয়েক মিনিটের জন্যে থামলো, সারা গাড়িতে চাঞ্চল্য উঠলো, 'চা চা' শব্দে প্লাটফর্ম গমগম করে উঠলো, আর কী আশ্চর্য যে টুটুর বাবা বইটা মুড়ে রেখে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

আর দৃষ্টিটা তাঁর একেবারে যাকে বলে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। বলাই বাহুল্য টুটুর পরিস্থিতি দেখেই এই বিস্ফারিত।

হদ্দ কিম্ভূত একটা বুড়োর গায়ের কাছে বসে মাটির ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছে টুটু। সে লোকটার হাতেও একটা ভাঁড়।

তার মানে লোকটা নিজে খাচ্ছে, এবং কাছে বসে থাকা ছেলেটার প্রতি দয়া-পরবশ হয়ে তাকেও এক ভাঁড় চা কিনে দিয়েছে!

টুটুর বাবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে যায়!

টুটুকে না টুটুর মা প্রাণ গেলেও চা খেতে দেয় না। বাড়িতে সেই সুন্দর রঙিন পেয়ালার চা খায় না, আর রাস্তায় ওই বিচ্ছিরি মাটির ভাঁড়ে! তা ছাড়া—কে ওই লোকটা? কখন এসে বসে টুটুকে কবলিত করেছে? টুটুর মার আশঙ্কাই সত্যি নয়

তো ? তার তো সর্বদাই ভাবনা কখন কোন ছেলেধরা টুটুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তুকতাক করে নিয়ে পালায়।

টুটুর বাবা যদিও এসব কথা শুনে বকেন, বলেন, 'দেশসুদ্ধু এত ছেলে, কারুকে ধরছে না, তোমার ছেলেকেই ছেলেধরা ধরে নেবে ?'

টুটুর মাও রেগে রেগে বলেন, 'নেবে না কেন ? নেবেই তো ! দেশসুদ্ধু ছেলে কি তোমার ছেলের মতন বোকা ?

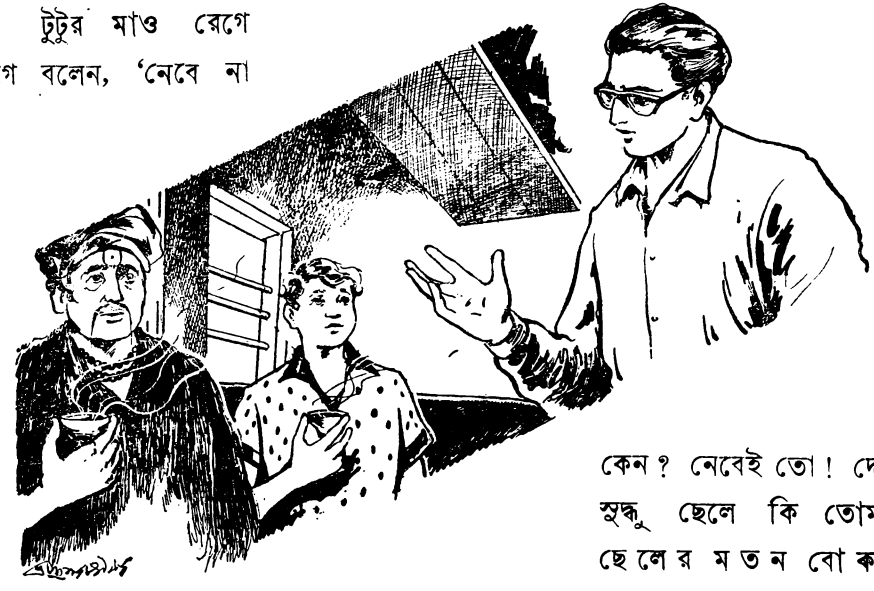

'টুটু, চা খাচ্ছো মানে ? ফেলে দাও, ফেলে দাও শীগ্‌গির।'

দেখতে পাও না যত রাজ্যের বিচ্ছিরি বুড়ো হাড়নোংরা ভিখিরী, এই সব লোকের দিকে তোমার ছেলের ঝোঁক ! তাদের সঙ্গেই ডেকে ডেকে ভাব করা।'

টুটুর বাবা অবশ্য এসব কথা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আজ হঠাৎ ওই অদ্ভুত মার্কা লোকটার পাশে টুটুকে দেখে, এবং ওর দেওয়া চা খেতে দেখে বিশ্বাস করলেন।

আর তখনই হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটলো : 'টুটু, চা খাচ্ছো মানে ? ফেলে দাও, ফেলে দাও শীগ্‌গির।'

কুমকুম

টুটু চমকে উঠে তাড়াতাড়ি চাসুদ্ধ ভাঁড়টা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। কাঠ হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এবার অপ্রস্তুতের পালা বাবার। টুটু যে সত্যিই অমন এক কথায় ফেলে দেবে চায়ের ভাঁড়টা তা বোধহয় বাবা আদৌ ভাবেন নি, তাই অপ্রতিভের গলায় বলেন, 'ব্যস! বাবুর কী রাগ? একবার বলেছি বলে—এসো এদিকে সরে এসো! আমার কাছে বসো! ভাল চা খাওয়াবো!'

টুটু যদি বা বাবার বকুনি খেয়ে চুপ ছিল, কিন্তু এই সহানুভূতির ধাক্কায় চুপ করে থাকতে পারে না। হুস করে কেঁদে ফেলে।

কেঁদে ফেলে বলে ওঠে, 'চাই না, চাই না তোমাদের ভালো চা খেতে!'

কান্না!

টুটুর বাবা অসহায়তা বোধ করেন। টুটুর কান্না! এ যে বড় গোলমেলে ব্যাপার।

টুটুর বাবা অপ্রস্তুতের গলায় বলেন, 'ঠিক আছে, ভালো চা খেও না, পচা চা খাও। মোট কথা কান্নার দরকার নেই। তবে বলছিলাম যে—'

টুটু শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছে জোর গলায় বলে ওঠে, 'কী বলছিলে তা জানি! বলছিলে—ওই বিচ্ছিরি-জামা-পরা লোকের কাছে বসেছিস কেন টুটু? ওর কেন চা খাচ্ছিস কেন? কিন্তু ইনি বাঙালী তা জানো? অনেক দেশ ঘুরে এখন—'

টুটুর বাবা ব্যস্ত গলায় বলেন, 'হয়েছে হয়েছে। কিছু বলবো না তোমাকে। উঃ! কী ছিঁচকাঁদুনে ছেলে! উনি আবার বলেন যুদ্ধে যাবো!'

বাবা আবার গিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়েন, বইটা পড়তে শুরু করেন। ততক্ষণে গাড়িও ফের চলতে শুরু করেছে।

টুটু এবার একটু বিজয়-গৌরবের হাসি হেসে বলে, 'দেখলে তো? বলি নি আমার বাবা খুব ভালো।'

হ্যাঁ, ইত্যবসরে আলাপাদির সূত্রে টুটুর পরিচয় জানা হয়ে গেছে লোকটার।

কুমকুম

সে 'বাংগলা' বুঝতে পারে, 'বাংগলা' লিখতেও পারে, শুধু ঠিকভাবে বলতে পারে না।

অবিরত অবাঙালীদের সঙ্গে থেকে থেকে আর বাংলাদেশ থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে থেকে এই অবস্থা ওর।

গাড়ি আবার চলতে থাকে।

টুটু বলে, 'কই বললে না তো এত গরমে তুমি এই মোটকা আর লোম-লোম গরম জামাটা পরে আছো কেন?'

কিম্ভূত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'ওইটা বহুৎ কষ্টর বাৎ হচ্ছে টুটুবাবু! একঠো ছাগল অনেকদিন আমার সাথে থাকলো, ওটা আমাকে বহুৎ জাস্তি ভালবাসলো, দিনভোর হামার সাথে সাথে বেড়ালো, রাতভোর হামার পাশে ভি নিদ গেলো, আর একদিন পাহাড় থেকে পড়ে মরে গেলো।'

'আহাহা ইস!'

টুটু শিউরে ওঠে, 'মরে গেলো?'

'গেলো! তো হামার প্রাণে বহুৎ কষ্ট হলো, তখন ওর ছালটা দিয়ে কোট বানিয়ে নিলাম। তো ভাবনা হলো কি ওটা হামার সাথে সাথে আছে।'

ছাগলের ছালটা দিয়ে কোট বানিয়ে পরলে, মনে হবে সেই পোষা ছাগলটা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। এমন অদ্ভুত কথাটা অবশ্য ঠিক বুঝতে পারে না টুটু, কিন্তু ওর দুঃখুটা বুঝতে পারে, তাই চুপ করে থাকে।

একটু পরে কিম্ভূত বলে, 'তুমি খুব ভালো ছেলে আছে, তুমাকে হামার জাস্তি ভালো লেগেছে, তুমার বাড়ি হামি একদিন যাবে।'

হঠাৎ বুকটা কেঁপে ওঠে টুটুর, এ কী এ কথা বলছে কেন! তবে কি—তবে কি মার ভয়ই সত্যি? ছেলেধরা? কিছু মন্তর পড়েছে, তাই ওকে আমার এত ভালো লাগছে?

নিজের অজান্তেই টুটু একটু সরে বসে।

কিন্তু কিম্ভূত ঠিক জানতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বলে, 'বাড়ি যাবে বোলে টুটুবাবুর ডর লাগছে? হামি কি তুমাকে ধরে নিবে? হামি তো এখোন হামার নিজের বাড়ি যাচ্ছে। পঁন্চাস সাল ষাঠ সাল বাদ বাড়ি যাচ্ছে। ওহি বাড়িতে হামার নিজের লোক আছে, হামার ভাই আছে—'

'আর তোমার মা?'

টুটু আবার কাছে সরে আসে।

লোকটা কিন্তু এখন আর লক্ষ্য করে না, আপন মনে হতাশ সুরে বলে, 'মা? মা কি এ্যাতো সাল থাকবে? মা তো মরে যাবে।'

'তা তুমি এ্যাতো দিন বাড়ি যাও নি কেন?'

লোকটা একটা হাত তুলে কপালে ঠেকায়।

টুটু আস্তে ওর শির ওঠা-ওঠা ছাল কুঁচকে যাওয়া একটা হাতের উপর হাত রাখে। আস্তে বলে, 'দেখো তোমার মা বেঁচে আছেন। আশি নব্বুই বছরও বাঁচে মানুষ। আমার দাদু তো কতো বুড়ো! তবুও বেঁচে আছেন। দেখো তুমি বাড়ি গেলে তোমার মা কত আহ্লাদ করবেন।'

লোকটা আবার একটু হাসে।

তারপর আবার সেই উলটোপালটা বাংলায় কথা শুরু করে দেয়।

জমে যায় দুজনে। ভুলে যায় গাড়িতে আর কেউ আছে। তবে টুটুর বাবার নিশ্চিন্ততা ঘুচে গেছে। তিনি বারে বারে বইয়ের আড়াল থেকে একবার করে দেখছেন।

অবশেষে নিশ্চিন্ত হন বাবা, দুম করে দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'ব্যস! উঠে পড়ো টুটু, এসে গেছো পিসীর দেশে।'

'এঁ্যা! এক্ষুণি!'

টুটু চেঁচিয়ে ওঠে, 'এক্ষুণি নামবো না আমি।'

'এক্ষুণি নামবে না? তার মানে তোমার মা যা বলেন তুমি তাই। একটা পাগল! পুরো পাগল! গাড়ি মাত্র দুমিনিট থামবে তা জানো?'

কুমকুম

দুম্ করে সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে টুটুর একখানা হাত চেপে ধরে বাবা ওকে প্রায় টেনেই নামান। শুধু ভদ্রতা করে কিম্ভূতের দিকে একবার ফিরে বলে যান, 'আচ্ছা নমস্কার।'

প্লাটফর্মে নামতে না নামতে গাড়ি ছেড়ে দেয়।

কিম্ভূত লোকটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যতদূর দেখা যায় দেখতে থাকে, আর টুটু হাত নেড়ে 'টা টা' করতে থাকে।

তারপর ট্রেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

আর তারপর টুটুর বাবা একটা সাইকেল রিকশায় চেপে বসে বলেন,

সাইকেল রিকশায় চেপে বসেন।

'আচ্ছা টুটু, তুই কি সত্যি পাগল? ওই লোকটার গা ঘেঁষে বসতে ইচ্ছে করলো তোর? ওর পোশাকে বোধ হয় একশো রকমের অসুখের জার্ম আছে, আর কে জানে কি মতলবের লোক! যাই বল এরকম একটা ছোটলোককে এত ভালো লাগা—'

টুটু এবার ফোঁস করে ওঠে। বলে, 'ময়লা জামা পরলেই মানুষ ছোটলোক

হয়ে যায় না বাবা! উনি কে তা জানো? ওঁদের গ্রামের জমিদারের ছেলে! ছেলেবেলায়—'

'ওদের গ্রামের জমিদারের ছেলে?' টুটুর বাবা হেসে ওঠেন, 'মাত্র এইটুকু? পৃথিবীর সম্রাট নয়?'

'আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর কথা বলব না।'

বাবা এখন মজা পান। সাইকেল রিকশার ঝাঁকুনিটা যেন তাঁর বেশ ভালোই লাগে। স্টেশন থেকে পিসীর বাড়ি অনেকটা পথ।

বাবা এই পথটুকুতে তাঁর খ্যাপা ছেলের রাগ ভাঙাতে চেষ্টা করেন। বলেন, 'আহা তা না হয় জমিদারই হলেন উনি। তা উনি কোন্ দেশী?'

'কোন দেশী আবার—বাংলা দেশী! ছেলেবেলায় ওঁকে ছেলেধরারা ভুলিয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, পাহাড়ে জঙ্গলে কোথায় কোথায় দিন কেটেছে ওঁর, তাই-না এমন অবস্থা? ওরকম কিম্ভূত আজ কেন জানো ওঁর? শুধু ভালোবাসার জন্য।'

'ভালোবাসার জন্যে!' বাবা তো হাঁ।

টুটু কিন্তু তাতে দমে না।

জোর দিয়ে বলে, 'তাই তো! মরে যাওয়া পোষা ছাগলের লোম দিয়ে ওই কোট বানিয়েছেন ভালোবাসার জন্যেই তো! দুপায়ে দুরকম জুতো মোজা কেন জানো? দুজন লোক ওঁর বন্ধু হয়েছিল, তারপর পাহাড়ের গুহায় তাদের সব কিছু ফেলে রেখে কোথায় চলে গিয়েছিল, আর আসে নি! তাই উনি দুজনকে মনে রাখবার জন্যে—' টুটু একটু দম নেয় তারপর বলে, 'আর ওই মালা ওঁকে একজন তিব্বতী সাধু দিয়েছিলেন, ওটা পরলে নাকি কোনো অসুখ করে না। আর ওই চাদরটা ওঁর গুরুর। তিনি মারা যাবার সময় দিয়ে গেছেন। ওটা সঙ্গে থাকলে কেউ ওঁর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। আর—'

হঠাৎ টুটুর বাবা হা-হা করে হেসে ওঠেন, 'আর কি কি গুল মেরেছে ও?'

'গুল?' টুটু গুম হয়ে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে!···

গাড়ি চলতে থাকে।

কুমকুম

(৩)

টুটুরা সাইকেল রিকশা থেকে নামতে না নামতে পিসীর বাড়ির সবাই তাদের প্রায় 'ঘেরাও' করে ফেলে। টুটুর পিসী, পিসে, পিসতুতো ভাইবোন ; আর তাদের পিসতুতো আর খুড়তুতো ভাইবোন মিলিয়ে সে প্রায় ডজন দুই লোক।

সবাই একসঙ্গে হইচই করে ওঠে, 'যাক বাবা শেষ পর্যন্ত তাহলে এলে তোমরা।'

সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্যের ধারা বর্ষণ,—'ইস্ কী লম্বা হয়ে গেছিসরে টুটু ? ও মা, কত রোগা হয়ে গেছিস টুটু ? আগের থেকে তুই ময়লা হয়ে গেছিস টুটু, এমন গম্ভীর হয়ে গেলি কেনরে টুটু ?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসলে হয়তো এতসব কিছুই হয়নি টুটু, একবছর বয়েস বাড়লে (গত বছর পিসীরাই গিয়েছিল, তখনই দেখেছে শেষ।) যতটুকু যা বদল হবার তাই হয়েছে। কিন্তু আবেগের উচ্ছ্বাসে সব কিছুই মানুষ বেশী বেশী বলে থাকে, এটা টুটু দেখেছে। মামার বাড়িতে গেলেও শুনতে হয় এসব।

তাই টুটু কোনো প্রতিবাদ করে না।

শুধু হাসি হাসি মুখে সকলের দিকে তাকায়।

আর টুটুর বাবা ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, 'আহ্লাদের চোটে গুরুজনদের নমস্কার করতেই ভুলে গেলি যে রে টুটু ?'

টুটু জিভ কাটে।

মা পইপই করে বলে দিয়েছিলো, 'এখন বড় হয়েছ, বোকার মত শুধু দাঁড়িয়ে থেকো না, গিয়েই সবাইকে নমস্কার কোরো।'

সেটা মনে পড়ে যায়। কিন্তু টুটু একটু চালাকি করে। ভুলে গেছে, সেটা বুঝতে দেবে না বলে গম্ভীর ভাবে বলে, 'সকলে মিলে এমন 'ঘেরাও' করে ধরল, নীচু হয়ে কি করে বুঝবো কোন পাগুলো গুরুজনের, আর কোন পাগুলো এমনি !'

ব্যস, পড়ে যায় হাসির ধুম।

সবাই হেসে ওঠে এক যোগে।

তার মানে সবাই এখন খুশিতে আছে, অতএব হাসবে। সামান্য কথাতেও

হাসবে! তারপর পিসী হাসি থামিয়ে বলে, 'এই সত্যি, তোরা সরে দাঁড়া বাবা! ঘেরাওই বটে।'

তারপর বুঝতেই পারছো—শুরু হল খাওয়া-দাওয়ার পর্ব! একেই তো টুটু এই প্রথম পিসীর বাড়িতে এসেছে। আর টুটুর বাবাও অনেকদিন পরে বোনের বাড়ি, তার উপর আবার পিসীর দেশে সব কিছু সস্তা আর ভালো।

ইয়া ইয়া ছানাবড়া চার চারটে ধরে দিয়ে পিসী বলে, 'আর একটা নিবি টুটু? আহা শুনে দুঃখে মরে যাই, কলকাতায় নাকি আর মিষ্টি পাওয়া যায় না!'

টুটু ছানাবড়া ভরতি মুখে সজোরে বলে, 'কেন যাবে না? যায় তো!'

পিসী বলে, 'আহা সে কি আর মিষ্টি রে? ছানার বদলে ময়দা, ক্ষীরের বদলে অ্যারারুট। এতে আবার মিষ্টি হয়? আমাদের এখানে বাপু—ও কি রে টুটু একটা খেয়ে রেখে দিচ্ছিস যে?'

টুটু সেই অভাগা কলকাতার ছেলে হয়েও বলে, 'চার চারটে ফুটবল খেতে পারে মানুষ?'

অতএব আবার হাসির ধুম!

'বাবা, কি মজার মজার কথাই বলতে পারে টুটু!'

তার মানে টুটু এখন সকলের মাথার মণি! টুটু হাসলে মানিক ঝরবে, টুটু কথা বললেই বাহবা পড়বে।

ভাই-বোনেরা সবাই টুটুকে নিয়ে টানাটানি।

'আয় টুটু, বাগান দেখিয়ে আনি।...চল্ টুটু রাস্তায় বেড়িয়ে আনি।...টুটু ছাতে যাবি?...টুটু ক্যারাম খেলবি?...টুটু তাস খেলতে জানিস?...কি কি জানিস?... টুটু গাছে উঠতে পারিস! চল তবে পেয়ারা পাড়বি।'

কথাটি শুনতে পেয়ে পিসেমশাইয়ের মা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, 'ও-সব কথা কেন? ও-সব কথা কেন? নিজেরা গেছো বাঁদর আছো থাকো। ও বেচারা ছেলেমানুষ, শহুরে ছেলে, ওকে কেন নাচাচ্ছো?'

কিন্তু বললে কি হবে, টুটুর চুল থেকে নখ পর্যন্ত সবাইতো ইত্যবসরে নেচেই উঠেছে।

গাছ থেকে পেয়ারাপাড়া!

কিন্তু টুটুর মনে হয় যেন স্বর্গোদ্যান!

এর চাইতে রোমাঞ্চময় প্রস্তাব আর কি আছে?

মামার বাড়িতে তো এ সব হবার জো নেই।

মফস্বল হলে কি হবে, আর পেয়ারা গাছ থাকলেই বা কি হবে? মা থাকেন তো সঙ্গে। আর মায়ের মতে পৃথিবীর ওঁচা জিনিস হচ্ছে ডাঁশা পেয়ারা! কারণ, মার নিজের নাকি পেয়ারা খেলেই পেট ব্যথা করে। অতএব মা ধরে নিয়েছেন জগতের সবাইয়েরই তাই করবে।

অথচ এ বাড়িতে?

পেয়ারা সম্বন্ধে কোনো নিষেধ নেই।

টুটু আর দাঁড়ায়?

প্রস্তাবকারীদের সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ হাওয়া। পিসী চেঁচিয়ে বলে, 'ওরে সত্যি যেন গাছে চড়িসনে—'

কিন্তু সে-কথা কার কানে যাচ্ছে?

'বাগান বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নয়, পিসীর বাড়ির পিছনের এই জমিটা। বড় বড় লিচু গাছ, আর আজে বাজে কিছু জঙ্গল, কিন্তু টুটুর মনে হয় যেন স্বর্গোদ্যান!

কুমকুম

পেয়ারা গাছ, জাম গাছ, জামরুল গাছ, ফলসা গাছ, এই সব দাঁড়িয়ে আছে ডালভরতি ফল নিয়ে!

টুটু যেন নিথর হয়ে বসে পড়ে।

না, গাছে উঠতে চায় না টুটু, খেতেও চায় না, শুধু দেখতে চায়, অনুভব করতে চায়।

হায়, টুটু যদি কলকাতার ছেলে না হয়ে এখানের ছেলে হতো!

অসম্ভব ভালো লেগে যায় টুটুর পিসীর বাড়িটা।

বিশেষ করে এক সঙ্গে এত ছেলে-মেয়ে কারোদের বাড়িতে দেখে নি টুটু। একমাত্তর বিয়েবাড়িতে ছাড়া। এখানে কিন্তু এরা সবাই সব সময় থাকে।

টুটুদের মত টেবিলে তো খাওয়া-দাওয়া নয় এখানে, মাটিতে পিঁড়ি কি আসন পেতে খাওয়া!

লম্বা দালানে যখন দু সারি পিঁড়ি পাতা হয় আর ঝকঝকে ঝকঝকে ছোট ছোট কাঁসার থালা পড়ে, টুটুর যে দেখতে কী ভালোই লাগে! তাছাড়া এতজনের সঙ্গে বসে যেন খিদেও বেড়ে যায়।

বাড়িতে টুটুর খাওয়া নিয়ে মা রোজ রাগারাগি করেন, আর রোজ টুটুকে চেপে বসিয়ে নিজে একঘণ্টা সময় খরচ করে খাইয়ে দেন, আর এখানে?

টুটু নিজেই কপাকপ খেয়ে নিচ্ছে।

বাবা তো সেই যে টুটুকে ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন আশ্রয় নিয়েছেন, তারপর আর বাবার সঙ্গে টুটুর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। টুটু ভাই-বোনেদের মধ্যেই ডুবে আছে। তাদের সঙ্গে নাওয়া, তাদের সঙ্গে খাওয়া, তাদের সঙ্গে শোওয়া, তাদের সঙ্গে বেড়ানো!

টুটু বলে, 'তোদের কী মজা! কত জন তোরা! আর আমার? শুধু আমি আর বড়রা!'

ওরা সহানুভূতির গলায় বলে, 'আহা কী কষ্ট!'

টুটুর সেই কষ্ট ঘোচাতে ওরা প্রায় সর্বদাই সেবাও করে থাকে টুটুকে। টুটুরও

কুমকুম

সবাইয়ের সঙ্গেই ভাব হয়ে যায়। পরদিন চললো সবাই টুটুকে নিয়ে বুড়ো শিবতলায়। শিবঠাকুর নাকি সেখানে জাগ্রত, গভীর রাত্রে নাকি নন্দী-ভৃঙ্গীর সঙ্গে কথা কন, সিদ্ধি খান। লোকে ধোঁয়া পর্যন্ত দেখেছে।

শুনে টুটুর চোখ কপালে ওঠে আর কি!

তারপর টুটু ধরে পড়ে, 'চল না চুপি চুপি গভীর রাত্তিরে গাছের আড়াল থেকে শিবঠাকুরকে দেখে আসি।'

পিসীর দেওরের ছেলে নিমাই হচ্ছে এ-সব বিষয়ে ওস্তাদ, ভয়-ডর নেই। তবু সে শিউরে ওঠে, 'ওরে বাবা, বলিস কি? দেবতাদের দেখলে চোখ অন্ধ হয়ে যায় না?'

টুটু জোর গলায় বলে, 'ইস্ তাই বইকি! ধ্রুব, প্রহ্লাদের চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল বুঝি?'

'আহা তাঁরা তো ভক্ত ছিলেন।'

'আমরাও ইচ্ছে করলে ভক্ত হতে পারি।'

'আহা রে ইচ্ছে করলেই যেন ভক্ত হওয়া যায়। অনেক তপস্যা করতে হয়। তাছাড়া ধর যদি নন্দী-ভৃঙ্গী দেখে ফেললো? তখন? তারা আর আস্ত রাখবে আমাদের?'

টুটু ম্লান গলায় বলে, 'আমরা তো আর তাদের অনিষ্ট করতে যাব না, শুধু একটু দেখবো।'

'আরে বাবা দেখাই তো চলবে না।'

'বড়রা দেখেন?'

'দূর পাগল! বড়দেরই বুঝি ভয় নেই? নন্দী-ভৃঙ্গী ছোট বড় মানবে? রাত্তিরে যাওয়া হবে না, কাল সোমবার আছে, বুড়ো শিবের ওখানে মেলা বসে, দেখিয়ে নিয়ে আসবো।'

তা নিয়ে আসে পরদিন ওরা টুটুকে মেলা দেখিয়ে। খুব বড় মেলা হয়, সপ্তাহে

কুমকুম

সপ্তাহে বসে, তবু টুটুর ভারী ভালো লাগে। কেমন যেন লোকগুলো 'জয় বাবা বুড়ো শিব, হর হর শম্ভু' বলে চিৎকার করে করে উঠছিল, শুনে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর-আর হঠাৎ ওদের সঙ্গে রেলের দেখা সেই কিম্ভূত লোকটার কোথায় যেন মিল পায় টুটু।

টুটুর মনটা কেমন করে ওঠে।

আহা জীবনে তার দেখা হবে না তার সঙ্গে। কোনো গল্প শোনা যাবে না তার। জানাই যাবে না কি তার নাম, কোথায় তার দেশ, কে ছিল তার সেই জমিদার বাবু!

পিসী টাকা দিয়েছিল, মেলা থেকে খেলনা কিনতে। কিন্তু নিমাই, সত্য, রাজু, মনু কেউ কিছু কিনবে না, শুধু টুটু কিনবে, এটা ভারী খারাপ লাগলো টুটুর। তাই টুটু বললো, 'খেলনা কিনবো কি! ধেৎ! এত বড় ছেলে! তার চাইতে বরং সবাই মিলে চিনেবাদাম কিনে খাওয়া হোক।'

রাজু বলে ওঠে, 'ইস্ তাই বইকি! তোমার টাকা ভুলিয়ে নিয়ে আমরা খেয়েছি শুনলে মা রাগ করবে না?'

'ভুলিয়ে আবার কি?' টুটু লজ্জায় লাল হয়ে বলে, 'আমি তো ইচ্ছে করে—'

চিনেবাদাম আর বৈঁচি।

বন-ভোজনটা মন্দ হয় না।

টুটু মন্দিরের ধারে একটা ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপের উপর বসে বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে উদাস নেত্রে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে ভাবে, ছেলেদের কিছুই করবার জো নেই। টুটু যদি বড় ছেলে হতো, নির্ঘাত টুটু একা একা গভীর রাত্রে একটা টর্চ নিয়ে চলে আসতো এখানে। দেখতো, শিব জেগে উঠে কীভাবে সিদ্ধি খান, আর গল্প করেন।

ছোটরা যে কেনই এত দেরি করে বড় হয়?

একটি একটি ঘণ্টা দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ভরিয়ে একটি দিন, একটি একটি দিন দিয়ে

কুমকুম

তিরিশটি দিনে মাস। আর বারো বারোটি মাস দিয়ে একটি বছর। তারপর কতগুলোই যেন বছর জমিয়ে বড় হওয়া।

বাবা !

তবে আবার ছোট থাকার মজাও আছে।

সেই মজাটা বোঝা যায় সন্ধ্যা বেলা।

যখন পিসেমশাইয়ের বাবা নাতি-নাতনীদের নিয়ে গল্প বলতে বসেন।

যতক্ষণ না পিসীমাদের রান্না শেষ হয়, আর ছোটদের এবার ডাক পড়ে, ততক্ষণ গল্প চালিয়ে যান দাদু।

আর কিসের গল্প ?

না শিকারের গল্প। বাঘ, কুমির, হাতির এই সব।

প্রথম জীবনে নাকি দাদু সুন্দরবনের আবাদে কাজ করতেন। সেখানকার সব জোরালো জোরালো বিপদের আর বিপদ উদ্ধারের গল্প। টুটুর নিজের দাদু নেই, তাই টুটুর কাছে এ এক ভারী নতুন স্বাদের জিনিস।

কলকাতায় তো সন্ধ্যাটা কাটে শুধু পড়া মুখস্থ করে, আর অঙ্ক কষে।

নিমাইরাও তো স্কুলে পড়ে, তবু সন্ধ্যাটা কেমন মজা করে গল্প শুনে কাটায়। দাদু বলেন, 'শুনবে বইকি, গল্প শুনবে না ? কেবল পড়া আর পড়া করলে চলবে কেন ? প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে যে ওদের। ভোরবেলা উঠে লেখাপড়া সেরে নেবে। তা'ছাড়া—গল্প শোনাও একরকম পড়া, ওতেও জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ে।'

টুটু বাবাকে ডেকে ডেকে বলে, 'শুনছো বাবা, শুনছো ?'

বাবা হেসে বলেন, 'শুনছি বইকি ! তবে চল এখান থেকে দাদুকে নিয়ে চল।'

তার মানে কথা এড়ানো !

তার মানে কলকাতায় গেলেই গল্প-টল্প বন্ধ !

টুটুর নিঃশ্বাস পড়ে।

আহা মাত্র এই ছুটির কটা দিন !

কুমকুম

ব্যস, তারপরই সব সুখ শেষ! বাগানে বেড়ানো শেষ, বুড়ো শিবতলা আর কালীতলায় বেড়াতে যাওয়া শেষ, মাঠ-ঘাট-জঙ্গল পেরিয়ে ফুল তুলে আনা শেষ, দালানভরতি পিঁড়ির সারিতে বসে খাওয়া শেষ, বড় একটা হল ঘরের টানা লম্বা বিছানায় অনেকজনে ঠেলাঠেলি আর হাসাহাসি করে শোওয়া, আর ধমক খেয়ে না ঘুমিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকার মজা শেষ, আর সর্বোপরি ওই গল্প শোনাটিও শেষ!

কলকাতায় গেলেই যেন অঙ্কর মতন জীবন।

ছুটির দিনগুলো গুনতে থাকে টুটু কদিন গেল, কদিনই বা রইল?

কিন্তু ক'টা দিনই বা গেল? সব দিনগুলোই তো রয়ে গেল।

অথচ টুটুর সুখের দিন ফুরিয়ে গেল।

গেল।

বড় অকস্মাৎই গেল।

কিন্তু যাবার কি সত্যিই কোনো কারণ ছিল?

টুটু অন্ততঃ বোঝে না ছিল কি না।

পাশের বাড়ির একটা লোকের কি যেন খুব একটা অসুখ করেছে বলেই এ বাড়ি থেকে টুটুকে চলে যেতে হবে এ কী আশ্চয্যি কথা!

অথচ সেই আশ্চয্যি কথাটিই বললেন বাবা।

বললেন, 'ওরে সর্বনাশ! তাহলে টুটুকে নিয়ে আর না।'

পিসী কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'আমার কপাল! জন্মে কখনো আসো না তোমরা—যদি বা বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে এলে, তাও এই হলো!'

টুটু এই সময় রেগে-টেগে চেঁচিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'বাঃ, লোকেদের বাড়িতে অসুখ করেছে তো আমাদের কি? আর তোমরা সবাই তো থাকবে, শুধু আমার বেলাতেই দোষ?'

পিসেমশাইয়ের মা ভাঙা ভাঙা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'তা হোক

দাদু, তোমার মা রয়েছে দূরে, ভয় করে। মায়ের বাছা মায়ের কাছে যাওয়াই ভালো।'

পিসেমশাইও তাতেই সায় দিলেন, 'সেই তো কথা!'

শুধু দাদু বলেছিলেন, 'সাবধানে থাকলে কোনো আশঙ্কা নেই। জল-টল ফুটিয়ে খাওয়া হোক, মাছ-টাছ না হয় না খাওয়া হোক—সবাইয়ের জন্যেই তো ভাবনা—'

—মায়ের বাছা মায়ের কাছে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু পিসেমশাই বলে উঠলেন, 'তা হোক বাপু পরের ছেলে—'

শুনে, দুঃখে চোখে জল এল টুটুর।

এই বাড়িটাকে ও এত আপনার ভাবছে, বড় হয়ে এইখানেই থাকবে ঠিক করছে, আর পিসেমশাই কিনা স্বচ্ছন্দে বললেন, 'পরের ছেলে।'

তবে হ্যাঁ, নিমাই, রাজু, মনু, সত্য, ফুটুদি, বিধুদি, সবাই দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়লো!

এই দু'দিন পরেই তাদের চড়ুইভাতির ব্যবস্থা পাকা হচ্ছিল! বড়রা রাজী তো হয়েই ছিলেন, অনেক সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন। চৌধুরীদের পোড়ো বাড়ির উঠোনটাকে স্থান নির্বাচন করে ওঁরাই রাখালকে পাঠিয়ে সেখানটা পরিষ্কার করাচ্ছিলেন। তাছাড়া বলেছিলেন হাঁড়ি, কড়া, কাঠ, দেশলাই এ-সব তো দেবেনই,

খিচুড়ি আলুর দম আর চাটনিতে যা যা কিছু লাগে সে-সবও গুছিয়ে আন্দাজমত দিয়ে দেবেন।

রাজু বলেছিল, 'আর দেখিস যতই মা কাকীমা বলুন তোরা রাঁধবি তোরা খাবি, নিজেরাও ঠিক এসে হাজির হবেন। চড়ুইভাতির দিন যা মজা হয়।'

টুটু জীবনেও কোনোদিন চড়ুইভাতি দেখে নি।

দু-একবার 'পিকনিক' দেখেছে। অনেকটা এই ধরনেরই কিন্তু সে তো সবটাই বড়দের ব্যাপার! ছোটরা সেখানে ফালতু, ফাউ!

আর এখানে—

সবটাই ছোটদের ব্যাপার।

বিধুদিই নাকি রান্নার ভার নেবে, আর সবাই কাঠ কাটবে, জল তুলবে, পরিবেশন করবে, কলাগাছ থেকে কলাপাতা কেটে আনবে, আর সারাদিন হইচই করবে! দুটোদিন পরেই ঘটতে যাচ্ছিল সেই আশ্চর্য ঘটনা, আর আজ কিনা এই!

ভগবানও ঠিক বড়দের মতই অবুঝ। কেন, পাশের বাড়ির ওই লোকটার এত বেশী অসুখ না করিয়ে দিয়ে চলছিল না তাঁর?

তবু এই অসুখ করার সঙ্গে টুটুর চলে যেতে হওয়ার কোনো মানে পেল না টুটু! অসুখ।

রাজু, নিমাই, মনুদের অসুখ করলেও তো সেই একই ক্ষতি! অথচ বাবা দিব্যি বলছেন, 'না বাবা, আর একদিনও না।'

অবশ্য প্রথমে বাবা এ বাড়ির সব ছোট ছেলেদেরই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পিসীমা তো তাতে রাজী হল না কই? বললে, 'না না সববাইকে নিয়ে গিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না।'

তার মানে কলকাতায় গিয়েও যদি একটু আমোদ হতে পারতো, তাও হলো না।

আশ্চর্য! বাবা এদিকে সব সময় টুটুর কথা ভুলে থাকেন, কিন্তু কোথায় কাদের

কুমকুম

বাড়ি অসুখ করেছে বলেই অমনি বিষম ভাবে মনে পড়ে গেল টুটু বলে তাঁর একটা ছেলে আছে, আর অসুখের পাড়া থেকে তাকে নিয়ে পালানো উচিত।

আর কিছুই না, টুটুর কপাল!

যাক যেতেই যখন হবে, উপায় কি!

টুটু বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়পর্ব সেরে ফেললো, আর বন্ধুদের দেওয়া জিনিসপত্তর নিজের সুটকেসে ভরে ফেললো। চুপি চুপিই ভরতে হল। জিনিসগুলো এমন যে, বাবা দেখলে নির্ঘাত ফেলে দেবেন।

অথচ কলকাতায় গিয়ে কি জীবনেও পাবে টুটু পেঁপের ডালের গুলতি, নিমফলের ছটক্, আম আঁটির কানাই বাঁশি, এ্যাত্তোটুকুন টুকুন ডাবের ছানা, পদ্মবীজের মালা!

বাবা তাড়া দিলেন, 'টুটু ট্রেনের সময় হয়ে যাবেই।'

টুটু তাড়াতাড়ি এসে সাইকেল রিকশায় ওঠে।

আজও ডজন দুই লোক তাকে ঘেরাও করে দাঁড়ায়। কিন্তু সেদিন ছিল সকলের হাসিভরা মুখ, আর আজ সকলের কাঁদো কাঁদো মুখ।

অবশেষে রিকশা ছাড়ে।

টুটু গম্ভীরমুখে বসে থাকে, বাবার সঙ্গে কথা বলে না।

টুটু শুধু ভাবতে থাকে, কেন টুটুকে এমন মন-দুঃখু করে চলে আসতে হল! মা যে বলেন ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে, এতে কার কি মঙ্গল হল?

কিন্তু টুটু একথার উত্তর পেল।

স্টেশনে পিসেমশাই আর পিসেমশাইয়ের ভাইও এসেছিলেন নিজেদের সাইকেল চড়ে। তাঁরাই টিকিট কিনে ফেলেছিলেন ইতিমধ্যে।

টুটুদের দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'চটপট চটপট! এ ট্রেনটা মাত্র এক মিনিট থামে। এসে গেল বলে।'

বলতে বলতেই এল সত্যি।

হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়তে হলো টুটুদের। আর সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন চলতে শুরু করলো।

তবু ভালো যে ভিড় বেশী নেই। এইটুকু ভেবে টুটু সামনের দিকে তাকালো, আর পরমুহূর্তেই টুটু যেন পাথর হয়ে গেল।

আর সেই সঙ্গেই টুটু তার সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল।

কেনই যে তাকে আসতে হল বুঝলো।

টুটু কি স্বপ্নেও ভেবেছিল, এমন আশ্চর্যভাবে উত্তরটা পেয়ে যাবে সে?

টুটু শুধু শুধু ভগবানকে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছে ভেবে মনে মনে কান মুললো, তারপর টুটু এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

(৪)

টুটু এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল, কিন্তু টুটু কোনো কথা বললো না। টুটু শুধু তাকিয়ে রইলো।

কথা কইলো আসনের লোকটি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ভয়ানক ভাঙা গলায় একটা উল্লাসের চিৎকার করে উঠলো। যেটা শুনতে ঠিক বাঘের গর্জনের মত লাগলো। তারপর লোকটা বসে পড়ে, তেমনি গলায় বললো, 'টুটু বাবু!'

টুটু এতক্ষণে কথা বললো।

বললো, 'তুমি আবার ফিরে যাচ্ছ যে? বলেছিলে এখন তুমি দেশে যাচ্ছো থাকতে।'

কিম্ভূত একটু হাসলো। টুটুর মনে হল যেন কাঁদলো, এমন দুঃখময় মুখ তার। তারপর সে বললো, 'নাঃ। হামি জঙ্গলের জীব আছি, ফিন জঙ্গলেই ফিরে যাবে।'

টুটুর ইচ্ছে হচ্ছিল ওর গায়ে হাত বুলোয়, কিন্তু গা কোথায় পাবে ওর, সবই তো জামায় ঢাকা। তাই টুটু শুধু ওর গা ঘেঁষে বসলো।

কুমকুম

হঠাৎ এই সময় টুটুর বাবার চোখে পড়লো আবার সেই দৃশ্য! যাবার সময় যা দেখেছিলেন! সেই কিম্ভূতকিমাকার লোকটা, সেই তার গা ঘেঁষে টুটু! এ কী আশ্চর্য!

লোকটা কি তবে হাত গুনতে জানে? তাই গুনে বুঝে ফেলেছে ঠিক এই দিন এই ট্রেনে টুটু থাকবে। তাছাড়া সম্মোহন বিদ্যাও জানে। আর সেটা সেই সেদিন যাবার সময়ই করে বসে আছে টুটুকে। আর ওর প্রভাবেই হয়তো—

টুটুর বাবা ভূত, পেত্নী, বেহ্মদত্যি মানেন না, তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্রও মানেন না, তবু টুটুর বাবার একটা কথা ভেবে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল।

কে বলতে পারে ওর প্রভাবেই টুটুর পিসীর বাড়ির পাশের সেই লোকটার কলেরা হয়েছে কিনা। কলেরা হলো বলেই না টুটুকে চলে আসতে হলো। তারপর—চলে এসে এখন টুটু ঠিক ওর কাছে গিয়েই বসেছে!

কে বলতে পারে টুটুকে ও মন্ত্রপূত করে ফেলবে কিনা। হয়তো টুটু আর আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরতে চাইবে না, ওর সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেতে চাইবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে টুটুর বাবা এদিকে সরে আসেন, সাবধানে গম্ভীর গলায় ডাকেন, 'টুটু!'

কিন্তু টুটু কিছু বলার আগেই লোকটা হঠাৎ ভাঙা গলায় জোরে হেসে উঠে বলে, 'হামি আপোনার ছেলের কুছ ক্ষতি কোরবে না বাবু, মিছামিছি ডর কোরবেন না।'

টুটুর বাবা এই রেলগাড়িসুদ্ধ লোকের কাছে লজ্জিত হন। তাড়াতাড়ি বলেন, 'সে কি? সে কি? আমার ছেলের সঙ্গে আপনার ভাব হয়ে গেছে, তাই আলাপ করতে এলাম।'

'ওঃ! আচ্ছা!'

লোকটা হঠাৎ খৈনি বার করে টিপতে টিপতে বলে, 'হামি বুঝছে যে আপোনার ডর লেগেছে। হামি লোকটা তো একটা ভূত আছে। তো হামি বাচ্চা

ছেলেলোগকে বহুৎ ভালোবাসি। এই টুটু বাবু হামার দোস্ত হোয়েছে। ওকে হামি বহুৎ ভালোবাসছি। তব হামি ওকে কী ক্ষতি কোরতে পারি?'

টুটুর বাবা আরো লজ্জিত হন।

সরে গিয়ে বসেন। আর একটু হেসেই বলে যান, 'আচ্ছা টুটু তোমরা গল্প করো।'

গল্প করতে থাকে টুটু, কে জানে কী গল্প। হাওড়া স্টেশন এসে যায় কোন কাকে।

গাড়ি থেমে যায়।

টুটু ওর পথে পাওয়া বন্ধুর মোটা মোটা শির ওঠা হাতটা চেপে ধরে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবা, ইনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে।'

'ইনিও!'

টুটুর বাবা তো হাঁ।

ইনিও যাবেন কি! নির্ঘাত, নির্ঘাত সম্মোহন।

অথচ বলতেও পারেন না, বেশ তো ভালোই তো। তাই ফিকে ফিকে হাসি হেসে বলেন, 'আ—চ্ছা!'

কিন্তু লোকটা তো আর সত্যি টুটুর মত অবোধ নয়? তাই হেসে উঠে বলে, 'আসবে, আসবে টুটুবাবুর বিয়ার সময় আসবে হামি। এখোন হামি নেপাল চলে যাবে।'

ও টুটুর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়।

টুটু কাঁদো কাঁদো অবাক্ গলায় বলে, 'সে কি? তবে যে তুমি বললে, তোমার সব গল্প আমায় বলবে। চলে গেলে কি করে বলবে?'

'বোলবে, সব গোল্পো বলবে—' কিম্ভূত হঠাৎ তার কাঁধের ঝুলিটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা ঝরঝরে হাতে বাঁধাই মোটা খাতা বার করে, 'খাতা' না বলে পুঁথি বললেই ঠিক বলা হয় তাকে। সেইটা টুটুর দিকে বাড়িয়ে ধরে সে বলে, 'এই ভূতটা

তোমায় গোল্লো বোলবে। ভূতটা বহুৎদিন হামার কাঁধে চেপে বোসেছিল, এখোন হামার ছুটি!'

টুটু তো খাতা বা পুঁথি হাতে উদ্‌ভ্রান্ত।

'বাঃ, তুমি দিয়ে দেবে কেন? তোমার কত কষ্ট করে লেখা!'

'কোষ্টো?' লোকটা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ওটা তো মিছামিছি কোষ্টো কোরেছে হামি। তুমি যদি কোষ্টো কোরে পোড়বে, তব্ কুছ সফল হোবে।'

বলেই চট করে জোর পায়ে হেঁটে ভিড়ে মিশে যায়।

টুটু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, সেই কাগজের গোছা হাতে করে। সরু সরু লম্বাটে কাগজের গোছা।

টুটুর বাবা এতক্ষণ কুলী আর জিনিস সামলাচ্ছিলেন, এবার তাকিয়ে দেখেন টুটু 'রাহুমুক্ত' হয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'তোর বন্ধু কোথায় গেল?'

টুটু ধরা গলায় বলে, 'নেপালে।'

'নেপালে? একদম নেপালে চলে গেল?' বাবা হেসে বলেন, 'তোর হাতে ও কি?'

'জানি না।'

বলে টুটু বাবাকে ছাড়িয়ে গটগট করে এগিয়ে যায়। কে বলতে পারে বাবা ওগুলো কেড়ে নিয়ে ফেলে দেবেন কি না 'ময়লা নোংরা কাগজ' বলে।

বিনা খবরে ফেরা।

বাড়ি ফিরতেই টুটুর মা হইচই করে উঠলেন, 'ওমা, ফিরে এলি যে এক্ষুণি? পাড়াগাঁয়ে ভালো লাগলো না বুঝি? তখনই ভেবেছিলাম—।'

পাড়াগাঁ-টা টুটুর বাবার বোনের বাড়ি, তাই তিনি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'আরে ভালো লাগবে না কি, খুবই ভালো লেগেছিল। চলে আসতে হলো অন্য কারণে! পাশের বাড়িতে হঠাৎ কলেরা! প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাই না।'

'কলেরা!'

টুটুর মা প্রায় মূর্ছা যাবার যোগাড়!

কুমকুম

ইত্যবসরে টুটু নিঃশব্দে সরে গিয়ে কিম্ভূতের সেই পুঁথিখানা একেবারে ছাতের উপর চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রেখে আসে। সেই সঙ্গে রেখে আসে পিসীর বাড়ির 'বন্ধুদের' কাছে পাওয়া উপহারগুলো, যা টুটু চুপিচুপি নিজের ব্যাগে ভরে ফেলেছিল। সেই পেঁপের ডালের গুলতি, নিমফলের ছটরা, আম আঁটির কানাই-বাঁশি, এ্যাভোটুকুন ডাবের-ছানা, পদ্মবীজের মালা!

এই ঘরটায় বাড়ির যত আলটু-পালটু জিনিস থাকে। যেমন কল ভাঙ্গা সুটকেস, ডালা ভাঙ্গা ট্রাঙ্ক, শিক ভাঙ্গা ছাতা, চাকা ভাঙ্গা সাইকেল। তাছাড়া —যে সব জিনিস একদা টুটুর কাজে লেগেছে, এখন আর লাগে না সেই সব আস্ত জিনিসও।

ঘর যেমন দোলনা, নাইবার গামলা, ছোট্ট ছোট্ট বালিশ বিছানা, ট্রাইসাইকেল, পেরাম্বুলেটার! টুটুর তো আর কোনো ছোট ভাই-বোন নেই, তাই এসব আর দরকার হয় নি, পড়ে পড়ে ধুলো হচ্ছে। এই ঘরটি হচ্ছে টুটুর নিজস্ব গুপ্ত ভাঁড়ার। খাঁজে খোঁজে অনেক লুকনো জায়গা। তিন লঙ্গর দিয়ে ঘুড়ি কেটে নিয়ে লুকিয়ে রাখবার জায়গাও টুটুর এটাই, আর বন্ধুর বাড়ি থেকে বই চেয়ে এনে পড়বার জায়গাও।

এই ঘরটায় বাড়ির যত আলটু-পালটু জিনিস থাকে।

ওই দুটো ব্যাপারেই মার মহা আপত্তি কিনা।

বই চেয়ে আনা দেখলেই বলবেন, 'বাড়িতে এত বই, সেগুলো শেষ করেছ? বাড়ির বই শেষ করে উঠতে পারো না অথচ—।'

আরে বাবা হঠাৎ একটা মজার বই হাতে পেলেই যে পড়তে ইচ্ছে করে যায় এটা বুঝবেন না মা। বাড়িতে তো সবই মজার বই নয়?

আর ওই ঘুড়ি।

তিন-চার পয়সায় কিনতে পাওয়া যায় বলেই তিন লঙ্গর করে নামিয়ে আনা ছেড়ে দেবে লোকে? ওই কেটে নেওয়াটাই তো মজা! দামই বুঝি সব? পয়সা দিয়ে তো বাসন-টাসন সবই কিনতে পাওয়া যায় দোকানে, তবে মা নিজে কেন পুরনো সব জামা-কাপড় দিয়ে বাসন কেনেন? মজা বলেই তো?

তবে সবচেয়ে মজা এই—

টুটুর মজাটা কেউ বোঝে না। টুটুর যাতে মজা, টুটুর তাতেই সাজা! তাই না টুটুর এই গুপ্ত কক্ষের দরকার হয়।

টুটু নেমে আসতেই মা সন্দেহের গলায় বলেন, 'রেল থেকে এসেই হাতমুখ না ধুয়ে ছাতে উঠেছিলি যে?'

'এমনি।'

'এমনি! তোর এমনিকেও ধন্যবাদ বাবা!...শুনলাম নাকি রেলগাড়িতে একটা সাংঘাতিক লোকের কবলে পড়ে গিয়েছিলি? যেতে আসতে দু-বারই সে তোকে 'মন্তর' করেছিল! শুনে তো ভয়ে হাত-পা কাঁপছে আমার! এইসব লোকই ছেলেধরা হয়। মন্তর পড়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। ওরে বাবা! তাকে তুই বাড়ির ঠিকানা দিস নি তো? তুই সব পারিস!'

টুটু হঠাৎ রেগে যায়।

টুটু সতেজে বলে, 'দিয়েছিই তো ঠিকানা! কী, হবে কি? সেই লোক তোমার ছেলেকে ধরে নিতে আসবে? মোটেও ভেবো না।'

টুটু গটগট করে মুখহাত ধুতে চলে যায়।

আর টুটুর মা হতাশ হয়ে ভাবেন, হয়ে গেছে মন্তরের ক্রিয়া। টুটু আমাদের কাছ থেকে যেন সরে গেছে! হায় হায় কী হবে?

টুটু হয়তো বলবে, 'ছেলেধরা' বলে কিছু নেই!' কিন্তু নেই যদি এতো ছেলে হারায় কেন?

তা টুটুর মার দুশ্চিন্তাটাও নেহাত বাজে নয়।

আছে বই কি ছেলেধরা।

আছে তাদের মন্তর।

তবে তারা নিজেরা হয়তো জানে না মন্তরটা কি। ছেলেগুলোই মুগ্ধ হয়ে ছুটে যায় তাদের কাছে। গিয়ে হারিয়ে যায়। মার আড়ালে ছুটির দুপুরে চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে সেই কথাই আবিষ্কার করে টুটু।

ছেলেধরা আছে বলেই জগতে এত ছেলে হারায়।

লুকিয়ে রাখা সেই কিম্ভূতের পুঁথি থেকে আবিষ্কার হচ্ছে সেই কথা। হচ্ছে। কারণ ধীরে ধীরে পড়তে হচ্ছে টুটুকে। সময় কতোটুকু টুটুর? সকাল বেলা স্কুলের পড়া, তার পরে স্কুল, তারপর মাঠে খেলতে নামা, তারপর আবার স্কুলের পড়া, ছুটির দিন ছাড়া সময়ই নেই।

তবু কী ভাগ্যি ওর হাতের লেখাটা কিম্ভূত নয়। যদিও সে ভয় হয়েছিল টুটুর। কিন্তু টুটু মলাটের কাগজটা খুলে দেখলো লেখা পরিষ্কার। প্রথম লিখতে শিখে টুটু যেমন লেখা শেলেটে লিখতো, তেমনি বড় বড় আস্ত আস্ত অক্ষর। কাগজগুলো হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো ঝুরঝুরে, তবু পড়তে অসুবিধে হয় না।

কাগজের রং দেখলেই বোঝা যায়। এ লেখা অনেক দিন ধরে ক্রমে ক্রমে লেখা হয়েছে, তাই এক এক গোছা কাগজের যেন আলাদা আলাদা রং। ময়লা, বেশী ময়লা, আরো ময়লা, ভীষণ ময়লা, সাংঘাতিক ময়লা, যাচ্ছেতাই ময়লা!

তবে টুটু তাতে দৃক্‌পাত করে না, টুটু অধীর আগ্রহে পড়ে যায়।

কুমকুম

প্রথমেই ছিল মা সরস্বতী আর দেবী দুর্গাকে প্রণাম, সেকালের পদ্ধতিতে পয়ার ছন্দে।

বন্দিয়া মা দুর্গা দেবী, বন্দি সরস্বতী,
লিখিতেছি এ-কাহিনী, আমি দীন অতি।
অভাগা নির্বোধ আমি নিজ কর্মফলে—
আগাছার মত আছি এই ভূমণ্ডলে।
কোথা মাতা কোথা পিতা কোথা আত্মজন,
দূর দূরান্তরে আমি ভ্রমি অকারণ।
তবু নিত্য লিখি এই জীবন-কাহিনী,
মনে আশা কোনোদিন দেখিবে জননী।
দেখিবেন পিতা আদি অন্য পরিজনে,
আবার পাইব ঠাঁই তাঁদের চরণে।
বর্ধমান জেলামধ্যে খণ্ডঘোষ গ্রাম,
পিতা তার জমিদার নাম রাজা রাম।
মোর নাম বাবুরাম ছিল এক কালে,
এখন কতই নাম জুটিছে কপালে।
তবু দস্তখৎ করি বাবুরাম রায়,
অতঃপর লিখি—দুই দেবীর কৃপায়।

তারপর গদ্য শুরু—

হ্যাঁ, আমার নাম বাবুরাম রায়। জমিদারবাবুর একমাত্র ছেলে তাই আদরের নাম বাবুরাম! কারণ ভবিষ্যতে তো প্রজাদের 'বাবুমশাই' হবো!

টুটু একটু অবাক্ হয়ে ভাবে, ওর কথাগুলো কী অদ্ভুত! লেখাটা তো বাংলা ভাষা। তারপর ভাবলো, আহা আসলে তো বাঙালীই। অন্য অন্য দেশে ঘুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কথাগুলো ওই রকম হয়ে গেছে।

আবার পড়তে থাকে···আশ্চর্য, নিজেকেই যেন বলছে নিজে।

কুমকুম

বাবুমশায়! বাবুমশায়! বাবুমশায় না হতভাগা! বাবুমশাই যদি তো লেখা-পড়ায় মন নেই কেন তোর? পাঠশালে তোর আলাদা খাতির, ইস্কুলে আলাদা চেয়ার! বাড়িতে দু দুটো মাস্টারমশাই, তবু তোর মন উড়ু-উড়ু প্রাণ ছটফট? কেন রে মুখ্যু, গাধা!

মাঠে কাজ করা চাষাদের ধুলো-কাদা মাখা ছেলেগুলোকে দেখে হিংসে হয় তোর! ভেবে রাগ হয়, ওদের কেমন পাঠশালে যেতে হয় না। পূর্বজন্মে তবে তুই চাষাই ছিলি! নির্ঘাত! তাই তোর ইচ্ছে হয় দুপুর রোদ্দুরে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াই, বর্ষার দিনে ভরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাই, আর শীতের রাতে গরম জামা গায়ে না দিয়ে আগুন জ্বেলে আগুন পোহাই!

—হঠাৎ টুটুর সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়।

ঠিক! ঠিক! টুটুও তাহলে পূর্বজন্মে চাষা ছিল! টুটুরও তো ওই সবই ইচ্ছে করে।

টুটু কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে আবার পাতা ওলটায়।

* * * * *

কিন্তু তোর ওই সব ইচ্ছের কথা শুনলে তোর মা?

তোর মা স্তম্ভিত হয়ে যায়। মনে হয় তোর মা বুঝি বা ভয় পায়।

নইলে তোর মা কেবল আমায় আগলে রাখতে চায় কেন তোকে? কেন সদাসর্বদা উপদেশ দেয়, 'তুই এ গাঁয়ের জমিদারবাবুর ছেলে। গাঁ সুদ্ধু লোক তোদের প্রজা, তুই যদি নিজের মানসম্মান রাখতে না পারিস, তাহলে আর লজ্জার শেষ থাকবে না।'...কেন বলে, 'বাবু আমায় ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর তুই আমায় ছেড়ে পালিয়ে যাবি না! যা তা করে বেড়াবি না!'

এসব কেন বলতো রে তোর মা?

অন্তর্যামী বলেই তো?

জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ, নারায়ণের মতন অন্তর্যামী। নইলে ও-সব কথা বলতে যাবে কেন?

কুমকুম

আর তুই ?

তুই হতভাগা সেই কাজই করলি। মায়ের গা ছুঁয়ে যাব না বলে প্রতিজ্ঞা করে, সেই চলে গেলি! তোর মনে এল না তুই হঠাৎ হারিয়ে গেলে তোর মার কী অবস্থা হবে! ভাবলি না। লোভে আর ঝোঁকে উন্মাদ হয়ে গিয়ে—

কিন্তু এও বলি, তোরই বা দোষ কি? দোষ তোর নিয়তির। নিয়তি না হলে কার সাধ্যি রাজপুত্তুরকে রাস্তায় বার করতে পারে!

নইলে সার্কাস পার্টির ডুগডুগ, ডুগ ডুবাডুব শব্দ পাড়ার কোন্ ছেলেটা না শুনেছিল? বল, কোন্ ছেলেটা না শুনেছিল?

গ্রাম থেকে অনেক দূরে সেই ইস্টিশানের ওধারে তাঁবু গেড়েছিল ওরা। তবু তো রাত্তিরের নিস্তব্ধতায় আর ভরদুপুরের ঝিমঝিমে সময় সেই শব্দটা ভেসে আসছিল ডুগ ডুগাডুগ?

সবাই শুনছিল।

আর তোড়জোড় করছিল সার্কাস দেখতে যাবে বলে। আট আনা করে নাকি টিকিট। যোগাড় হওয়া চাই তো সে পয়সা! এক একটা বাড়িতে কত লোক! এক একটা মা-বাবার কত ছেলে মেয়ে!

আর তুমি শ্রীযুক্তবাবুরাম রায়! তুমি তোমার মা-বাপের একমাত্তর ছেলে, আর জমিদার বাপের ছেলে, তুমি তো প্রথম দিনেই জুড়ি-গাড়ি চড়ে দেখে এসেছ সার্কাস তোমাদের বাড়ির সরকার মশাইয়ের সঙ্গে?

তবে?

তবে তুই হতভাগা কেন ভরদুপুরে হাতের লেখা মক্‌শ করতে করতে হঠাৎ ওই 'ডুগ ডুবাডুব' শুনে হাতের কলম ফেলে ঊর্ধ্বনেত্রে বসে রইলি? আর তারপর কেন হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচে নেমে গিয়ে বাগানের রাস্তা ধরে ইস্টিশানের পথ পার হয়ে গেলি।

বনের বাঘ-ভালুক, হাতি, বেবুন এরা তোকে টানলো? টানলো সার্কাসের

ছেলে-মেয়েদের অসম সাহসিকতা? তাই, তাই! তা নইলে তুই ভদ্র ব্রাহ্মণসন্তান। নবছর বয়সে তোর পইতে হয়ে গেছে। পইতের এক বছরকাল পর্যন্ত খুব হিঁদুয়ানীতে থাকতে হয় বলে, তোর মা তোকে বামুন ঠাকুরের রান্নাঘরের রান্না খেতে না দিয়ে নিজে রান্না করে খাওয়াচ্ছিল। আর তুই কি না দুপুর রোদে মাঠ ময়দান ভেঙে ছুটে অনেক পথ পার হয়েছিস বলে, সার্কাসের দলের ওই চাকরটাকে গিয়ে বললি, 'একটু জল দাও তো!'

সেই জল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের সব ভালোকে খেয়ে ফেললি তুই, তা কি বুঝতে পারলি না?'

টুটু আর একবার পাতা থেকে চোখ তোলে, দেখে আকাশে কী সব পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। নীল আকাশের নীচে ঘুরে ঘুরে!···ওদের যেন কোন 'ভগবান' নেই? যে ভগবান মানুষের ভালো করেন বটে তবে শাসনও করেন সাংঘাতিক!

চাকরটাকে গিয়ে বললি, 'একটু জল দাও তো।'

ভুল করেছ কি মরেছ।

অথচ ওই পাখিরা?

যা খুশি করছে ওরা। ভুল, ঠিক বলে কিছু নেই ওদের? আকাশে উঠে গেছে, উড়ছে তো উড়ছেই।

অথচ মানুষ একবার পড়া ফেলে একটু পথে বেরিয়ে পড়ুক দিকি? মানুষে তো

শাস্তি দেবেই, ভগবানও দেবেন। বলবেন, 'যেমন তুই পড়িস নি ভালো করে, তেমনি ফেল্ হ! হ ফেল্!'

মানুষও যদি পাখির মত যথেচ্ছ উড়তে পেতো।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার খাতাটা খুলে ধরে টুটু চোখের সামনে—

(৫)

খাতাখানা চোখের সামনে খুলে ধরে টুটু যেন সেই চোখের সামনে দেখতে পায় একটা ছেলে পাঁই-পাঁই করে ছুটে চলেছে ভাজা ভাজা মাঠের ওপর দিয়ে। তার পায়ের ধাক্কায় মাঠের শুকনো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে গিয়ে ধুলো উড়ছে, আর ছেলেটার মুখটা ঘামে ভরে গেছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য ওর মুখটা যেন ঠিক টুটুর মত। টুটু ছাড়া কি আর কোনো ছোট ছেলে নেই? না কি টুটুর মনটা যত সমস্ত ছুটন্ত ছেলের সঙ্গেই ছুটতে চায়?

ওই বাবুরাম নামে ছেলেটা কে?

জমিদার রাজারাম রায়ের ছেলে বাবুরাম।

বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল যে ছেলেটা। ও কি আর বাড়িতে ফিরলো না? ছেলেটা কি শুধু কিম্ভূতের চেনা? না কি সত্যিই ওই ছেলেটাই কিম্ভূত নিজে?·····

ভাবতে ভাবতে আবার চোখ নামিয়ে লেখার দিকে মন দেয় টুটু।

"সার্কাসের চাকরটার কাছে জল চাইলাম, ও একটা ময়লা কলাই-করা গেলাসে করে জল এনে দিল আমায়। দেখে খুব ঘেন্না করলো, কিন্তু তখন এমন অবস্থা যে জল না খেলে দাঁড়াতেই পারছি না।

পারবো কোথা থেকে? রাজারামের ছেলে বাবুরাম যে! যখনই কোথাও বেড়াতে যাই তখনই তো গাড়িতে জোড়া ঘোড়া জোতা হয়। আর গাড়িতে

তুলে দেওয়া হয় জলের কুঁজো, ফলের চুপড়ি, মিষ্টির ভাঁড়! আর সঙ্গে থাকে চাকর। জলটা খাওয়ার পর মনে পড়লো আমার এ বছর পইতে হয়েছে, আমি মায়ের হাতের রান্না খাচ্ছি, আর ভাঁড়ার-ঘরের পবিত্র কুঁজোর জল খাচ্ছি। মনটা শিউরে উঠলো।

কিন্তু তখন তো জল খাওয়াই হয়ে গেছে। তাই আমি, বোকা পণ্ডিত বাবুরামবাবু, ভাবতে শুরু করলাম, আমি তো এদের কাছেই থেকে যাবো, বাড়িতে তো আর ফিরে যাবো না, তবে আবার ভাঁড়ার-ঘরের জল, মার হাতের রান্না, এ সবের চিন্তা কেন?

জল দিয়ে চাকরটা আমার সঙ্গে জমাতে চেষ্টা করলো। বললো, 'নাম কি? বাড়ি কোথায়, এখানে এসেছো কেন?' এই সব।

কিন্তু আমি, ওইটুকু ছেলে তখন এমন পাকা শয়তানের মত কাজ করলাম যে আমার মা-বাবা শুনলে আকাশ থেকে পড়তেন। বিশ্বাসই করতে চাইতেন না।

আমি মিছিমিছি করে বললাম—'আমার নাম মধু।' বললাম, 'আমার বাড়ি হরিশপুর, আর এখানে এসেছি সার্কাস শিখে সার্কাস করবো বলে।'

মধু নামটা হচ্ছে আমার এক বন্ধুর, আর হরিশপুরটা আমার পিসীমার শ্বশুর-বাড়ির দেশ। ওই দুটো মিশিয়ে নিলাম। কিন্তু কেন নিলাম? এই জন্যে নিলাম, ঠিক নাম বললে এরা আমাকে আবার আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে। জমিদার-বাবুর ছেলেকে দলে জুতে নিয়ে পালাতে সাহস করবে না।

হঠাৎ আবার লেখার ধরন ঘুরে যায়, 'আমি'র জায়গায় 'তুই' এসে যায়। রাগী রাগী ভাষা শুরু হয়।

ওরে পাজী বাবুরাম, এত শয়তানী বুদ্ধি তোর মাথায় এল কি করে? কত বয়েস ছিল তোর তখন? বল কত বয়েস ছিল? মাত্র তো সাড়ে ন বছর—"

টুটুর গা-টায় আবার কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঠিক টুটুর বয়েস।

কুমকুম

আশ্চর্য ! ঠিক টুটুর বয়েসেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল বাবুরাম।

টুটু এই ঘটনাটাকে দৈব ঘটনার মত দেখলো। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে আবার পড়তে শুরু করলো।

"সেই সাড়ে ন বছর বয়েসে তুই এত পাকা হয়েছিলি কি করে ভেবে কূল পাই না। শুধু তো চাকরটাই নয়, সার্কাসের কর্তাবাবুও তো তোকে একশো জেরা করলো, তুই কী করে শক্ত থাকলি ? চাকরটা তো বাবুরামকে নিয়ে গেল তার বাবুর কাছে।

দাঁত বার করে চাকরটা হেসে হেসে বললো, 'এই ছেলেটা সার্কাসের দলে ভরতি হতে এসেছে !'

রাগে গা জ্বলে গেল বাবুরামের, বুঝলো লোকটা তাকে ভ্যাঙাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কর্তার মুখে যেন আলো খেলে গেল।

এখন এই অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে বুঝতে শিখেছি, সে আলো লোভের আলো। আমার মতন বয়েসের একটা ছেলেকে তো সহজে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, কাজে কাজেই ছেলেটা নিজে এসে ধরা দিয়েছে দেখে তার চোখে লোভের আগুন চকচক করে উঠেছিল।

তবু সেও আমায় জেরা করলো। বললো—'নাম কি ?'

বাবুরাম নামের সেই সাড়ে ন বছরের ছেলেটা দিব্যি বুকটান করে বললো, 'মধু।'

লোকটা বাঙালী কিনা বুঝতে পারলো না বাবুরাম, তবে বাঙলাতেই কথা বলছিল। সার্কাসের সময় তাকে কালো কোট-প্যাণ্ট আর লাল 'টাই' পরতে দেখেছিল বাবুরাম, কিন্তু তখন দেখলো পরনে একটা লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি ! দিব্যি বড় বড় এক জোড়া গোঁফও ছিল তার।

গোঁফটা পাকাতে পাকাতে বললো, 'মধু ? মধু বললেই হলো ? মধু কি ?'

বাবুরাম চট্ করে বললো, 'মধুলাল।'

বাবুরামের সেই বন্ধু যার নাম মধু, তাকে তার ঠাকুমাকে ডাকতে দেখেছে 'মধুলাল মধুলাল' বলে। সেটাই বলে দিল বাবুরাম।

লোকটা বললো, 'আরে ছোঁড়াটা তো আচ্ছা হাঁদা! মধুলাল তো? তারপর? দাস? মণ্ডল? সরকার? চক্রবর্তী?'

তার যা যা জানা ছিল তাই বললো হয়তো!

বাবুরাম হঠাৎ কিছু ভেবে পেলো না, তাই সত্যিটাই বলে ফেললো, 'রায়!'

তারপরই ভয় হতে শুরু করলো, ধরে ফেলবে ধরে ফেলবে! রাজারাম রায়ের সঙ্গে জুড়ে দেবে। কিন্তু তা হলো না। লোকটা বললো, 'বাড়ি কোথায়?'

'হরিশপুর।'

'এখান থেকে কতদূর?'

কতদূর তা জানতো বাবুরাম।

কারণ তার পিসী যখনই শ্বশুরবাড়ি থেকে আসতো, বলতো 'বাবাঃ সাত সাত কোশ রাস্তা। সোজা তো নয়, গাড়ির ঝাঁকুনিতে হাড়গোড় ব্যথা হয়ে গেছে।'

তাই বাবুরাম বুকটান করে বললো, 'সাত কোশ!'

'ও বাবা! তাই নাকি? তা এতদূর এলি কি করে?'

'তুই' শুনেই বাবুরামের হঠাৎ রাগ চড়ে গেল। মা বাবা আর বন্ধুরা ছাড়া কক্ষণো কেউ তাকে 'তুই' বলে না। তাই বাবুরাম মুখ লাল করে বললো, 'তুই বলছেন কেন?'

'ও বাবা! তবে কি আপনি বলতে হবে?' তারপর গিজগিজ করে বললো, 'ব্যাটা রাজপুত্তুর টুত্তুর হবে মনে হচ্ছে। চ্যাহারাখানা যা দিব্যি!'

আবার ভয় হলো বাবুরামের, ভারী ভয় হলো।

মনে হলো, না বাবা আর রাগ দেখাবো না। শেষে বুঝে ফেলবে। তাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলো। লোকটা বললো, 'তা না হয় আপনিই বলছি। রাজামশাই, আপনি এত দূরে এলেন কী করে?'

কুমকুম

বাবুরাম বললো, 'খড়ের গাড়ি চড়ে।'

মা মাগো, দেখো তোমার বাবুরামের অধঃপাত! যাকে তুমি জ্ঞান থেকে শিখিয়েছো, মিথ্যে কথা বলতে নেই, সে কেমন মিথ্যে কথার রাজা হয়ে উঠলো তক্ষুণি তক্ষুণি।

বাবুরাম বললো, 'খড়ের গাড়ি চড়ে।'

চাষাদের ছোট ছোট ছেলেগুলোকে খড়ের গাড়ির খড়ের গাদার ওপর চড়ে এ গ্রাম ও গ্রাম করতে দেখেছে বাবুরাম, তাই ফট্ করে বলে দিলো 'খড়ের গাড়ি চড়ে।'

'হুঁ। তা বাবুর ধুতিটি তো দিব্যি ধোপদস্ত। গায়ে আবার শার্ট! আঙুলে আংটি! হুঁ! বাড়িতে আছে কে?'

বাবুরাম বললো, 'কেউ না।'

ভগবান! তবু তুমি ওই হতভাগ্য পাজীটার মাথায় আকাশের বাজ ফেললে না, গলায় সুদর্শন চক্র বসিয়ে দিলে না! তাকে ধরে আছাড় দিলে না! অবিশ্যি, 'কেউ নেই' বলতে গিয়ে বাবুরামের বুকটা কেঁপেছিল, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল, আর চোখটা জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, তবু সার্কাসের দলে ভিড়বার লোভই তাকে এই ভয়ংকর কথা বলিয়েছিল। রাজার মত বাবা, মা দুর্গার মত মা বাবুরামের, অথচ বলে দিল 'কেউ না।'

লোকটা কিন্তু বুঝতে পেরেছিল।

এখন বুঝতে পারি, বুঝতে পেরেছিল বলেই অমন মিটিমিটি হাসছিল। বোধ হয় ভাব ছিল, বাবা, এইটুকু ছেলে কী ধড়িবাজ !···

কিন্তু ও বললো না, 'তুই মিথ্যে কথা বলছিস, বুঝতে পারছি তোর সব আছে।' ও বললো, 'কেউ নেই—আহা ! তা আমার কাছে থাকবি ?'

মুখ্যু 'গাধা বাবুরামটা বললো, 'থাকবো বলেই তো এসেছি। আপনি আমায় এখন তাঁবুর মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিন, তারপর আপনাদের সঙ্গে চলে যাবো।'

লোকটা ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে বললো, 'জলজ্যান্ত একটা মানুষকে লুকিয়ে রাখা অত সোজা নয় হে বাপধন ! পুলিস এসে টেনে বার করবে। তা হলে তোমায় আজই পাচার করতে হবে।'

বাবুরাম ভয় পেলো। বললো, 'কোথায় ?'

'দেখি কোথায় ! তবে আমার দলের সঙ্গে যাওয়া চলবে না, আমার একটা কোনো লোকের সঙ্গে আজই রাত্তিরের গাড়িতে তোকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবো। তারপর আর কে কাকে ধরে ?'

বাবুরাম বললো, 'বাঃ আমি অন্য জায়গায় যাবো কেন ? আমি তো তোমাদের দলে থাকবো ?'

'আরে বাবা, থাকবি থাকবি। পরে হবে সে সব। এখন এখানে তোকে আমার দলে রাখলে তোর চেনা লোকেরা ধরে ফেলবে না ?'

বাবুরাম এ যুক্তি বুঝলো।

বাবুরাম বললো, 'বেশ ! কিন্তু কথা দাও আমায় সব খেলা শেখাবে।'

'ওরে বাবা ! এ যে গাছে না উঠতেই এককাঁদি ! শিখতে পারলেই শিখবি।'

লোকটা সেই 'তুই' করেই কথা বলে চলেছিল, কিন্তু বাবুরাম আর রাগ করতে সাহস করেনি !

তারপর লোকটা হঠাৎ বলে উঠলো, 'তোর শার্টের কলারের ভেতরে ওটা কি রে?'

বাবুরাম অবাক্ হলো, 'কী আবার?'

'এ যে দেখছি পইতে। তার মানে বামুনছানা! সেরেছে! বলি খাস কি?'

'কী আবার খাবো? মানুষে যা খায় তাই খাই।'

'তবু শুনি না! এই তো রাত আসছে, এখানে খেতে হবে তো? খেয়ে দেয়ে রওনা দিবি। বল কী খাস?'

লোকটা যে খাওয়ার ধরন শুনে বুঝতে চায় কী রকম ঘরের ছেলে। সে কথা এখন আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তখন সেই 'বাবুরাম' নামের হাঁদা ছেলেটা বুঝতে পারেনি।

তাই সত্যি কথাটাই বলেছিল, 'রাত্তিরে? রাত্তিরে লুচি আলুভাজা তরকারি ক্ষীর রসগোল্লা।'

'হুঁ বুঝেছি। তা মাছ খাস না?'

'মাছ? বাঃ পইতে হলে বুঝি এক বছর মাছ খেতে আছে?'

'নেই বুঝি? তা বেশ, খাসনে। তবে বাপু ওই লুচি টুচি জুটবে না। ভাত, সেরেফ ভাত আর দুধ খেয়ে গুছিয়ে নাও।'

তারপর একটা গিন্নীমতন মেয়েমানুষ এসে বসলো সেখানে। বললো, 'এসব কি হচ্ছে?'

লোকটা বললো, 'কী আবার?'

'এই যে শুনছি এই ছেলেটাকে নাকি দলে জুতে নিয়ে যাচ্ছো?'

'নিয়ে যাচ্ছি মানে? ও নিজেই এসেছে।'

'জানি। নিজেই আসে বোকা ছেলেমেয়েগুলো। কিন্তু ওর মা-বাপের কথা ভেবে দেখছো?'

'আরে বাবা ওর কেউ কোথাও নেই। খড়ের গাড়ি চেপে অনেক দূর থেকে এসেছে—'

সেই গিন্নীটা বললো, 'তা হলেও বাপু দরকার কি? পুলিসের ফ্যাসাদে পড়ে যাবে, কি হবে—'

'আচ্ছা আচ্ছা তোকে আর অত মাথা ঘামাতে হবে না।' বলে লোকটা চাকরটাকে ডেকে আমাকে তার হাতে সঁপে দিল। বললো, 'এ মাছ-মাংস খাবে না, বুঝলি? বামুনছানা আছে। শুধু দুধ-ভাত খাবে।...আর শোন, একে নিয়ে আজ রাত্তিরেই—' তারপর কী যেন বললো চুপি চুপি।

নিয়ে যাচ্ছি মানে? নিজেই এসেছে। [পৃষ্ঠা—৫০

তারপর চাকরটা শ্রীযুক্ত আমাকে আগে যার নাম ছিল বাবুরাম, আর এখন নাম হয়েছে মধুলাল, তাকে তাঁবুর একটা পাশের দিকের কোণে বসিয়ে রেখে চলে গেল।

সেখান থেকে সার্কাসের বাঘ, সিংহী, বাঁদর আর কুকুরের গর্জনটা খুব ভয়ানক ভাবে শোনা যাচ্ছিল, আর কী রকম যেন বুনো বুনো গন্ধ আসছিল। বুঝলাম এইদিকেই ওদের খাঁচার তাঁবু।

তখন বিকেল পড়ে আসছিল, তাঁবুর মধ্যেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, ধারে কাছে কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মশারা ছেঁকে ধরে ছুবলে খাচ্ছিল, আর খাঁচায় বন্দা জানোয়ারদের গর্জন কানে আসছিল।

হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের মধ্যেটা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে এলো,

কুমকুম

আর সাহস টাহস সব চলে গিয়ে ভয়ানক কান্না পেলো। ডুকরে কেঁদে উঠলাম আমি।

কোথা থেকে যেন চাকরটা চলে এলো, হাতে তার একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। উঁচু করে তুলে ধরে বললো, 'কাঁদছিস কেন রে ছোঁড়া? খবরদার! টুঁ শব্দটি করবি না!'

আরো কান্না পেলো আমার।

কেঁদে উঠে বললাম, 'আমি সার্কাসের দলে থাকতে চাই না, আমায় বাড়ি নিয়ে চল।'

'কী বললি? বাড়ি নিয়ে চল?'

চাকরটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে খেঁকশেয়ালীর মত হাসতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললো, 'একবার বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়লে আর ফিরে যাওয়া যায় না জাদু! যেমন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছো, এখন বোঝো মজা!'

আমি রেগে বললাম, 'জানো আমি জমিদার রাজারাম রায়ের ছেলে। আমাকে আটকে রাখলে তোমাদের শাস্তি হবে।'

ও আরো হাসতে লাগলো, 'জানি চাঁদ জানি। তাই তো আটঘাট বেঁধে কাজ হচ্ছে। এমন চালান করে দেবে, তোমার ওই জমিদার বাবার শক্তিও হবে না তোমায় খুঁজে বার করে।'

আমি উঠে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'আমায় ছেড়ে দাও।'

'হয় না জাদুমণি, হয় না! বলেছি তো একবার বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়লে আর বেরোবার উপায় থাকে না। সার্কাস শেখবার শখ হয়েছে, শেখো! এমন ফুটফুটে ছেলেটিকে পেয়েছে—' পাজীটা কোমরে একটা হাত দিয়ে একপাক নেচে নিয়ে বলে, 'আর কি ছাড়ে? সার্কাস শেখাবে! হাত মুচড়ে, পা মুচড়ে, ঘাড় মুচড়ে, পিঠের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে, কোমরটাকে ধনুকের মতন বেঁকিয়ে সেরেফ ময়দার তাল বানিয়ে ছেড়ে দেবে, বুঝলি? এখন চল দুধ-ভাত খেয়ে রওনা দিবি!'

আমি তখন সব বীরত্ব বিসর্জন দিয়ে ভীষণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলাম,

ভাবলাম নিশ্চয় রাস্তা থেকে কেউ শুনতে পেয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

কিন্তু উদ্ধারকারী কেউই এলো না।

এলো সেই গোঁফওলা কর্তা। ভারিক্কী গলায় বললো, 'এত গোলমাল কিসের রে গণশা?'

বুঝলাম চাকরটার নাম গণেশ।

গণেশ গম্ভীরভাবে বললো, 'মশায় কামড়াচ্ছে, তাই চেঁচাচ্ছে।'

আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'মিথ্যুক! আমি বলছি আমি সার্কাস করতে চাই না, আমি বাড়ি যাবো।'

আমার মার কথা মনে পড়ছিল তখন, বাবার কথা মনে পড়ছিল। আমি হারিয়ে গেলে মার কী অবস্থা হবে তা মনে পড়ছিল। তাই আমি ছটফট করছিলাম।

কিন্তু সেই গোঁফওয়ালার এখন চেহারাই আলাদা। বললো, 'এত চিল্লাচিল্লি ভালো লাগছে না। গণশা, এই বাঘের খাঁচার চাবিটা নে তো, খাঁচার দরজা খুলে ছোঁড়াকে ঢুকিয়ে দিয়ে আয়। ওর ঘরে ফেরার বাসনা মিটে যাক।'

এখন বুঝতে পারি, এটা শেরেফ একটা বাচ্চা ছেলেকে ভয় দেখানো! কিন্তু তখন ওর মুখ দেখে মনে হলো সত্যি। তাই একেবারে চুপ হয়ে গেলাম।

লোকটা তখন বসলো একটা তাকিয়ায়।

একটু সদয় গলায় বললো, 'এই তো বললি কেউ নেই তোর, তবে আবার চেঁচানি কিসের? সার্কাস শিখবি বলেই তো এসেছিস? তোকে সব ভালো ভালো খেলাগুলো শিখিয়ে দেবো। তারের ওপর হাঁটবি, সাইকেল চালাবি, কত সব খেলা, কত তার নাম, সব শেখাবো তোকে।'

আমার মনটা আবার দুলে উঠলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো, আলো-ঝলমল তাঁবু, তার ভেতর সেই সাজসজ্জা, তার রিং, তার, রড, স্টিক। আরো কত কি!

আমি সেখানে কসরত করছি। শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছি, দু হাত ছেড়ে দিয়ে

তারের ওপর হাঁটছি—বন বন করে সাইকেল নিয়ে ঘুরছি, হাততালির ওপর হাততালি, হাঁ হয়ে যাচ্ছে লোকে···মেডেলে বুক ভরে যাচ্ছে আমার।···

সেই হাততালির শব্দের চিন্তায় মায়ের কান্নার শব্দটা যেন ঝাপসা হয়ে গেল, সেই আলোর ছায়ায় রাজারাম রায়ের মস্ত গেট দেওয়া প্রকাণ্ড বাড়িটা ঢেকে গেল।

আমার কান্না থামলো।

লোকটা আরো অনেক ভালো ভালো কথা বলে তারপর বলে গেল, 'কিন্তু বাপধন, যদি ট্যাঁ-ফোঁ করেছো তো, ওই বাঘের খাঁচার মধ্যে, সেটি মনে রেখো। ভালোয় ভালোয় তোমায় এখন পাচার করতে পারলে হয়।'

গণেশ আমায় একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললো, 'শুনলি তো সব? এখন চল ভালোয় ভালোয় খেয়ে নিয়ে—'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'খাবো না।'

'খাবি না?'

'না।'

'তা খেতে আজ পারবি না। বেশ তবে চল উপোস করেই চল। কিন্তু কর্তা যদি জিগ্যেস করে, খবরদার বলবি না—খাইনি। বুঝতে পারছিস? বলবি—খেয়েছি। পেট ভরে খেয়েছি। নইলে—বুঝতে পারছিস? তোর কপালে চাবুক, আমার কপালে চাবুক।'

'ইশ তোমায় চাবুক। তুমি তো ওর নিজের লোক?'

গণেশ সেই রকম খেঁকি মত হেসে হেসে বলে, 'নিজের লোকদেরই ও বেশী চাবুক মারে। চাবুক মেরে মেরেই নিজের লোক করে নেয়। বুঝবি—সবই বুঝবি। এসেছিস যখন, এখানেই মাটি নিবি। তবে যদি ওই কর্তার মতো হতে পারিস, তা হলে—রাজত্ব আর রাজকন্যে!' বলে মিটিমিটি হেসে গণেশ আবার আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়।

তখন আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ওদের খাঁচার জন্তুগুলো দেখি। কিন্তু গণেশকে

বলতে সাহস হলো না। কে জানে গণেশের হাতে বাঘের খাঁচার চাবি আছে কিনা।

খানিক পরে চারিদিক্ যখন অন্ধকার হয়ে গেছে, গণেশ আমায় সার্কাসের দলের একটা ঢলঢলে পোশাক পরিয়ে স্টেশনের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা গরুর গাড়িতে তুলে দিয়ে চড়ে বসলো। গাড়ি চলতে লাগলো ক্যাঁচ-কোঁচ করে।

এক সময় বললাম, 'এই, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

গণেশ গম্ভীরভাবে বললো, 'যমের বাড়ি।'

আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'তুমি এরকম কথা বললে আমি চেঁচাবো।'

গণেশ বললো, 'চেঁচিয়ে দেখ না জাদু! সঙ্গে চেঁচানির ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি।'

হয়তো কিছুই নিয়ে যাচ্ছে না তবু বললে।

আমি আবার বললাম, 'আমরা তো রেলগাড়ি করেই যেতে পারতাম।'

ও বললো, 'তা পারতাম। তারপর সেখান থেকে জেলখানায়? তোর জমিদার বাবা কি এতক্ষণ ইস্টিশান তল্লাশ করতে বাকী রেখেছে?"

বাবার নামে আমার আবার চোখে জল এলো।

মনে মনে ঠিক করলাম, গণশা ঘুমিয়ে পড়লে গরুর গাড়ির থেকে নেমে পালাবো। তারপর সেই গরুর গাড়ির ক্যাঁচ-কোঁচ শুনতে শুনতে নিজেই যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে।

কে জানে কখন সেই বর্ধমান জেলার 'খণ্ডঘোষ' গ্রামটার সীমানা পেরিয়ে কোথায় চলে গেলাম।

... ...

কিন্তু এসব কথা এখন এই এতদিন পরে আমি লিখছি কেন? লিখছি এই জন্যে যখন আবার সেই গ্রামে ফিরে যাবো, তখন মাকে বাবাকে দেখাবো। বলবো—মাগো, তোমার অধম সন্তানটাকে ক্ষমা কর মা, সেই মুখ্যুটা না বুঝেই তোমায় এত কষ্ট দিয়েছিল। তা শাস্তি সে নিজেও কম পায়নি।

এই আমার জীবন-বৃত্তান্ত সব লিখে লিখে জমা করবো বলে আমি খাতার

কাগজ কিনেছি। কালি-কলম যোগাড় করেছি। আর কত কষ্ট করেই না একটা দ্বিতীয় ভাগ যোগাড় করেছি, পাছে বানান ভুল হয়ে যায়।

মা মোটেই ওই বানান ভুলটা দেখতে পারেন না। সেই দ্বিতীয় ভাগ যোগাড় করাই তো একটা গল্প।···মা, ইচ্ছে করে আমার প্রতিদিনের সব কথা লিখে লিখে তোমার জন্যে জমা করি, কিন্তু এত লেখা লিখবার বিদ্যে কি আছে? বাংলাদেশ ছাড়া হয়েই তো কেটে গেল কতদিন, মনে হচ্ছে, বাংলা অক্ষরও বুঝি ভুলে যাবো। তাই রোজ লিখি, যখন একটু সময় পাই।"

(৬)

"কিন্তু পর পর সব কথা কি লিখতে পারবো আমি? লিখতে বসে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। খেই হারিয়ে যাচ্ছে। আগের কথাটা পরে এসে যাচ্ছে, পরের দিকের কথাটা আগে। আমি তাই নির্বুদ্ধির ঢেঁকি সেই ছোট ছেলেটাকে যেন দূর থেকে দেখি। কত বড় ছেলেটা গণেশের পাল্লায় পড়েছিল। কত বড় ছেলেটা সে পাল্লা থেকে পালিয়েছিল। নদীতে নাইতে গিয়ে কুমিরের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল যে ছেলেটা, সেই বা কত বড়টি ছিল। আরও কত!

ওই ছেলেটা যেন আমার সামনে ঘুরছে ফিরছে। মার খাচ্ছে, লুকিয়ে কাঁদছে, নতুন দেশে গিয়ে পড়ে নতুন দৃশ্য দেখে গলে গিয়ে হাঁ করে তাকাচ্ছে, রেল লাইন ধরে ছুটতে ছুটতে তাদের সেই বর্ধমান জেলার গ্রামে ফিরে যাওয়া যায় কিনা দেখতে দল থেকে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে ছুটতে ছুটতে বেদম কাহিল হয়ে, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আবার জ্ঞান হয়ে দেখছে দলের লোকেরা তাকে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে আসছে। ছবির পর ছবি। ছবিগুলো যেন ছুটোছুটি করছে, তবু চেষ্টা করছি পর পর গুছিয়ে লিখতে।

সেদিন—সেই প্রথম দিন—

ঘুম ভেঙে দেখলাম সেই গরুর গাড়িটার গরুগুলো খুলে নিয়ে মাঠে ছেড়ে দেওয়া

কুমকুম

হয়েছে আর গাড়িটা যেন মুখ হেঁট করে পড়ে রয়েছে। তোড়জোড় চলছে খাওয়া দাওয়ার। একটা গাছতলায় ইঁট পেতে উনুন বানিয়ে তাতে কাঠ জ্বেলে মাটির হাঁড়ি বসানো হয়েছে। লোক দুটো, হয়তো গরুর গাড়ির গাড়োয়ানই হবে, চাল টাল ধুচ্ছে না কি করছে।

আমি সেই মাথা হেঁট করে পড়ে থাকা গাড়িটার মধ্যেই ঘুমোচ্ছিলাম, ঘুম ভাঙতে প্রথমটা যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। এ কীরে বাবা! আমি কোথায়? আমাদের সেই রঙিন দেওয়ালওয়ালা ঘরটা কই? আমার চারিধারে মশারির দেওয়াল কই? আমাদের সেই মার্বেল পাথরের মেজের পুব জানলা দিয়ে এসে পড়া সকালের রোদ্দুরটা কই? আমার গায়ে এ কিসের পোশাক? চড়া রোদ্দুরে ভরা মাঠে এই কিম্ভূতকিমাকার পোশাকটা পরে আমি একখানা ভাঙা গরুর গাড়িতে পড়ে আছি, এর মানে কি?

আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

না আমাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে তেপান্তরের মাঠে আছড়ে ফেলে দিয়ে গেছে?

ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে গেল। ভূতই বটে। আমার দুর্মতির ভূত। সে আমার ঘাড়ে ধরে এইখানে এনে ফেলেছে। ওই দুটো লোকের মধ্যে একটাকে এখন চিনতে পারছি, ও সেই গণেশ, সার্কাসের কর্তার চাকর। ওই পাজীটাই তো আমাকে কাল যা-তা বলছিল।

উঠে পড়ে গাড়িটা থেকে নামতে চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম, প্রথম নম্বরই হেরে গেলাম। বাঁশের খোঁচায় পা-টা ছড়ে গেল। 'উঃ' করে উঠলাম আমি।

ওই 'উঃ'টা শুনে গণেশ আমার দিকে সরে এলো, হ্যা হ্যা করে বলে উঠলো, 'এই যে নবাবের জামাইয়ের ঘুম ভাঙলো! ওরে বাপস কী ঘুমের বহর! আমি তো ভাবলাম মরেই গেছে বুঝি। হুঁ বাবা দাওয়াইটি কেমন দিয়েছিলাম। পাছে রাতে পালাস ভেবে দিলাম খাবার জলে ঘুমের ওষুধ গুলে।'

ওর ওই দাঁত বার করা মুখ দেখে ইচ্ছে হলো মাঠ থেকে ঢিল কুড়িয়ে ছুড়ে

মারি। তবু আমি নিজেকে সামলে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম। গণেশ আরো ছ্যাবলা হাসি হেসে বললো, 'তা নবাব সাহেব উঠুন! অঙ্গ তুলুন। প্রাতঃকেত্য সেরে নিয়ে খেয়ে টেয়ে নিতে হবে তো? আবার তো এই গরুর গাড়ি!'

যদিও আমার চোখ ফেটে জল আসছিল, তবু জোর গলায় বললাম, 'বয়ে গেছে আমার তোর সঙ্গে আবার গরুর গাড়ি চড়তে। বয়ে গেছে তোর ওই পচা রান্না খেতে। আমি যেখানে ইচ্ছে চলে যাবো।'

গণেশ হা হা করে হেসে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে হাসলো। তারপর বলে উঠলো, 'ওরে নেতাই, শোন শোন—রাজপুত্তুরের কথা শোন। পচা রান্না খাবে না, আর আমাদের সঙ্গে যাবে না। ব্যাটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি, ব্যাং দেখেছে সাপ দেখেনি।' বলে লহরে লহরে হাসতে লাগলো।

তারপর হঠাৎ আমার আরো কাছে সরে এসে জিভে একটা চুক-চুক শব্দ করে সে বললো, 'আহারে যশোদার গোপাল, কেন তোর এই মতিচ্ছন্ন হলো বল দেখি? কে তোকে এ কুপরামর্শ দিল? তোকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

ওর ওই পাজীর মত কথা শুনে আমার আরো রাগ চড়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'আমাকে দেখে আর দুঃখু করতে হবে না তোমায়। আমি আজই চলে যাবো।'

'যাবি বুঝি? কোথায় যাবি?'

আমি চেষ্টা করে গরুর গাড়ির সেই খোঁচাটা বাঁচিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে বললাম, 'আমি কোথায় যাবো, তা তোকে বলতে যাবো কেন? যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাবো।' বলেই হঠাৎ জোরে ছুট মারলাম।

ছুট দিয়ে যদি চলে যেতে পারতাম। যদি কোন ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছে গিয়ে আমার গ্রামের হদিস পেয়ে যেতে পারতাম, তা হলে হয়তো—কিন্তু চলে যাওয়া হলো না।

আমি ছুট মারতেই গণেশ হইহই করে উঠলো। আর সে নেতাই নামের

লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ব্যস হয়ে গেল আমার পালানো। আমাকে এরা দুজনে মিলে জাপটে ধরে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে বললো, 'ও চেষ্টা করিসনে বাপু, নিজেও মরবি, আমাদেরও মারবি। তার চেয়ে বাবা যা মনস্থ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস তাই কর। ক'দিন পরেই রামচন্দ্রপুরে আমাদের তাঁবু পড়বে, সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি তোকে। ক'টা দিন গোকুলে বাড়বি চল, তারপর পার্টি এসে যাবে, অধিকারী তোর ভার নেবে। ...দাঁতে দাঁত দিয়ে সয়ে থাকবি কিছুকাল, খেলাগুলো সব শিখে নিবি—তারপর বুঝলি কিনা—।'

'ও চেষ্টা করিসনে বাপু, নিজেও মরবি, আমাদেরও মারবি।'

গণেশ আমার আরো কাছে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, 'তারপর ওই অধিকারীটাকে কলা দেখিয়ে লম্বা দিবি, বুঝলি? পালাবি—সেরেফ দল ছেড়ে পালাবি। একদিন ইচ্ছে করে অধিকারীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবি, খুব চোটপাট শুনিয়ে দিবি তারপর বলবি রইল তোমার চাকরি, আরো অন্য সার্কাস পার্টি আমার পায়ে ধরে সাধছে।—বলে সাহেবের নাকের সামনে দিয়ে গটগট করে চলে যাবি।'

আমি ওর একটানা কথা শুনে অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলাম। থামলে বললাম—'কেন? অত ঝগড়া করবার আমার দরকার? চলে যাবো তো চলেই যাবো।'

কুমকুম

গণেশ একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন হেসে বলেছিল, 'বড্ড বাচ্চা তুই, তোকে আর কী জ্ঞান দেবো? তবে শোন—সবাই তাই যায়, বুঝলি? একে একে দেখলাম তো ক'টাকে। খেলা শেখে, সাহেবের সুয়ো হয়ে অন্য সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। সাহেব তাকেই তোয়াজ করে করে বেড়ায়, তার জন্যে ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। তারপর সে একদিন ঝগড়া করে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে চলে যায়।'

অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম ওর কথা শুনে। হ্যাঁ তখন তো পৃথিবীর কিছুই জানতাম না। তাই অবাক্ হতাম। এখন আর বেশী কিছুতে অবাক্ হই না। কিন্তু তখন হতাম, তাই বলেছিলাম, 'কেন? সাহেব যদি ভালোবাসে তা হলে যায় কেন?'

গণেশ আবার ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হেসে উঠলো! ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে উঠলো, 'বুঝবি, কেন যায় বুঝবি।' আবার হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলে, 'ওই ভালোবাসাটা যে কত মিথ্যে তা বুঝতে পারে বলেই চলে যায়, জানিস? ও হচ্ছে শুধু স্বার্থের ভালোবাসা। সেইটা বুঝতে পারে আর এতকালের অত্যাচার অবিচারটা মনে পড়ে, তখনই খেপে যায়, বুঝলি? যাবে না খেপে?' গণেশের মুখটা হঠাৎ যেন আগুনের মতন হয়ে ওঠে। বলে ওঠে, 'মানুষ তো তারা? জন্তুজানোয়ারের মতন ব্যাভার পেয়ে পেয়ে আক্রোশ জমে না? এই তোরও জমবে। পালাতে দেবে না, কুকুর-শেয়ালের মতন ব্যাভার করবে। আর বাঘ-সিংহী পোষ মানানোর কায়দায় আফিং খাইয়ে খাইয়ে আর চাবুক মেরে মেরে শায়েস্তা রেখে খেলা শেখাবে। হবে না আক্রোশ? দলের কাউর যদি এতটুকু মায়া-মমতা পড়ে তোর ওপর, ওই মনিবের ভয়ে সেটা প্রকাশ করতে পারবে না।'

গণেশ আবার কেমন উদাস হয়ে যায়, উদাস-উদাস গলায় বলে, 'না, প্রকাশ করতে পারবে না। প্রকাশ করতে গেলেই চাবুক। বুঝলি? এই সার্কাসের খেলায় জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার করতে করতে লোকটা নিজেও জানোয়ার বনে গেছে, অন্যকেও জানোয়ার বানিয়ে রেখেছে।...যে একেবারে বলতে পারে না, সে পালায়। আর নচেৎ এই গণেশ বাহাদুর!'

কুমকুম

নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে আবার হা-হা করে হেসে ওঠে গণেশ, 'এই গণেশ বাহাদুরটি হচ্ছে আদি অন্তকালের! সে ওই মনিবকে কবরে দিয়ে, তবে নিজে ভিতরে যাবে। তাই জানোয়ার বনে বসে আছে।'

আমি ওর মুখে খুব একটা দুঃখের ছায়া দেখেছিলাম। সেই অতটুকু বেলাতেও সেটা আমার চোখে পড়েছিল। তাই আমি বলে ফেলেছিলাম, 'তা তুমিই বা একদিন ঝগড়া করে চলে যাও না কেন?'

'চলে যাই না কেন?' গণেশ খামোকা রেগে উঠলো। বললো, 'এটা তো আচ্ছা ডেঁপো ছেলে দেখছি। বলি চলে যাবো কোন্ মুখে রে? জানোয়ার বনে গেছি বলে কি সত্যি জানোয়ার? মানুষের ঘরে জন্মাইনি? মানুষ মার দুধ খাইনি? তা হলে? এত বড় নেমকহারাম হবো? ও আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে বাঁচায় নি? বানের জলে মা-বাপ ভেসে গেল। ঘর-বাড়ি ভেসে গেল, রইলাম একা এই হতভাগা আমি। রাস্তায় পড়ে মরছিলাম—'

আমি কাতর হয়ে বলি 'ইস! কোন্ দেশে ছিলে তুমি? কোন্ নদীর বানে—'

ওমা কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ যেন মারমুখী হয়ে উঠলো। কড়া গলায় বললো, 'বলি সকালবেলা বসে বসে আড্ডা দিলেই চলবে? গিলতে হবে না? খেতে হবে না? কাল থেকে তো পেটে অন্নদানা দিসনি। যা ওই পুকুরে মুখ ধুয়ে আয়। ও না থাক, রাজপুত্তুর আবার গড়িয়ে পড়ে ডুবে মরবেন। নেতাই, তোর ওই বালতিটা করে এক বালতি জল এনে দে দিকি। ছোঁড়া মুখ-হাত ধুক। বাঁচিয়ে বর্তিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো—তুই হারামজাদা পাজী! বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আমার মাথা কিনেছেন!'

এই হচ্ছে গণেশের প্রকৃতি।

কখনো মনে হয় বুঝি ভালো লোক, কখনো মনে হয় সেরেফ শয়তান।

তবু ক্রমশঃ ওর কাছাকাছি থাকতে থাকতে মনে হতো, হয়তো শয়তান নয়, ভালোই। শুধু 'ভালোত্ব'টা প্রকাশ করবার উপায় নেই বলেই শয়তান সেজে থাকে।

উপায় কেন নেই?

কুমকুম

পালিয়ে কেন যায় না ?

সে কথা তো বলেইছে সে। আরো অন্য সময় বলেছে, 'নেমকহারামি করতে পারবো না।' বলেছে 'এখন আমি যদি চলে যাই লোকটাকে মরণকালে দেখবে কে ? তিন কুলে কেউ আছে ওর ? আর দলের লোকের সঙ্গে যা ব্যাভার করে, তাতে তো ও যেই মরবে, সবাই ওর টাকাকড়ি নিয়েটিয়ে মড়া ফেলে চম্পট দেবে ; মড়াটার সৎকারও করবে না।'

আমি বলতাম, 'ও আবার মরবে ? ও তো একটা আস্ত শয়তান। শয়তানরা কি মরে ? ভগবানের মতন শয়তানও তো অমর।'

গণেশ সন্দেহের গলায় বলতো, 'এ কথা তোকে কে বলেছে ?'

কে বলেছে বলতে গেলেই তো আমার চোখে জল এসে যেতো। মা, তোমাদের মনে পড়ে গিয়ে বুকটা ফেটে যেতো। দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করতো, নিজের হাতপাগুলো নিজে চিবোতে বাসনা জাগতো। মনে পড়ে যেতো সেই আমার পড়বার ঘরটার চেহারা ; আর সেই মাস্টারমশাইদের মুখ। তখন যে মুখ দেখলে ভয় করতো, রাগ ধরতো, সেই মুখই দেবতার মুখের মতন মনে হতো। গণেশ আমার মুখে মাস্টারের কথা শুনে প্রশ্ন করেছিল, 'কোন্ মাস্টারমশাই ?' কষ্টে ওর প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম, 'যে মাস্টারমশাই পড়াতেন !'

গণেশ ওর অভ্যেস মতন হঠাৎ রেগে উঠে বলতো, 'এই—এই জন্যেই তোকে আমার জ্যান্ত পুঁততে ইচ্ছে করে পাজী ! কুকুর দিয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। মা ছিল, বাপ ছিল, মাস্টার ছিল, ঘরে ভাত-কাপড় ছিল, আর তুই কিনা চলে এলি এই সলোমান সাহেবের সার্কাস পার্টিতে ! ছি ছি ! ইচ্ছে হয় মুঠো মুঠো ধুলো তুলে তোর গায়ে দিই।'

আবার হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলতো, 'তোর মাস্টার ভুল বলেছে। শয়তানও মরে। ওই শয়তানটার মরণ রোগ ধরেছে। দেখিস না চেঁচাতে চেঁচাতে হঠাৎ কুঁকড়ে কুঁকড়ে পেট চেপে ধরে।···ওইটিই রোগ। ডাক্তার দেখায় না ; বলে, 'ডাক্তার এসে রুগী বানিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবে। তার থেকে যতদিন বাঁচি লীলা-খেলাটা

করে যাই।' তাই করছে লীলা-খেলা। এই দুনিয়াটা বড় মজার জায়গা, বুঝলিরে ছোঁড়া। যত দেখবি, টের পাবি। আর এই মানুষগুলো? আজব জীব। দুনিয়ায় যত জীব জন্তু পাখি গড়েছে ভগবান্, সবাইয়ের 'নির্যেস' দিয়ে গড়েছে এই মানুষ জাতটাকে। তাই এই মানুষের মধ্যে সাপ আছে, ব্যাঙ আছে, বাঘ আছে, সিংহী আছে, হাতি, মোষ, বুনো শুয়োর, হরিণ, ভেড়া, গণ্ডার, ভালুক, কুকুর, বেড়াল, ধেড়ে ইঁদুর, ছুঁচো, ঈগল মায় কুমির, হাঙর পর্যন্ত, কত নাম আর করবো—সব সব, সবাইয়ের প্রকৃতি গোঁজা আছে। এক এক মানুষের মধ্যে এক একজনের গুণ। আর ওই সলোমন সাহেবের মতন শয়তানদের মধ্যে অনেকের গুণ।'

আমি বললাম, 'তবুও তো ওকে ভালোবাসতে ছাড়ো না।'

'ভালোবাসা?' গণেশ বলতো, 'থু থু! ভালোবাসার লোক পেলাম না আমি? ওই তো বললাম, ওকে কবরে না দিয়ে নড়বার উপায় নেই আমার, তাই পড়ে আছি।'

বলতো, তবু ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি বুঝতে পারতাম ভালোবাসে। অদ্ভুত এক রকমের ভালোবাসে। খাঁচায় পোরা বন্য জন্তুগুলো যেমন এক রকম ভালোবাসে তাদের 'মাস্টার'কে। সেই ভালোবাসার বশেই আটকে পড়ে আছে গণেশ সলোমন সাহেবকে কবরে দেওয়া পর্যন্ত।

* * * *

কিন্তু শেষ রক্ষে কি করতে পেরেছিল গণেশ? পারেনি। সলোমন সাহেব পেট চেপে ধরে ধরেও অনেকদিন বেঁচে থেকেছে। ও থাকতে থাকতেই গণেশ ওকে ছেড়ে চলে গেল।

আমি তখন পুরো দমে খেলা শিখেছি।

অথবা আমাকে শেখানো হচ্ছে চাবকে চাবকে।

ওঃ কী অকথ্য সেই যন্ত্রণা মা! যত দেহের ওপর পীড়ন, তত মনের ওপর। দেহে তো—চাবুক মেরেছে, লোহা পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে, হাতপা ঠিকমত মোচড় খাওয়াবার জন্যে দড়ি দিয়ে উলটোদিকে মুচড়ে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রেখেছে। আরো কত কীই করেছে মা গো, সে আর বেশী বলতে চাই না। তুমি

যখন পড়বে তখন শিউরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে হয়তো। শুনেছি জেলখানার আসামীদের নাকি অনেক ভীষণ ভয়ংকর যন্ত্রণা দেয়। সে কি এর থেকেও বেশী? কে জানে!

তা ছাড়া মনের ওপর যে কষ্ট!

ওঃ সে কী লাঞ্ছনা—কী অপমান! একদিকে আমি নিজের মুখ্যুমীর জন্যে অনুতাপে জ্বলছি, অন্যদিকে ভয়ংকর ভয়ংকর গালাগাল, কিল গাঁট্টা লাথি! মা মাগো, তোমাদের মনে যে কষ্ট দিয়ে চলে এসেছি, তার চতুর্গুণ নিজেও পেয়েছি।

যাক এসব কথা আর বেশী লিখতে চাই না। তবু মনের পাপ খুলে লিখি মা। রোজ রাত্তিরে—হ্যাঁ তোমার বাবুরামের অধঃপতন দেখে শিউরে উঠবে তুমি—রোজ রাত্তিরে আমি শোবার সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম ঃ যেন সকালবেলা উঠে দেখি—পেটের ব্যথা বেড়ে গিয়ে সলোমনটা মরে গেছে।

কিন্তু আমি থাকতে আর সে প্রার্থনা পূর্ণ হলো না আমার। নিত্যি নতুন জায়গায় তাঁবু গেড়ে গেড়ে খেলা দেখিয়ে বেড়াতেই লাগলো সাহেব।

আর গণেশও বিচিত্র ব্যাভার করে করে আমাকে কখনো শান্ত করে রাখতো, কখনো খেপিয়ে তুলতো। ক্রমশঃই বুঝতাম কেন ও অমন করে। পাছে আমার ওপর মায়া পড়ে যায়, পাছে আমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে তাই অমন করে মায়া-মমতার ঘরটাকে জোরে জোরে দরজা বন্ধ করে রাখতো। ছেড়ে দিলেই তো সলোমনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। সেইটি পারবে না গণেশ। অথচ আমার ওপর মায়া পড়ে যাচ্ছে।

তাই একটু একটু ভালো ব্যাভার করে ফেলেই নিজেকে সামলে নিতো, খিঁচিয়ে উঠে বলতো, 'বসে বসে গালগল্প করতে হবে তোর সঙ্গে? উল্লুক কাঁহাকা! বেরো আমার সামনে থেকে দুচক্ষের বালাই।'

আর সলোমন সাহেব ধারে কাছে থাকলে তো কথাই নেই, গালাগালের ছড়া বইয়ে দিতো একেবারে। 'পাজী গাধা উল্লুক বদমাশ, বুনো শুয়োর, খ্যাঁকশেয়ালী' কিছু বলতে বাকা রাখতো না। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতো, 'শক্ত রুটি খেতে

এখন আমার ফেরার রাস্তাটা চিনিয়ে দাও, যেমন খাটিয়ায় শুয়েছিলাম শুয়ে পড়িগে।'

[পৃঃ ৮৯

পারবেন না, পচা মাছ খেতে পারবেন না, চাকরের কাজ করতে পারবেন না, ভারী আমার নবাব এসেছেন। এতই যদি বাবুয়ানা তো এলি কেন জমিদার বাপের বাড়ি ছেড়ে? বদমাশ!'

বুঝতাম এসব সলোমন সাহেবের মন রাখতে বলছে। সাহেব তা হলে নিশ্চিন্তি থাকবে, জানবে গণেশ আমায় দু চক্ষে দেখতে পারে না। ওর চালাকি সফল হতো।

সলোমন তাই শুনে শুনে নেকড়ের মতন দাঁত বার করে হাসতো, আর বলতো, 'তা দিস গণেশ, হারামজাদাকে একটু দুধ-ঘি মাছ-মাংস দিস। চ্যাহারাটা বহুৎ বড়িয়া আছে, 'তাওত' করলে ব্যাটা সত্যিই রাজপুত্তুরের মতন দেখতে হয়ে উঠবে।'

গণেশ মুখ বাঁকিয়ে বলতো, 'দায় পড়েছে আমার ওই বিচ্ছুটাকে যত্ন করতে। জানেন না তো সাহেব, ছোঁড়া কত বড় বিচ্ছু। উঠতে বসতে চাবুকের ওপর আছে তাই—'

বলতো, আবার খাবার সময় গরম দুধের গেলাস এনে সামনে বসিয়ে দিতো, মাছ-মাংস নিজে এনে পাতে ঢেলে দিতো, আর কেমন চাতুরী করে সলোমন সাহেবের 'স্পেশাল খানা' থেকে লুচি বাগিয়ে এনে আমায় ধরে দিতো।

মা গো ঘেন্নায় তোমার নাক কুঁচকে যাচ্ছে বোধ হয়? ভাবছো কত নোংরা জিনিসই খেয়েছে বাবুরাম, কত ময়লা লোকের ছোঁওয়া। অথচ বাবুরামের পইতে হয়েছিল! বিশুদ্ধ কলসীর জল খেতো!

কি করবো! সবই নিয়তি!

আছি যখন ওদের মধ্যে, খেতে তো হবেই। তবে ওই সব আদর দেখাতে এলেই প্রথমটা রেগে জ্বলে যেতাম। বলতাম, 'নিয়ে যা আর আদর দেখাতে হবে না। চাই না আমি ওসব খেতে। দয়া দেখাচ্ছে।'

তখন গণেশ কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো চোখে তাকাতো। আর বলতো, 'এত তোর বুদ্ধি, আর এটুকু বুঝিস না কেন রে? দয়া আমি তোকে দেখাচ্ছি না, নিজেকেই দেখাচ্ছি। তুই একটু ভাল খেলে টেলে তবু আমি—। দেখ তো কী জীবন আমার।'

অগত্যাই খেতে হতো। ওর ওপর মায়া হতো।

আর ক্রমশঃ ওকেই একমাত্র আপনার লোক মনে হতো।

ওকে আমি 'গণেশদা'-ও বলতে শুরু করেছিলাম। ওর পায়ে পায়ে ঘুরতাম আর বলতাম, 'কবে আমায় বাঘের খেলা শেখাবে তোমরা গণেশদা?'

বাঘের খেলার ওপরই আমার আসল ঝোঁক। ঠিক করে রেখেছিলাম ওটা শিখে ফেলেই পালাবো। নির্ঘাত পালাবো। ঝগড়া করে নয়, এমনিই। পালিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে সব বলে টলে তারপর বলতাম মনের কথা। বলতাম 'মা, আমার বড় ইচ্ছে নিজেই একটা সার্কাস খুলবো আমি। তুমি আমার সহায় হও।'

ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিলাম, নিজের ওপর বিশ্বাস আসছিল, খুব তাড়াতাড়ি খেলা শিখে নিতে পারি বলে বাহবা পাচ্ছিলাম, সেই সময় ঘটলো সেই ঘটনাটা। সেই গণেশের ঘটনা।

আমি তখন ট্রাপিজের খেলা শিখি। সেদিন অনেকক্ষণ খেলা প্র্যাকটিস করে এসে দেখি গণেশ বসে আছে চুপচাপ। যেন মনে ওর কোনো সুখ নেই।

দেখে মন কেমন করে উঠলো।

হঠাৎ ওর কাছে মনের কথা খুলে বলতে ইচ্ছে হলো। বললাম খুলে। সার্কাস খোলার ইচ্ছের কথা। বললাম, 'তোমাকে আর ওই সলোমন সাহেবের মরণকাল পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকতে হবে না গণেশদা, তুমি আমার দলে চলে আসবে। তোমাতে আমাতে দু জনে—'

গণেশ মনমরা মত হেসে বললো, 'অনেক টাকা জমেছে তোর, তাই না? কত জমেছে? পাঁচ সিকে?'

আমি জোরের সঙ্গে বললাম—'আহা তাই বুঝি? খেলাটা শেখা হলেই তো আমি চলে গিয়ে বাবা-মার কাছ থেকে টাকা নেবো। এখনো তোমাদের শাসনে পড়ে আছি, তাই যেতে পারছি না। তখন তো বড় হবো। তা ছাড়া—খেলাটাও সব শিখে নিতে চাই। তারপর আর কি?'

গণেশ তেমনি ভাবে হেসে বললো, 'তার মানে তখন আমি তোর চাকর?'

আমি বললাম, 'ধ্যেৎ চাকর কি? তুমিই তো দলের কর্তা হবে।'

ও নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যাঁ এখন তাই বলছিস। তখন—যখন লায়েক হবি—তখন জুতোর ঠোক্কর মারবি। ছেড়ে দে কথা। দেখলাম দুনিয়ার সব ব্যাটাকে। আর মনে ভাবছিস তোর বাবা আহ্লাদ করে তোকে সার্কাস পার্টি গড়তে টাকা দেবে? সে আশা কোরোনি জাদুমণি! দুনিয়াটা পরীর রাজ্য নয়।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'আমার মা-বাবাকে তো দেখোনি তুমি। আমাকে হারিয়ে ফেলে তাঁদের কী অবস্থা তাও জানো না। আমাকে আবার পেলে যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে পারবেন।'

গণেশ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'তা হবে। মা-বাপ যে কেমন বস্তু, ভুলেই গেছি।'

আমি সেদিন খেলায় খুব বাহবা পেয়েছি, মনটা ভাল আছে। হেসে বললাম, 'তোর আজ কি হলো বল তো গণেশদা? কেবল কেবল নিঃশ্বাস ফেলছিস।'

গণেশ বললো, 'নাঃ, হবে আবার কি? বসে বসে হিসেব করছিলাম জীবনের মানেটা কি। তা হিসেবটা মেলাতে পারছি না বলেই—'

আমি আস্তে ওর একটা হাত ধরলাম।

বললাম, 'ওসব চিন্তা রাখ গণেশদা, আয় দশ-পঁচিশ খেলি।'

খেলাটা আমায় গণেশই শিখিয়েছিল। এটা তার খুব প্রিয় খেলা। কিন্তু সেদিন গণেশদা আমার প্রস্তাবে হঠাৎ যেন ছিটকে উঠলো। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে খিঁচিয়ে বলে উঠলো, 'যা যা আর মায়া দেখাতে হবে না। যত সব শয়তান! যা ওই সলোমন শয়তানটার পুষ্যিপুত্তুর হয়ে, ওর মেয়েকে বিয়ে করে সুখে রাজ্যি-পাট করগে যা। আলাদা সার্কাস খুলবি কেন, সাহেব তো তোকেই জামাই করে সববস্ব দিয়ে যাবে।'

সলোমনের মেয়ে বউ কোথাও কিছু ছিল না। থাকার মধ্যে সার্কাস পার্টির মেয়ের দল। তাই আমি হেসে ফেলে বললাম, 'ওর জামাই হবার জন্যে আমি আহ্লাদে হাত তুলে বসে আছি। আর মেয়ে কোথায় সাহেবের?'

'নেই, পুষ্যি নেবে। পুষ্যি মেয়ে, পুষ্যি জামাই নিয়ে আহ্লাদে ভাসবে। আর যারা ওর জন্য জীবন দিচ্ছে তাদের জুতোর ঠোক্কর মারবে।'

কুমকুম

বুঝলাম আজ সলোমন ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। তাই বললাম, 'রাত হয়েছে, খাওয়া দাওয়া হোক গণেশদা।'

গণেশ বললো, 'নাঃ এখন না। আগে 'শেরশাকে' খাওয়াই।'

শেরশা হচ্ছে সার্কাসের বাঘের নাম।

এখন ওই একটাই বাঘ আছে। আগে নাকি দুটো ছিল, দেখিনি আমি। তা শেরশাকে খেতে দেবার ভারটি ছিল গণেশের উপর। কেমন তরতর করে তার খাঁচার ওপর উঠে যেতো, ওপর থেকে একটা ঢাকনি তুলতো, আর সেই গর্ত দিয়ে মাংসের পুঁটলি ছুড়ে দিতো।

বাঘের ঘর পরিষ্কারও করতো গণেশ। সেও—কেমন কৌশলে বাঘটাকে দরজা নামিয়ে খাঁচার একদিকে ঠেলে দিতো, আর অপর দিক্‌টা পরিষ্কার করে ফেলতো।

শেরশা সে সময় ভীষণ গর্জন করতো, খাঁচার দরজায় এসে নাকের ধাক্কা দিতো, আর মনে হতো এক্ষুণি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে গণেশের ওপর। কিন্তু কিছুই হতো না। গণেশ দিব্যি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতো।

আসলে কিন্তু বাঘের জন্যে আলাদা লোক ছিল—যার নাম গুংটু। কালো বেঁটে কাফ্রীর মত দেখতে, কি জানি কি জাত। তারই বাঘের কাজ করার কথা। কিন্তু গণেশ স্বেচ্ছায় কাজটা শিখে ফেলে স্বেচ্ছায় ওই ভারটা নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল। সলোমন সাহেব দেখতে পেলেই গুংটুকে গালাগাল করতো। গণেশ হেসে হেসে বলতো, 'ওর কোনো দোষ নেই সাহেব। আমারই বাঘের মুখে খাবার ধরে দিতে, বাঘের খাঁচায় ঢুকতে ভাল লাগে।'

তা ভাল লাগলেও নিজে খাওয়া দাওয়ার আগে বাঘকে খাওয়াতে যেতো না কোনো দিন। বলতো, 'হাতে কাঁচা মাংসের গন্ধ হয়ে যায়।'

খাওয়া দাওয়ার পর রাত বারোটায় বাঘের খাঁচার মাথায় উঠতো। আমি দেখতাম হাঁ করে। কিছুতেই তার আগে শুতে যেতাম না।

সেদিন বললাম, 'এখন কেন খাওয়াতে যাবে?'

'যাবো।'

কুমকুম

'তোমার হাতে গন্ধ হবে না ?'

'হোক।'

বুঝলাম মনটা ওর বড়ই অন্যমনস্ক আছে আজ।

হয়তো ছিল তাই।

কিন্তু কে জানতো যে এতই অন্যমনস্ক হবে গণেশ যে, খাঁচার মাথায় না উঠে হঠাৎ খাঁচার দরজার চাবি খুলে মাংসের পুঁটলি নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে যাবে। আর কে জানতো সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা পড়ে যাবে।

কেউ জানতো না।

স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ। অথচ ঘটলো সেই ঘটনা। আমাদের চোখের সামনেই ঘটলো। আমি, রান্নার সেই বুড়ীটা, সার্কাসের দুটো মেয়ে রীতা আর সইতা, এসেছিল কৌতূহলী হয়ে। আজ সকাল সকাল খাওয়াতে এসেছিল তো গণেশদা। ঘুমিয়ে পড়েনি সবাই।

গণেশদা শেরশার হিংস্র থাবার নীচে পড়লো।

চাবি খোলার উপক্রম দেখেই চিৎকার করে উঠেছিলাম আমরা —'ও কি ? ও কি ? দরজা খুলছো কেন ? ওপরের খুপরি থেকে তো— '

কিন্তু কথা আমাদের শেষ করা হলো না।

ঝনাৎ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর গণেশদা শেরশার হিংস্র থাবার নীচে পড়লো !"

কুমকুম

*　　*　　*　　*

শিউরে উঠে খাতাখানা বন্ধ করলো টুটু। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো তার, বুকটা হিম হয়ে গেল। একটা লোক—যে নাকি অতি দুর্দান্ত দুর্দান্ত কথা কইতো, সবাইকে শাসিয়ে বেড়াতো, আর বাবুরাম নামের সেই অবোধ ছেলেটাকে মুখে তর্জনগর্জন করলেও মনে মনে ভালবাসতো, সে কিনা হঠাৎ ভুল করে বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়লো !···

টুটু কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করলো সেই দৃশ্য ! কারণ টুটু নিজেকে বাবুরামের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে। অতএব টুটু কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকলো। আর সেই সময় টুটু বাবার গলা শুনতে পেলো, 'টুটু কই ? তাকে যেন আজকাল আর দেখতেই পাওয়া যায় না। ব্যাপার কি ?'

টুটু তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে নীচে নেমে এলো।

(৭)

মায়ের ডাক শুনলেই বকুনি খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নামে টুটু। নিশ্চিত জানে মা সেই একই বকাবকি শুরু করবেন, 'ছাতের ওই ধুলোভরতি গুমোট গরম ঘরে তোর কী কাজ সারাদিন ?···গল্পের বই পড়াটা কি যোগ-অভ্যাস যে নির্জনে বসে সেই অভ্যাসের সাধনা করা চাই ?···এনে দেখা আমাকে কী বই পড়ছিস।···খেলা গেছে, বেড়ানো গেছে, কেবল ছুটে ছুটে ছাতের ঘরে গিয়ে গল্পের বই পড়া, এ আবার কেমন ?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

টুটুর মুখস্থ হয়ে গেছে ওসব।

তাই টুটু রাগও করে না, প্রতিবাদও করে না। টুটু শুধু মার প্রশ্নবাণ থেকে আত্মরক্ষা করে। তবে ক্রমশঃই বেশ চালাক হয়ে যাচ্ছে টুটু, তাই কিম্ভূতের খাতাখানা

কুমকুম

কোনো সময়েই ফেলে রেখে আসে না, যেখানে রাজ্যের গাদা করা লেপ তোলা আছে তার উপর রেখে আসে উঁচু টুলে উঠে। টুটুর মা দু-তিন দিন তেড়ে এসে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন কি পড়ে টুটু ছাতের ঘরে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি। থাকবার মধ্যে একখানা মোটা-সোটা মহাভারত, আর একখানা ছেঁড়া-খোঁড়া 'পুরাণের গল্প'। তাছাড়া কতকগুলো পুরনো মাসিক পত্র অর্থাৎ ছাতের ঘরে যেমন সব বই পড়ে থাকে আর কি!

'এই সব পড়িস তুই?'—মা বলেছিলেন অবাক্ হয়ে।

টুটু গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'কি হয়? এসব বই পড়ে না মানুষ? না পড়ে তো ছাপা হয়েছে কেন?'

এটা চালাকি, এটা 'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ'র মত।

'আমি পড়ছিলাম' না বলে 'পড়ে না মানুষ?'

কিন্তু সত্যি কথাটা বলবে কি করে? ঠিক জানে বললেই মা ওই—'নোংরা ধুলোমাখা পুরনো' কাগজের বস্তা দেখে শিউরে উঠে কেড়ে নেবেন। মার মতে তো সারা পৃথিবীতে সারাক্ষণ 'জার্ম' কিলবিল করছে।

অতএব চালাকি।

মা অবশ্য তখনকার মতন চুপ করে যান, কিন্তু নিশ্চিন্ত হন না। তাঁর আর এক ভয়। কার কাছে যেন গল্প শুনেছিলেন কাদের একটা ছোট ছেলে ম্যাজিকের বই কিনে লুকিয়ে ম্যাজিক শিখতে চেষ্টা করে ভুল করে কাচ গিলে মারা পড়েছিল। সেই থেকে তাঁর ভয় কি জানি টুটু তেমন কিছু করছে কিনা। যে পাগল ছেলে!

টুটু অবশ্য মাকেই পাগল ভাবে। বাব্বাঃ, এত ভয়। যেন জগতে আর টুটুর বয়সা ছেলে নেই।

টুটুর মা খেতে দিয়েছিলেন, কিন্তু খাওয়ার জিনিস গলা দিয়ে নামছিল না টুটুর। গণেশকে বাঘের খাঁচায় বাঘের থাবার নীচে ফেলে দিয়ে চলে এসেছে সে, বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করছে।

কুমকুম

মা বকে চলেছেন, 'নির্ঘাত তুই একটা অসুখ-বিসুখ বাধাবি। যা দেখছি অবস্থা। সেই কখন কি খেয়েছিস! এখনো খিদে পায়নি? ইস্কুল খুললে বাঁচি বাবা।'

এদিকে টুটু ভাবছে খাওয়া পর্বটা শেষ হলে বাঁচি বাবা।

তা হলো এই সময় শেষ।

টুটু আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে টুক করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বন্ধ করে দিল সিঁড়ির দরজাটা। তারপর আস্তে লেপের চালি থেকে খাতাটা পেড়ে খুলে বসলো। পড়তে লাগলো।

* * * *

"—গণেশের এই ভয়ানক মৃত্যুটা নিয়ে বিরাট গণ্ডগোল উঠলো। পুলিস এলো, খবরের কাগজে উঠলো।

কেউ বললো, 'অসাবধান', কেউ বললো, 'নিয়তি', কেউ বললো, 'মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে।'

পাজী সলোমন সহেবটাও সেই কথাই বললো পুলিসের কাছে—'বেদম মদ খেতো মোশাই, সেই থেকেই এই কাণ্ডটি—'

তবুও পুলিসের লোক বললো, 'কিন্তু মদ খাওয়া তো অভ্যাসই ছিল বলছেন। অথচ এ যাবৎ বাঘের কাজটা ওই লোকটাই চালিয়ে এসেছে—'

'চালিয়ে এসেছে, হঠাৎ একদিন চললো না।' পাজীটা দিব্যি হাসতে হাসতে বললো, 'এই তো আমার এই কলজেটা নিয়ে আজ প্রায় দুকুড়ি দশ বচ্ছর ধরে চালিয়ে আসছি, এই দুনিয়ায় চরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একদিন আর চলবে না। এ সব ঘটোনা হঠাৎই হয় মোশাই! নচেৎ কি বোলতে চান আমার অমোন কাজের লোকটাকে নিজে ইচ্ছে কোরে বাঘের মুখে ফেলে দিয়েছি?'

কথাটা সত্যি। পুলিসরা সেটা বুঝলো, চলে গেল। সকলে মিলে তখন ওই কথাই বলতে লাগলো—'মাতাল হয়ে, মাতাল হয়ে।'

কুমকুম

কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস এই ভয়ংকর ঘটনাটা গণেশ ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছে। গণেশ আত্মহত্যে করেছে। সলোমন সাহেবের এই সার্কাস পার্টির ক্রীতদাসত্ব ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার। এ কি শুধু মুখ বুজে খাটবার দাসত্ব। এ যে মনে প্রাণে দাসত্ব। কাউকে এক ফোঁটা ভালবাসবার স্বাধীনতা নেই, কারো প্রতি একটু মায়া-মমতা দেখাবার স্বাধীনতা নেই, প্রাণপাত পরিশ্রমের বিনিময়ে গালিগালাজ।

অথচ নিজেও সে যেন কোনখানে এই সার্কাস পার্টির মালিক সলোমন সাহেবের কাছে বন্দী। তাই পালাতে পারে না, পালাবার কথা ভাবতেও পারে না।

তাই এমন একটা অবস্থা ঘটিয়ে পালিয়ে গেল গণেশ যাতে তাকে আর বিবেকের কামড় খেতে হলো না বসে বসে। আর হঠাৎ ধরা পড়ে যাবার ভয়ে লুকিয়ে বেড়াতেও হলো না। যেন সলোমন সাহেবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'তেলি হাত ফসকে গেলি' বলে আকাশে উড়ে গেল।

গণেশের সেই ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহখানার দৃশ্য আর বাঘের সেই রক্তখাওয়া মুখ মনে করলে এখনো যেন বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সর্বশরীর শিউরে ওঠে। আর তখন? তখন তো কথাই নেই। খাওয়া গেল, ঘুম গেল, মুখের কথা পর্যন্ত যেন কোথায় চলে গেল। কী এক রকম হয়ে গেলাম আমি।

সলোমন সাহেবের আড্ডায় সেই যে বুড়ীমত মেয়েমানুষটা ছিল রুটি-টুটি রান্না করতো, সে বার বার বলতে লাগলো 'গণেশের ভূতটা এর ঘাড়ে চেপে রক্ত শুষে খাচ্ছে। অপঘাতের মড়া, ভূত তো হবেই। আর বাঘে ওর ঘাড়ের রক্ত শুষে খেয়েছে, ওর ভূতও তাই করতে চেষ্টা করে বেড়াবে এ আর আশ্চয্যি কি।'

শুনে শুনে আমারই ইচ্ছে করতো বুড়ীর ঘাড়ের মাংস ছিঁড়ে খাই। গণেশ আমাকে যতই মন্দকথা বলুক, তবু আমি জানি গণেশ আমাকে ভালবাসতো। সেই গণেশ মরে গিয়ে ভূত হয়ে আমার ঘাড়ে চাপবে? ভূত হয়ে গেলে কি আর তার মনুষ্যত্ব থাকে না? নাঃ, তা হতেই পারে না। গণেশ আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারে না।

কিন্তু গণেশ মরে গিয়ে এইটি করলো, কোনো দিন আর সে আমার ভাল করতে

পারবে না। অথচ কেমন যেন আশা ছিল গণেশ একদিন আমায় ছেড়ে দেবে, আমার পালাবার পথ করে দেবে।

তা গণেশ তো আমার সে আশার শেষ করে দিয়ে গেল। আমিই অতএব সেই 'পথ' খুঁজতে লাগলাম। আর পেয়েও গেলাম।

গণেশ যেমন আমাকে সর্বদা চোখে চোখে প্রায় নজরবন্দী করে রাখতো, ঠিক তেমন ভাবে কেউ দেখতোও না আর। তাই একদিন খুব ভোরে প্রায় অন্ধকার থাকতে তাঁবুর জানলা দিয়ে টপকে বেরিয়ে পড়লাম মরিয়া হয়ে।

'বেরিয়ে পড়লাম' বলছি বটে, কিন্তু সে কি সত্যিই আমি বেরিয়ে পড়লাম? না ভয়ংকর দুঃসাহসী অন্য একটা ছেলে? নতুন গোঁফ-গজানো শক্ত-পোক্ত ছেলে?

সার্কাসের খেলা শিখে শিখে ছেলেটা অনেক কিছুতে পটুও হয়ে গেছে। কারো বাগানের বেড়া টপকানো বা বাড়ির পাঁচিল টপকানো তার কাছে কিছুই নয়! শিক্ষাগুলো তার কাজে লেগে গেছল। পথ-বিপথ অগ্রাহ্য করে সে চললো। এখান ডিঙিয়ে ওখান টপকে, ছুটে হেঁটে।

তখন অবশ্য ছেলেটার একটা মাত্রই সংকল্প ছিল। সে সংকল্প হচ্ছে অন্য একটা সার্কাসের দলে যোগ দেওয়া—যে দলের কর্তা সলোমন সাহেবের মত নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর হবে না, বরং বাবুরামের মত একটা 'খেলা জানা' ছেলেকে লুফে নেবে।

হায়, পৃথিবীকে সে কতটুকুই জানতো।

পথে বেরিয়ে দেখলো বিশাল পৃথিবী, কেউ কারো দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করে না। অন্য কোনো সার্কাসের দল কোথায় পাওয়া যাবে একথা জিগ্যেস করবার লোকই, দুর্লভ, জিগ্যেস করে উত্তর পাওয়ার মত লোক আরো দুর্লভ। এক-আধজন দু-একটা সার্কাসের নাম করলো বটে, কিন্তু ঠিকমত ঠিকানা কিছু দিতে পারলো না। অথচ জেরা করতে লাগলো এত বেশী যে ছেলেটা যেন জেল-পালানো আসামী। বিরক্ত হয়ে ছেলেটা নিজেই লোককে জিগ্যেস করা থেকে নিবৃত্ত হলো, চেষ্টা করতে লাগলো নিজে থেকেই খোঁজ করতে পারে কি না, কিন্তু কোথায় কি?

এদিকে খাওয়া-শোওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। হয়তো কারো দোকানের

কুমকুম

শেড-এর নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়, হয়তো কোনো বাড়ির রোয়াকে বসে বসেই ঘাড় গুঁজে ঘুমিয়ে নেয়। এইভাবে ঘুমটা যদি বা চলে খাওয়াটা চলে না। অথচ ওটার অভাবে শরীরটা প্রায় অচল হয়ে আসছে।

হয়তো চেয়ে খেলে হতো কিছু খাওয়া, কিন্তু চাওয়া মানেই তো ভিক্ষা? রাজারাম রায়ের ছেলে শেষে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষে করবে?

মা, তোমার জন্যেই এই লেখা, তাই ভাবছি তুমি হয়তো বলবে 'সার্কাসের দল থেকে পালাতেই যদি পারলি, তবে বাড়ি চলে এলি না কেন মুখ্যু হতভাগা?'

তা হলে বলি মা, সে ইচ্ছে বার বার হয়েছিল, কিন্তু কী যে ভয়ানক একটা লজ্জায় ধরেছিল সে আর কি করে বোঝাবো?

এই না খেয়ে খেয়ে আর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কঙ্কালসার হয়ে যাওয়া শরীর আর ছেঁড়া-ময়লা-জামা-কাপড়-পরা চেহারা নিয়ে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবো তোমাদের কাছে? যদি তোমরা বল, 'কি রে খুব যে বাহাদুরি দেখিয়ে চলে গিয়েছিলি? এখন?' তখন কি উত্তর দেবো?

এই, এই একটা চক্ষুলজ্জা।

তাই ভাবতে লাগলাম এ অবস্থা থেকে উদ্ধার না হয়ে আর বাড়ি ফেরা যাবে না। তাছাড়া রেলগাড়ির ভাড়াই বা কোথায়?

তখন মনে প্রাণে একটি চিন্তা, অন্য একটা সার্কাসের দলে ঢুকেছি, খুব নাম করেছি। একদিন তোমরাও এসেছো সার্কাস দেখতে, আর আমার খেলার বাহাদুরিতে খুব হাততালি পড়ছে, সেই সময় তোমরা ভাবছো,—একে যেন বড় চেনা চেনা লাগছে; কে এ? সেই 'কে এ? কে এ?' ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে তোমরা ভিতরে এসে ঢুকে পড়লে খোঁজ নিতে। তারপর? তারপর ঘটে গেল এক ঘটনা। বুক ভরতি মেডেল পরা ছেলেটাকে তোমরা বুকে টেনে নিয়ে কেঁদে বলে উঠলে, 'ওরে পাজী ছেলে এই রকম করতে হয়?'

এ চিন্তা যে স্রেফ পাগলের চিন্তা সেটা বড় হয়ে বুঝেছি।

কিন্তু তখন সেই চিন্তাটাই ছিল যেন ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু হঠাৎ একদিন মন

ঘুরে গেল। হঠাৎ মনে হলো সার্কাস পার্টি ছাড়া আর কিছু ভাবছি নাই বা কেন আমি? জগতে তো আরও কত ভাল ভাল কাজ আছে, যে কাজ করে মুখটা বড় করে আবার রাজারাম রায়ের বাড়ির দেউড়িতে ঢুকতে পারবো।

সার্কাসের দলের ছেলেকে কি ভাল ভদ্দরলোকেরা ভদ্দর বলে মনে করে? কে জানে, বোধ হয় করে না। হয়তো এক বুক মেডেল তাদের কাছে কিছুই নয়। তবে?

এই মনের বদলটা ঘটেছিল অবশ্য ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে। সেই ঘটনা থেকেই এলো ধিক্কার। একদিন রাস্তায় চলছি, হঠাৎ খুব বৃষ্টি এলো। একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি। কোথায় যাই, কী করে মাথা বাঁচাই।

এদিকে বৃষ্টি বেড়েই চলেছে।

উপায় না দেখে একটা বড় বাড়ির দরজায় জোরে জোরে ঘা মারতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলে গেল, আর একজন ভদ্রলোক দরজাটা খুলে একটু-খানি ফাঁক করে দরজাটা চেপে ধরে থেকে বলে উঠলেন, 'কে?'

আমার মাথার ওপর প্রবল বৃষ্টি, আমি শীতে হি-হি করে কাঁপছি, তবু ভদ্দরলোক একটিবার বললেন না, 'আহা বেচারী, এসো ঢুকে এসো।' বরং যেন এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন আমি ঢুকতে চাইলেই নাকের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

তখন আমি ভাবলাম, জানে না তো আমি কে, পরিচয় পেলে এখনি তাড়াতাড়ি আদর করে ঘরে ডাকবেন, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে দেখাবেন, যত্ন করে খাওয়াতে বসাবেন। তাই আমি বেশ গৌরবের গলায় বললাম, 'আমি দি গ্রেট রয়্যাল সার্কাসের খেলোয়াড় হঠাৎ এদিকে এসে পড়েছি, বৃষ্টি পড়ছে একটু জায়গা চাই।'

ভদ্দরলোক কিন্তু এই পরিচয় পেয়েও কিছুমাত্তর ব্যস্ত না হয়ে আরো খেঁকি গলায় বলে উঠলেন, 'জায়গা চাই। ওঃ দাবি? তা কেন হে বাপু দাবিটা কিসের? জমি ইজারা করে রেখেছিলে বুঝি?'

ভাবলাম বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে আমার পরিচয়টা শুনতে পায়নি। তাই আরো

জোরে বললাম, 'শুনুন আমি হচ্ছি—দি গ্রেট রয়্যাল সার্কাসের একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়, আমি—'

ভদ্দরলোক—ভদ্দরলোক আর বলবো না, লোকটা 'খ্যা-খ্যা' করে বলে উঠলো, 'কয়বার শুনবো দি গ্রেট মশায়? কী ভাবছো সার্কাসের খেলোয়াড় শুনে মোহিত হয়ে যাবো? সার্কাসের খেলোয়াড়! উঃ কী মহিমান্বিত ব্যক্তি! যাও যাও, যত সব ছোটলোকের ঝামেলা।'

লোকটা ইচ্ছে করলে কিছু না বলেই আমার নাকের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারতো। কিন্তু তা না করে ওই রকম খিঁচোতে লাগলো। হঠাৎ ভারী রাগ ধরে গেল, রেগে-মেগে বললাম, 'জায়গা না দেবেন, না দেবেন, ছোটলোক বলছেন কেন?'

লোকটা হি-হি করে হেসে উঠে বললো, 'ছোটলোক বলছি কেন? তবে কি বলতে হবে? মস্ত ভদ্দর লোক? বাবুর কী অহংকার! কে আমি!—না রয়েল বেঙ্গল টাইগার। যত সব ঝামেলা।'

—যাও যাও, যত সব ছোটলোকের ঝামেলা।

এবার দরজাটা বন্ধ করে দিল। তবু আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। না দাঁড়িয়ে উপায়ও ছিল না। তবু তো ওদের দরজার মাথার কার্নিশটার নীচে থাকার দরুন মাথাটা বাঁচছে। মাথাটা বাঁচছে, কিন্তু গায়ে বৃষ্টির ছাট আর পেটে খিদের জ্বালা। এই রকম অবস্থায় আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন বুদ্ধির দরজাটা খুলে

গেল। মনে হলো, কী আমি মেডেলের জৌলুশের চিন্তায় পড়ে আছি! সার্কাসের দলের ছেলের মেডেলের মহিমা তো দলের কর্তার। ছেলেটার কি আলাদা করে কোথাও মান-সম্মান আছে? কেউ না, কিছু না। কে পোঁছে তাদের? এই তো সলোমন সাহেবের দলের কৃষ্ণনাথ, ভবানী, ফকরু, কত মেডেল ওদের, কিন্তু বাইরের কোথাও নাম আছে ওদের? কেউ চেনে? কেউ না। বরং এই তো নিজেকে দিয়েই দেখছি, লোকে বলে 'ছোটলোক'। সেইদিন, সেই একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সার্কাসপার্টি খুলে নাম করার ইচ্ছেটা উড়ে গেল। মনে হলো ছেলের সেই মূর্তি দেখে বাবা ঘেন্নায় নাক কোঁচকাবেন। হয়তো তুমিও, না না তুমি কিছুই বলবে না জানি। জানি তুমি তোমার খোকাকে পেলেই বর্তে যাবে।

কিন্তু বাবা তো একটা নামকরা লোক, বাবার কত বড়লোক বন্ধুবান্ধব, তাদের সামনে সেই 'ছোটলোক' ছেলেকে দেখতে মজা পাবেন বাবা?

ঘুরে গেল মন।

ঘুরে বেড়াতে লাগলো ছেলেটা—এলোমেলো লক্ষ্যহীন।

আর সত্যি বলতে গেলে ভিখিরীর হালই হলো তার শেষ পর্যন্ত। পথের লোকের দয়ার দানেই চলতে লাগলো তার।

সার্কাসের স্মৃতি তার ক্রমেই ঝাপসা ঝাপসা হয়ে আসছিল, জলের স্রোতে যেমন খড়কুটো ভাসে তেমনি ভেসে ভেসে এ ঘাট থেকে ও ঘাট করতে করতে কেমন করে যেন সেই কানাকড়ার সম্বলহীন ছেলেটা কাশীধামে এসে পোঁছে গেল।……"

(৮)

"কাশী এলাম।

জানি না কেমন করে এলাম, কার দয়ায় এলাম…ক্রমশঃই সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।…মনে পড়ছে না কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে। সেই সর্বাঙ্গে ছাইমাখা জটাধারী সন্নিসী 'ধরমবাবা', তাঁকে কোথায় দেখেছিলাম? কাশীতে? না প্রয়াগে?

কুমকুম

আর সাধন মহারাজ? সেই গেরুয়াপরা শান্ত নরম সন্নিসী ঠাকুরটি? সেও কি কাশীতে? না বিন্ধ্যাচলে? কবে বেহুঁশ ছেলেটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে যিনি প্রাণদান করেছিলেন?

আর—আর ওই যে চিমটে নিয়ে তেড়ে আসছে? ও কে? আগুনের ডেলার মত দুই চোখ, ভস্ম করে দিতে আসছে আমাকে। ওর 'ধুনি'টা ছুঁয়ে ফেলেছিলাম আমি, বললো, 'তোর জান্ খিঁচে লিই, আয়।'

ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল আমার, মনে হয়েছিল স্বয়ং যমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তবু হঠাৎ মনে সাহস এনেছিলাম। কেন সেই সাহস জানো মা? মনে হলো মরতেই তো হবে, ওই দেড়হাত লম্বা ভয়ংকর ধারালো চিমটেটা পেটে বিঁধে গেলে স্বর্গের ভগবানও তো বাঁচাতে পারবেন না? তবে আর ভয় করি কেন? আর পালিয়ে গিয়ে কি ওর সঙ্গে পারবো? ওর ওই আগুনের ডেলার মত চোখ দিয়ে সম্মোহন করে আমায় ঠিক টেনে আনবে। তাই পালিয়ে যাবার চেষ্টা না করে হঠাৎ বুকে সাহস এনে বুক টান করে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, 'লেও।'

ও একটু থমকে পড়লো।

তারপর বললো, 'মস্করা? হাম তুম্‌কো ভস্‌মো কর দেগা।'

আমি ওই সার্কাসের দলে থেকে থেকে কিছু হিন্দী বলতে শিখেছিলাম। ভুল হতো, ওরা হাসতো, তা-ও বলতাম। আর এখন? এখন তো বাংলাই বলতে পারি না ভালো করে। এখন একটা জগাখিচুড়ি ভাষা শিখে বসে আছি, জানি না শুনলে তোমরা কত হাসবে।

তা সেদিনের হিন্দীও হাসির মতই ছিল। কাঁপা বুককে শক্ত করে উত্তর দিলাম, 'দেও! হামি ভস্‌মো হোবে তো দুনিয়াকো কৌন লোকসান হোগা? কুছ্‌না।'

সাধুজী হঠাৎ স্থির হয়ে গেল।

তারপর কড়া গলায় বললো, 'লোকসান নেই হ্যায়?'

কুমকুম

'নেহী!' আমিও চোটপাট বলে দিলাম, 'লেকিন্ তুম তো সাধু হ্যায়, তো তব্ এ্যাইসা ক্রোধ হ্যায় কাঁহে?'

সাধুজী হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, চিমটেটা নামিয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে রেখে বললো, 'কেয়া বোল্‌তা হ্যায়?'

আমি বেশ সাহসে ভর করে বলে দিলাম, 'বোল্‌তা হ্যায় কী, যো লোক সাধু হোবে, সন্ত্ হোবে, ভগ্‌মানকো-দাস হোবে, কাহে এত্‌না ক্রোধী হোবে?'

সাধুজী মিনিট খানেক গুম হয়ে থেকে বলে উঠলো, 'যা ভাগ!' তারপর নিজেই উলটোমুখো হয়ে দুমদুম করে পা ফেলে চলে গেল।

তা রাগী সাধু কম দেখলাম না জীবনে। সাধু সন্নিসী হয়ে কোথায় দয়ালু হবি, মায়া-মমতাওলা হবি, শান্তশিষ্ট সভ্য সজ্জন হবি, তা নয়! রাগ, ধমক, গালাগাল, তেড়ে মারতে আসা, ভস্ম করতে আসা, অভিশাপ দেওয়া এসব তো কথায় কথায়।

আমাদের এই ভারতবর্ষে কত লক্ষ হাজার সন্নিসী আছে, কিন্তু ক'জন সত্যি দয়ালু সন্নিসী? ক'জন মেজাজ-কড়া? খুব কম। মেজাজেই অস্থির। রাগীর রাজা এক একটি। আশ্চয্যি বাবা, এই কি ভক্তের নমুনা? সংসার-বৈরাগীর নমুনা? সারা জন্মে আমি তো এর মানেই পেলাম না।

একবার আর এক 'বাবা' আমায় শীতের রাত্তিরে হরিদ্বারের মতন জায়গায় আশ্রম থেকে বার করে দিয়েছিল। কারণ? কারণ ও আমায় বার বার উঠিয়ে গাঁজা সাজতে বলেছিল, আমি শেষকালে আর উঠিনি। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল।

· · সেই শীতের রাত্তিরে কনকনে হিমে জমে বরফ হয়ে বসে আছি আশ্রমের বাইরে, আর মনে পড়ছে সেই একটা বিষ্টির দিনের কথা। যেদিন আমার সার্কাসের মন ঘুচে গিয়েছিল। সেই মনে পড়ার সময় কে যেন আমাকে ডেকে বললো, 'আও বেটা ঘর আও।'

ঘর আও!

এ আবার কেমন কথা? আমার আবার ঘর কোথা? মনে হলো ঘরের

কথা ভেবে ভেবে স্বপ্ন দেখছি। আবার সেই ডাক। চোখ খুললাম, দেখি একটি বুড়ী! চোখে তার মায়ের স্নেহ।

এই পৃথিবীতে চরতে চরতে কত রকম মানুষই দেখলাম মা! দেখলাম মানুষের যেমন নিষ্ঠুরতারও তুলনা নেই, তেমনি দয়ারও শেষ নেই। মানুষই শয়তান, মানুষই ভগবান। দয়ালু সন্নিসীই কি কম দেখলাম? তখন তো কেবল ওদের পিছু পিছুই ঘুরেছি। কেউ কেউ যেমন খারাপ ব্যবহার করেছে, তেমনি কতজন দয়া-মায়ায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সেই সেদিনের বুড়ী? কেউ নই আমি তার, সে একজন পাহাড়ী মেয়ে, অথচ আমায় ঠিক ছেলে বা নাতির মত যত্ন করলো, খাওয়ালো, আর বাড়ি ছেড়ে মা-বাপ ছেড়ে পথে পথে ঘোরার জন্যে বকুনি দিল। তারপর—ক'দিন পর হঠাৎ একদিন সকালে দশটা টাকা আমার হাতে দিয়ে বললো, 'তু চলা যা বেটা! ঘর যা!'

তারপর বললো, সে সন্নিসিনী, কিন্তু আমার মায়ায় পড়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, তাই পালাতে চায়। যাবে লছমনঝোলায় তার গুরুর কাছে।

আমি সেদিন জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু সেদিন অত রাত্তিরে তুমি হঠাৎ বাইরে এসেছিলে কেন? আমি রাস্তায় পড়ে শীতে কাঁপছি কে বললো তোমায়?'

বুড়ী বললো, 'জানি না! ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ কে যেন ঠেলে উঠিয়ে বললো—যা বাইরে একটা ছেলে কষ্ট পাচ্ছে।...তাই কম্বলটা মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু তোর মায়ায় জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছি। তাই আর নয়।'

সেখান থেকে কোথায় চলে গেলাম? বদরীকাশ্রম? কেদারনাথ? না সেবারে নয়। সেবারে নেমে এসেছিলাম বোধ হয়। ঠিক মনে নেই। হিমালয়ের পথে কতবারই গেলাম এলাম। আর ক্রমেই দেখতে লাগলাম, এই পৃথিবীটা এক অদ্ভুত আজব জায়গা! বোঝা যায় না কেনই বা কেউ ভালোবেসে ঘরে ডাকে, কেনই বা কেউ তাড়া দিয়ে ঘরের বার করে দেয়।...দেখলাম একটা কুকুর ভেড়া ছাগলও মানুষের মতন ভালোবাসতে পারে।

আমার সেই যে কুকুরটা—যার নাম দিয়েছিলাম আমি শিবপূজন? সে

কুমকুম

আমায় যেমন ভালোবেসেছে তেমন ভাল আজ পর্যন্ত বোধহয় কোনো বন্ধু বাসেনি। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো, আমার খাওয়া না হলে কিছুতেই খেতো না, আর রাত্রে আমি ঘুমুলে পাহারা দিতো।

তখন আমি একটা কাঠ-কুড়নেওয়ালার চাকর হয়ে আছি! লোকটার ছেলেপুলে নেই যে কেউ সাহায্য করবে, অথচ নিজে বুড়ো হয়ে এসেছে, তাই আমাকে দিয়ে কাঠ বওয়াতো, বনে গিয়ে কুড়িয়ে আনতে বলতো, তার বদলে আমায় খেতে থাকতে দিতো। তা সেই যেমন খাওয়া তেমনি থাকা! মোটা মোটা আটার রুটি আর ডাল এই হলো খাওয়া, আর বাঁশ-বাখারি পাতা দিয়ে বানানো ঘরে থাকা!

কুকুরটাকে আমি কিনিওনি, যোগাড়ও করিনি। নেহাত রাস্তার কুকুর। একদিন দেখি একটা ভাঙা শিবমন্দিরের চাতালে চুপ করে বসে আছে। আমি আমার মনিবের বানানো রুটিগুলোর সবটা খেতে পারতাম না। লুকিয়ে পাশের মোটা মোটা ধারগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। কুকুরটাকে দেখে তার দিকে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলাম, ব্যস সেই হয়ে গেল বন্ধুত্ব। খেয়ে যেন বর্তে গেল। আমার পিছু নিলো। ও যখন সব সময় আমার পিছন পিছন চলতো, আমার তখন নিজেকে যুধিষ্ঠির আর ওকে কুকুররূপী ধর্মরাজ মনে হতো! দেখো মা, তোমার কাছে শোনা সেই গল্প কিন্তু আমার এখনও মনে আছে। তারপর অবিশ্যি সাধুদের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরে অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছি শিখেছি। অনেক কথকতা শুনেছি, কিন্তু মনে করতে গেলেই তোমার বলা গল্পটার কথাই মনে পড়ে।

শিবমন্দিরে পেয়েছিলাম বলে ওর নাম দিয়েছিলাম শিবপূজন। ভেবেছিলাম যখন বাড়ি যাবো ওকে আমি নিয়ে যাবো। তোমরা হয়তো প্রথমে হাসবে, ভাববে ও মা, একটা রাস্তার কুকুরকে পুষেছে। কিন্তু যখন ওর বুদ্ধির কাণ্ড দেখবে? যখন টের পাবে আমাদের সব কথা ও বুঝতে পারে? তখন?

তা সেই ডাক্তার ডাকার কথাই বলি। একদিন গরমের দুপুরে—মাসটাস জানি না, বার-তারিখ কিছুই জানি না, ওসব মন থেকে মুছে গেছে। শুধু জানি

কুমকুম

গরমের দুপুর। তা সেই দুপুরে বনে জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে রোদ লেগে কেমন শরীর খারাপ হয়ে গেল। কলেরার মতন শুরু হয়ে গেল।.....”

কলেরা!

পড়তে পড়তে শিউরে উঠলো টুটু। খাতাটা একবার মুড়ে রাখলো।

কলেরা খুব খারাপ অসুখ!

পাশের বাড়িতে কারো হলেও সে দেশ থেকে পালাতে হয়! কিম্ভূত বেচারীর তাই হয়েছিল। রোদ লেগে! সেই জন্যেই বুঝি মা অত বারণ করেন রোদ লাগাতে? ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়ালে অত ডাকাডাকি করেন।

আমি ভাবি মার শুধু সব সময় বকাটাই ইচ্ছে, আসলে কিন্তু তা নয় মনে হচ্ছে। বোধ হয় আমার পাছে অসুখ করে—

খাতাটা আবার খুলে পড়তে লাগলো।

“ছটফট করছি, মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছি আর ভাবছি শিবপূজন যদি একটু জল এনে খাওয়াতে পারতো আমায়। কিন্তু কি করেই বা বোঝাবো ওকে? আর কিসে করেই বা আনবে? খেলাচ্ছলে ওর মুখে কাঠের বোঝা ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছি কতদিন, কিন্তু জল? জল কি করে আনতে পারবে? ওর দিকে তাকিয়ে আছি, আর ভাবছি, আমি যদি মরে যাই, ওর কি হবে? হঠাৎ দেখি ও আমার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। মনটা হাহাকার করে উঠলো, বুঝলাম মৃত্যু নিশ্চিত। না হলে কখনো অমন পরমবন্ধুও ত্যাগ করে যায়?

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মানুষের গলা শুনতে পেলাম। আমাকেই কি যেন বলছে। কষ্টে তাকিয়ে দেখি একজন ডাক্তার। নীচু হয়ে আমার নাড়ী দেখছেন।

ডাক্তার কে ডাকলো?

আর কেউ নয়—শিবপূজন।

ভাগ্যক্রমে সেই ডাক্তারটি ছিল বাঙালী। পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—

মানে সেরে ওঠার পর। বললেন, 'আশ্চর্য বাপু তোমার এই কুকুর! এমন করে টানাটানি করে আর চিৎকার করে করে বিপদ বুঝিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এলো। সে বললে লোকে বিশ্বাস করবে না। ঠিক যেন মানুষ! ওর ধরন-ধারন দেখে ভারী কৌতূহল হলো, ভাবলাম দেখি তো ব্যাপারটা। তা ছাড়া—না এলে ও বোধহয় আমায় ছিঁড়ে খেতো। কিন্তু ঈশ্বর জানেন কি করে ও জানলো অসুখ করলে ডাক্তার ডাকতে হয়, আর আমি একজন ডাক্তার।'

আমিও জানতে পারি নি কোনো দিন। বুঝিনি কে ওর মধ্যে এই অলৌকিক শক্তি দিয়েছিল।···সেই শিবপূজন, আমার প্রাণদাতা, তাকে আমি রাখতে পারলাম না, অপঘাতে মৃত্যু হলো তার। শুধু শুধু রাস্তার একদল ছেলে পাথর ছুড়ে মেরে ফেললো তাকে।

আশ্চর্য এই পৃথিবী।

কোনো অনিষ্ট করেনি শিবপূজন তাদের, অথচ—খেলা! কী নিষ্ঠুরই হতে পারে এই ছোট ছেলেগুলো। আর কী ভয়ংকর তাদের খেলা! নিরীহ একটা প্রাণী, রোদে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, তাকে পাথর মেরে মেরে শেষ করে দিল।

আমি ছিলাম না, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অন্য একটা গ্রামে গিয়েছিলাম তাঁর ব্যাগ বয়ে। তিনি আমাকে বাঁচানো অবধি এই কাজই করছিলাম আমি। তিনি আমাকে বলেছিলেন শিখিয়ে শিখিয়ে আমাকে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার করে তুলবেন। আমি ভক্তি করতাম তাঁকে। ভেবেছিলাম তিনি যখন বাঙালী, জীবনে একবারও তো এই পাহাড়ী দেশ থেকে বাংলাদেশে যাবেন, তখন আমিও যাবো। ওই ব্যাগ-বওয়া চাকর হয়েই যাবো। তারপর তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবো।

কিন্তু শিবপূজনের ওই বীভৎস মৃত্যুতে আমার মন ভেঙে গেল, পাগলের মত হয়ে গেলাম, ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে চলে গেলাম।

আরো কেন চলে গিয়েছিলাম জানো মা? ওখানে রাস্তায়-ঘুরে-বেড়ানো দুষ্টু ছেলেদের দেখলেই আমার তাদের পাথর ছুড়ে মারতে ইচ্ছে করতো।

পাছে কোনো দিন সে ইচ্ছে সামলাতে না পারি?—সেই ভয়ে পালিয়ে

গেলাম। তারা অবোধ, তারা দুষ্টু, কিন্তু তারা তাদের মা-বাবার ছেলে তো? ভগবানকে কেবল বলতাম—ভগবান, আমায় এই ইচ্ছে থেকে উদ্ধার করো, তবু যেন ওদের দেখলেই হাত নিশপিশ করতো।

তবে পালানোই ভালো।

সেখান থেকে চলে গিয়ে কোথায় কোথায় যে ঘুরলাম। কত নদী পাহাড় বন শহরই দেখলাম, কত জনের কাছে থাকলাম, কত জনের ভাত খেলাম। আর ক্রমশঃ এটাই বুঝলাম, আমাদের এই ভারতবর্ষে বিনা সম্বলেও একটা মানুষ পৃথিবী ঘুরতে পারে।

আমাকে একটা নেপালী কুলি, অন্য একজনের কাছে বেচে দিয়েছিল।

অথচ আমি জানি না যে আমায় বেচে দিচ্ছে। ওদের ভাষা তো বুঝি না, ইশারায় জিগ্যেস করেছিল, 'খেতে চাও?' আমি বলেছিলাম, 'হাঁ।'

তারপর—আর একটা লোকের কাছে হাত-মুখ নেড়ে কত কিই যে বললো তাকে, তারপর আমাকে আবার ইশারায় তার কাছে থাকবার উপদেশ দিয়ে রেখে চলে এলো। সে আমায় খেতে দিল।

'আশ্চর্য বাপু তোমার এই কুকুর।' [পৃষ্ঠা ৮৪

যত রকম অখাদ্য রান্না জগতে আছে সবই আমি খেয়ে খেয়ে পাকা হয়ে গেছি, কাজেই কোনো খাবারই আমার অখাদ্য মনে হয় না। তবু সেদিন সেই নতুন লোকটার মাংস আর চাপাটি? উঃ! যেন জুতোর সুকতলা!

তাও কষ্ট করে খেলাম একটু।

ভাবলাম যাক, দিয়েছে তো অমনি অমনি।

হায় কপাল, অমনিই বটে ?

পরদিন থেকে আমায় এইসা খাটাতে শুরু করলো যে সেই জুতোর সুকতলাও হজম হয়ে যেতে লাগলো আমার খাটুনির চোটে। পঁচিশটা মহিষ ছিল তার, তাদের কাজ করা। গরুর রাখালের মত আর কি !

আর সেই মোষগুলো যা ভয়ংকর দেখতে বাব্বাঃ ! যেমনি কালো তেমনি বড়, আর তেমনি তাদের শিং ?

ক্রমে ক্রমে বুঝলাম মোষগুলো ওর নিজের নয়। ওর একজন মনিব আছে, তারই জিনিস। মনিব ওকে মাইনে দিয়ে রেখেছে, আর ও আমায় বিনি মাইনেয় খাটিয়ে নিজে আরাম করছে। আস্তে আস্তে ওর কথা বুঝতে শিখছিলাম, তখনই একদিন রেগে গিয়ে ওকে দু কথা বলতে যেতেই ও আমায় ধাঁই ধপাধপ মেরে বলে উঠলো, 'মাইনে মানে ? অমনি খাটছিস মানে ? তোকে আমি এককুড়ি টাকা দিয়ে কিনিনি ?'

বোঝো ব্যাপার ! আমি কে, আমায় বিক্রি করলো কে, আর কিনলো কে ! তাও আবার কুড়ি টাকায় ! বললাম, 'ও সব কেনা টেনা বুঝি না, আমি চলে যাবো ব্যস।'

ও নীরবে একটা বড় ভোজালি বার করে আমায় দেখালো। আর ওর মুখে ভোজালির মতনই ধারালো একটা হাসি ফুটে উঠলো।

চুপ করে গেলাম।

ভাবলাম লুকিয়ে পালাবো।

কিন্তু কখন ? দিনরাত্তির ওর পাহারা আর যখন তখন চোখের সামনে সেই ভোজালির নাচন দেখিয়ে দেওয়া।

তবু পালালাম।

কিন্তু সে নিজের বাহাদুরিতে নয়। ওই 'থাপা'র—হ্যাঁ, ওর নাম ছিল 'থাপা'—

কুমকুম

তা ওই থাপার মেয়েই একদিন রাতে চুপি চুপি আমায় দরজা খুলে দিল। কিন্তু সেও এক কাণ্ড! দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'চলো এক জায়গায়।'

গেলাম ওর সঙ্গে সঙ্গে।

ভাবলাম আমারই সমান বয়সী একটা মেয়ে, ও আর আমার কী ক্ষতি করতে পারবে।

ওর নাম রুন্‌কি। শুনেছি থাপার মুখে। তা সেই রুন্‌কি আমায় কোথা দিয়ে না কোথা দিয়ে সরু সরু অন্ধকার গলিপথ পার হয়ে নিয়ে গেল একটা গভীর অন্ধকার ঘরে। সে ঘরের একটি কোণে শুধু একটি প্রদীপ জ্বলছে, আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে একটি পিতলের বুদ্ধমূর্তি।

রুন্‌কি আমায় সেই মূর্তির কাছে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ দু হাতে মূর্তিটা ধরে একটা ঠেলা মারলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নীচের বেদীটা হয়ে গেল একটা সিন্দুক।

সেই সিন্দুকে—

বললে কেউই হয়তো বিশ্বাস করবে না—সেই সিন্দুকে শুধু সোনার টাকা ঢালা। নীচের মেঝে থেকে বুদ্ধের মূর্তিটি প্রায় 'এক মানুষ' ওপরে। কাজে কাজেই ওই অতটা উঁচু সিন্দুক। সেই সিন্দুকে শুধু সোনার টাকা। ভাবা যায়?

রুন্‌কি কিছুটা ভাষায় আর কিছুটা ইশারায় বোঝালে—এই ঠাকুর আসলে ঠাকুর নয়। তার বাবার মনিবের গুপ্ত ধনাগার ঢাকবার ছল।

রুন্‌কির বাবাও জানে না এ খবর।

রুন্‌কি খুব ছোটবেলায় গিন্নীমার সঙ্গে আসতো এখানে। তা ও ছোট্ট বলে গিন্নীমা ওর সামনে এসব খুলতেন। কিন্তু এখনও সে কথা মনে আছে রুন্‌কির। এখন রুন্‌কির ইচ্ছে এই সোনার টাকা থেকে বেশ কিছু সরিয়ে ফেলে শহরে চলে গিয়ে খুব বড়লোকের মত আমোদে আহ্লাদে থাকবে। কিন্তু একা মেয়েমানুষ কি করে কি করবে? তাই আমার সাহায্য চায়। আমি যদি কিছু বেশী করে টাকা তুলে নিয়ে আর ওকে নিয়ে শহরে যাই তো বেশ ভালো হয়। আর আমারও মোষের কাজ করতে হয় না।

কুমকুম

শুনে আমার রাগে হাড় জ্বলে গেল! বললাম, 'চুরি করার চেয়ে মোষের সেবা করাও অনেক ভালো।'

রুন্‌কি মিনতি করে বললো, 'তুমি বুঝছো না, ওসব তো ওর মনিব জোখুরীর ব্যবসা করে জমিয়েছে। জোখুরীর টাকা চুরি করে নিলে দোষ কি?'

আমি বললাম, 'যে যা করেছে করেছে, আমি অন্যের জিনিস নিলেই হবো চোর। তুমি নিজে চোর, আবার আমায় চুরির মতলব শেখাচ্ছো?'

রুন্‌কি বললো, 'তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।'

'আমার ভালোয় কাজ নেই।'

'তুমি বুঝছো না! আমার বাবা যে কী শয়তান, তোমার জানা নেই। খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবে তোমায়। আমাকেও মেরে ফেলতে চায় একটা পাজী বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। তার চাইতে চল এ টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আমরা বিয়ে করি।'

আমি বললাম 'আমি বাঙালী।'

ও বললো, 'তা হলে কি? মানুষ তো? সব মানুষই এক।'

'কিন্তু বিয়ে করবার ইচ্ছে টিচ্ছে আমার নেই।'

রুন্‌কি বললো, 'বেশ না থাকে না থাক, তুমি শুধু আমায় শহরে পৌঁছে দেবে চলো। আর দুজনে মিলে যত পারি টাকা—'

আমি রেগে বললাম, 'বারে বারে বোলো না। কিছুতেই আমি টাকা চুরি করতে পারবো না। বুদ্ধ রয়েছেন না সামনে? তবু তোমার ভয় নেই?'

রুন্‌কিও এবার রেগে উঠলো। বললো, 'ও কি দেবতা? ও তো ওদের সোনা ঢাকবার ছল।'

'তা হোক। মূর্তি তো দেবতার।'

'দেবতা হলে আমার কষ্ট বুঝবে।'

'তা হোক। চুরি আমি করবো না।'

'তবে আমাকেই শুধু নিয়ে চল।'

বুঝলাম ও ঠিক করছে নিজেই যা পারবে নেবে। বললাম, 'না তোমাকে

নিয়ে যাওয়াও একরকম চুরি। তোমার বাবার ঘর থেকে তার মেয়ে চুরি করে নিয়ে যাওয়া নয়?'

'তা হলে নিয়ে যাবে না?'

'না?'

'ভালো করে ভেবে দেখো।'

'দেখেছি।'

'এটা দেখেছো?' বলে রুন্‌কি ঠিক তার বাবার মতই একটা ঝকঝকে ভোজালি বার করলো পোশাকের গোপন পকেট থেকে, বাপের মত করেই আমার মুখের উপর নাচিয়ে দিল।

একটা ঝকঝকে ভোজালি বার করলো পোশাকের গোপন পকেট থেকে।

কিন্তু আমি কি ওই মেয়েটাকে ভয় করবো? নাঃ, তা হতে পারে না। বললাম, 'বেশ তো মারো না। চুরি করে রাজা হওয়ার চেয়ে খুন হওয়াও ভালো।'

'ওঃ বটে!'

ও রেগে আগুন হয়ে বললো, 'চলো তোমায় আবার বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বলবো লুকিয়ে পালাচ্ছিলে, আমি ধরে ফেলেছি।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে চলো। তুমি যদি নিজের বাবার সঙ্গে এরকম মিথ্যে কথা বলতে পারো, বলবে চলো। আমার কী আর হবে? মার? সে তো উঠতে বসতেই চলছে। খুন হওয়া? তাতেও ভয় নেই। মরেই তো আছি।'

রুন্‌কি তখন হঠাৎ ফ্যাঁস্‌-ফ্যাঁস্‌ করে কাঁদতে বসলো।

আমি বললাম, 'কেঁদো পরে। এখন আমায় ফেরার রাস্তাটা চিনিয়ে দাও, যেমন খাটিয়ায় শুয়েছিলাম শুয়ে পড়িগে।'

কুমকুম

'আবার ফিরে যাবো ?'

'কী আর করবো ?' জোর গলায় বললাম, 'চুরির বদলে বাঁচতে চাই না।'

রুন্‌কি তখন বললো, 'যাও চলে যাও, তোমায় চুরি করতে হবে না। টাকাও না, মানুষও না। চলে যাও নিজের দেশে। এই মন্দিরের পিছনের দরজা খুললেই একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়বে। ছিঃ এত বোকা তুমি !'

'তোমায় এর জন্য অনেক ধন্যবাদ।' বলে আস্তে আস্তে সেই পথে চলে এলাম।

রুন্‌কি গলির মুখ পর্যন্ত এলো, আর ওড়না দিয়ে কেবল চোখ মুছতে লাগলো। ওর জন্যে যে একটু মায়া হচ্ছিল না তা নয়। আহা অনেক আশা করে ডেকে এনেছিল আমায়। কে জানে ওর পিশাচ বাবাটা কোন একটা পাজী বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে ওর। তাছাড়া—এই তো আমি পালিয়ে এলাম, যদি বুঝতে পারে রুন্‌কিই ছেড়ে দিয়েছে, তা হলে কি আস্ত রাখবে ওকে ? হয়তো সেই ভোজালিটা দিয়ে চিরেই ফেলবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। মনে হতে লাগলো কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল। রুন্‌কিকে যদি আমি ওর শয়তান বাবার কবল থেকে উদ্ধার করে শহরে এনে ছেড়ে দিতাম, সেটাই ঠিক কাজ করা হতো ? কাঠমাণ্ডু শহরে কত বড়লোক আছে, নিশ্চয় কারুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতো ওর, অত যখন সুন্দরী ! তাছাড়া আবার সঙ্গে মেলাই সোনার টাকা !

কিন্তু চুরি !

মন যে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

টাকা চুরি, মেয়েটাকে চুরি ! না না হতেই পারে না। ওর বাবার মেয়ে ও, ওর ভাগ্যে যা আছে হবেই, আমি কি বন্ধ করতে পারবো ? এই যে আমি দুর্মতি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এত দুরবস্থা ভোগ করছি, সেটা ভাগ্যে ছিল বলেই তো !

রুন্‌কিরও হয়তো এটা দুর্মতি। আর সে দুর্মতির সাহায্যকারী হবো আমি ? নাঃ !

সেই অন্ধকার গলি দিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগলাম। বলবো কি যেন অফুরন্ত গলি ! কতবার মোড় নিচ্ছি, কতবার ঘুরছি, শেষ আর হয় না।

অবশেষে দেখলাম বড় রাস্তায় ভাঙাচোরা কাদাখোঁচা একটা দোকানের সামনে পড়েছি। বন্ধ দোকান, জানি না কিসের, সামনের দিকে চালার নীচে বসলাম একটু।

তাকিয়ে দেখলাম, জীবনেও এ পথে আসিনি, এ রাস্তার মূর্তি দেখিনি। যেন গ্রামটার একেবারে উলটো দিক্। নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম, কারণ থাপা হঠাৎ এসে পড়বে এ ভয় নেই। নীচু হয়ে বসতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কি পড়লো ঠুং করে। ওমা একটা সোনার টাকা! কী কাণ্ড। আমি তো তাতে হাত পর্যন্ত দিইনি। বুঝলাম নির্ঘাত রুন্‌কির কাজ। পাছে আমি পয়সার কষ্ট পাই তাই অন্ততঃ একটা টাকাও কোনোভাবে আমার পকেটে ফেলে দিয়েছে! অনেকক্ষণ সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। মায়া করে দিয়েছে, নেবো না? তারপর ভাবলাম নাঃ একটা টাকাই বা নেবো কেন, অতই যখন না নিয়ে চলে এলাম। সেই সোনার টাকাটা একদিন একটি বুদ্ধমন্দিরে প্রণাম করে প্রণামী দিয়ে দিয়েছিলাম। আমি গরিব ছিলাম গরিবই থাকি, একদিন বড়লোক হয়ে লাভ কি?…"

(৯)

"সোনার টাকাটা বুদ্ধমন্দিরে প্রণামী দিয়ে দিয়েছিলাম, এইটুকুই কিন্তু একথার শেষ নয়। ওই প্রণামী দেওয়ার ফেরে পড়ে অনেক ঝড় সইতে হয়েছিল।

অথচ আমি বেশ হালকা-মনে এখান ওখান ঘুরছি, কুলি খাটছি, কখনো কখনো বড়লোকদের পালকি-ডাণ্ডী বইছি, তাই থেকেই চলে যাচ্ছে। জীবনের যে কোনো লক্ষ্য আছে তা যেন ভুলেই গেছি। শুধু কোনো কোনো দিন রাতে শুয়ে ঘুম না এলে জীবনের যত দিন পার হয়ে এসেছি তা মনে পড়ে, ছাড়া ছাড়া ভাবে। তখনও আমি এই খাতা ধরিনি।

মনে করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে সেই ডাক্তারবাবুর কথা, কিছুদিন যাঁর কাছে ব্যাগ বওয়ার চাকরি করেছিলাম। মনে পড়ে যায় তাঁর মায়া-মমতা, দয়ালু ব্যবহার। আর মনে হয় তাঁর কাছে থাকলে এতদিনে হয়তো আমি

কুমকুম

কম্পাউণ্ডারী শিখে যেতাম, আর হয়তো বাংলা দেশে চলে যাবার সুযোগ যোগাড় করে ফেলতে পারতাম। তা না করে আমি কিনা পালিয়ে এলাম, মোষের চাকর হলাম। তারপর এখন মোট বওয়া মুটে হয়ে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে পারিনি সে কথা, ভাবতে গেলেই শিবপূজনের কথা মনে পড়ে যায়। চোখে ভেসে ওঠে তার সেই ঢিলখাওয়া রক্তাক্ত দেহ, বুকটা কেমন করে ওঠে, ছেড়ে দিই সে ভাবনা। আবার অন্য ভাবনা এসে ঠেলাঠেলি করে। রাস্তায় যেমন এক একসময় মানুষের ভিড় হয়, হাটে বাজারে যেমন ঠেলাঠেলি হয় মানুষে মানুষে, আমার মনটার মধ্যেও যেন তেমনি ভিড় হয়; তেমনি ঠেলাঠেলি হয়। বুকটা কেমন করে। রাতে ঘুম না হলেই এইসব উৎপাত বাড়ে, তখন ঠিক করলাম দিনের বেলা আরো বেশী করে খাটবো, তা হলে রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বো।

তাছাড়া আরো একটা কাজ শুরু করলাম, আমি শুধু মুখের কথাতেই নয় এদের বই পড়াও শিখতে লাগলাম আস্তে আস্তে। সেই যে মন্দিরে সোনার টাকা প্রণামী দিয়েছিলাম সেই মন্দিরের একজন চাকরগোছের লোক, সে আমাকে ওদের ভাষার একখানা প্রথম ভাগ কিনে আমায় ডেকে পড়াতে শুরু করলো।

বললো, 'দেখতে পাই এই মন্দিরে যত যাত্রী আসে তুমি তাদের মাল বয়ে দাও, তাদের বাচ্চাকাচ্চাকে বয়ে দাও, আর তার বদলে বাজার থেকে সামান্য দুখানা রুটি কিনে খেয়ে নাও। তোমার কি কেউ নেই?'

'কেউ নেই।'

'কেউ নেই।' একথা বলতে প্রাণ ফেটে গেল, তবু তাই বললাম। কারণ ততদিনে বুঝে ফেলেছিলাম 'আমি বাঙালী' এ কথা বললে অনেক শাস্তি সইতে হয়। বললাম, 'আমি জানি না আমার কেউ আছে কিনা, জ্ঞান হয়ে পর্যন্তই তো দেখছি একা একা ঘুরছি।'

ও তখন বললো, 'তা দেখ এ কী একটা জীবন? জীবনে উন্নতি করতে হলে—কিছু বই টই পড়তে হয়, তারপর বৌদ্ধ হয়ে গিয়ে ভগবান তথাগতের ধ্যান করে জীবন কাটাও।'

সেই থেকে রোজ সন্ধ্যাবেলা ওর কাছে এসে বসি। মন্দিরের চাতালের

কুমকুম

সিঁড়িতে চলে এই পাঠশালা। ও উঁচু সিঁড়িতে, আমি নীচু সিঁড়িতে। কিন্তু পড়া যে খুব এগোতো তা নয়। ও কেবল জানতে চাইতো এর আগে আমি কোথায় ছিলাম, তার আগে আমি কোথায় ছিলাম। আমি ভাবতাম ও আমায় ভালবেসে ফেলেছে। তাই এত গল্প করে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ও নিজমূর্তি বার করলো।

বলে বসলো, 'খুব তো বলে যাচ্ছিস, কিন্তু আসল কথাটা তো দিব্যি চেপে যাচ্ছিস! বলি সোনার টাকা আমদানী হলো কোথা থেকে?'

সোনার টাকা!

আমি আকাশ থেকে পড়ি। কারণ সত্যিই বলছি আমার সেই থাপার মেয়ের দেওয়া টাকার ইতিহাসটা মনে ছিল না। কিন্তু ও আরো জোরে আমার হাত চেপে ধরে বললো, 'খুব অবাক্ হচ্ছিস যে? সেদিন মন্দিরে প্রণামী দিসনি। নিশ্চয় এক থলে মোহর রোজগার করেছিস, তা নইলে আস্ত একটা টাকা ভগবানকে দিতে ইচ্ছে হয়?'

হাতটায় আরো চাপ দেয়।

হাতটায় আরো চাপ দেয়।

আর সে কী থাবা!

সেই থাবার মধ্যে চেপে যাওয়া হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে আমার চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। বুঝলাম সেই দিন থেকেই তা হলে ও ইচ্ছে করে আমার সঙ্গ নিয়েছে।

কুমকুম

পড়ানো-টড়ানো ছল।

টাকার সন্দেহ। সোনার টাকা!

হায়! পৃথিবীতে যদি এই সোনা জিনিসটা না থাকতো? মানুষ তা হলে কত ভালো, কত সুন্দর আর কত সৎ হতো? সোনাই মানুষকে যত পাপের পথে ঠেলে। সোনার লোভে মানুষ করতে পারে না এমন কাজ নেই।

সোনাকে 'লক্ষ্মী' বলা হয়। কিন্তু সোনার নাম হওয়া উচিত ছিল 'পাপের গোড়া'। অবশ্য এই সোনা থেকেই আবার জগতের যত ভালো কাজ হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী দেখছি লোভ, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা। সোনার লোভে মানুষই জন্তু-জানোয়ার।

ওই লোকটাকেও 'লোভ'ই এতদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার যে থলিভরতি সোনার টাকা আছে তাতে ওর সন্দেহ নেই। সেইগুলো ভুলিয়ে নেবার জন্যেই—

আমি বললাম, 'হাত ছাড়ো। আমার কাছে এক পয়সাও নেই এখন। কোনো দিনই আমি এক থলে টাকা রোজগার করিনি।'

ও বললো, 'চালাকি? রোজগার করিসনি তো চুরি করেছিস?'

'কক্ষণো বলবে না ও কথা। চুরি করলে অনেক কিছু চুরি করতে পারতাম, কিন্তু আমি জানি—চুরি করা পাপ।'

'ওঃ ভারী একেবারে ধর্মগুরু এলেন রে!' ও আমার হাত মুচড়ে দিতে দিতে বললো, 'বল, বল কোথায় পেয়েছিলি তবে সেই টাকা?'

'একজন দিয়েছিল।'

'দিয়েছিল? বলি তোকে হঠাৎ সোনার টাকা দেবার ইচ্ছেটা হলো কেন তার?'

'তা জানি না।'

'জানো না কে সে? মেয়ে না ছেলে?'

এই সময় হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে একটা মিথ্যে কথা বেরিয়ে গেল। কেন জানি না রুন্‌কির কথা বলতে ইচ্ছে হলো না। তাই বললাম, 'ছেলে।'

ও বললো, 'হুঁ ! তা যেন দিয়েছে। কিন্তু কেন দিয়েছে বাপু ?'

'এমনি ! দয়া করে।'

'ওঃ, দয়া করে ! তা সেই ভগবান বুদ্ধের মত দয়ালু লোকটির ঠিকানাটা আমায় একবার দাও দিকি, দেখিগে তার দয়ার বহর।'

এতক্ষণে ও আমার হাত মোচড়ানোটা বন্ধ করেছে। আমি হাতে ফুঁ দিতে দিতে বলি, 'তাকে এখন আমি কোথায় পাবো ? রাস্তার লোক, রাস্তার লোককে দিয়েছে—'

'বটে, চালাকি ? রাস্তার লোককে সোনার টাকা বিলোচ্ছে ! নিশ্চয় চোরাই মাল। দেখি আর কোথায় লুকানো আছে।' বলে সে আমার গায়ের কম্বল টেনে, জামার পকেট উলটে হাতড়ে দেখলো, তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভারী বদমাশ আছো তুমি, আচ্ছা !'

মারলো একটা ধাক্কা, সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে যাই আর কি !

সেদিন তো একটা ধাক্কা মেরে ছেড়ে দিল, কিন্তু একেবারে ছাড়লো না। ওর দারুণ সন্দেহ আমি একটি পাক্কা চোর, আর মোটা রকম কিছু চুরি করে, ভগবান বুদ্ধকে ধন্যবাদ জানাতে ওই মোহরটা দিয়েছিলাম সেদিন। কাজেই লেগেই রইলো আমার পিছনে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় আমি একটা বাজারের ধারে দাঁড়িয়ে একটা ঠোঙায় করে ভুট্টার দানা খাচ্ছি, ও এসে আমায় ধরলো। বললো, 'এই আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে পারবি ?'

আমি ওর হাত ছাড়াতে পারলে বাঁচি, তাই বললাম, 'না, পারবো না।'

'দেখ তোর ভালোর জন্যেই বলছি—'

আবার সেই ভালোর জন্যে ?

গম্ভীর ভাবে বললাম, 'ভালোর আমার দরকার নেই।'

'দেখ মিছে রাগ করছিস কেন ? বলছি—যদি আমার কথা শুনিস, তুই যা চাস পাবি।'

কুমকুম

আমি রেগে উঠে বললাম, 'আমি কি চাই, তা তুমি জানো ?'

ও খুব মিষ্টি করে হেসে বললো, 'জানবো না কেন ?'

'কি শুনি ?'

'কেন, ভগবান তথাগতের করুণা !'

'সে জিনিসটা তুমি পাইয়ে দিতে পারবে ?'

'পারবো।'

'আচ্ছা, তুমি নিজেই আগে পেয়ে নাও, তারপর অন্যকে ভাগ দিও।'

ও খুব বিনয় করে বললো, 'দেখো তুমি আমার ওপর খাপ্পা হচ্ছো কেন ? সেদিন মিছে সন্দেহে তোমার উপর অত্যাচার করে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে, তাই তো চাইছি তোমার কিছু ভালো করতে, আর নিজের পাপ ধুয়ে ফেলতে।'

'তা সেটা কি করে হবে শুনি ?'

ও খুব ফিসফিস করে বললো, 'একবার তিব্বতের পথে 'লাচাং' মঠের স্বর্ণবুদ্ধের নখ স্পর্শ করতে পারলেই সব পাপ ধুয়ে যায়, আর তাঁর করুণা লাভ করা যায়।...একা অতদূর যেতে ঠিক মন নিচ্ছে না, একটি সঙ্গী চাই, তাই তোমায় সঙ্গী হতে বলছি—' ও মুখটা খুব করুণ করে বললো, 'দেখ বুদ্ধির ভুলে একবার তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি, কিন্তু আমি লোক খুব খারাপ তা নয়। আমার খুব অনুতাপ হয়েছে, তাই তোমায় এত সাধছি। দেখো আমার সঙ্গী হয়ে যদি চলো, তা হলে যাওয়া-আসার যা কিছু খরচ আর তোমার খাওয়া-দাওয়ার সব ভার আমি নেবো।'

ওর আগ্রহ দেখে আমার আর কোনো সন্দেহ রইলো না, ভাবলাম হবেও বা অনুতাপ। তাছাড়া 'তিব্বতের পথে' শুনে মনটা নেচে উঠলো। বলতে গেলে সেই লোভে পড়েই আমি রাজী হয়ে গেলাম।

ওই লোকটা যেন ভগবান বুদ্ধের কাছে কতই না কৃতজ্ঞ হয়ে বার বার মাথাটা নোয়াতে লাগলো। তারপর বললো পরদিন সকালেই রওনা দিতে হবে আমাদের। কম্বল টম্বল যা যা দরকার সবই সে দেবে আমাকে।

কুমকুম

ভাবলাম হয়তো সত্যিই ভগবানের দয়া এলো এবার।

বলেছিল 'যাওয়া-আসার খরচ', কিন্তু ওতে আর খরচ কি, হাঁটাপথেই তো যাওয়া, শুধু খাওয়া-দাওয়া।

তা সেও অবিশ্যি কম নয়।

প্রকাণ্ড একটা বোঝা একটা কুলির মাথায় চাপিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমায় নিয়ে রওনা দিল সে।

কিন্তু আশ্চর্য, যে পথ ধরে অনেক লোক যাচ্ছে সে পথ ধরলো না 'মিংচু' (ওই নাম লোকটার) চললো ভয়ংকর একটা দুর্গম পাহাড়ী পথ ধরে। বলতে গেলে 'পথ'ই নয়—হয় ঘন জঙ্গল নয় তো এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের গা।

আমি যতই বলি 'ভালো রাস্তা ছেড়ে এদিক দিয়ে এলে কেন?' ও ততই বলে, 'চলই না, এই পথেই সিদ্ধি।'

পাঁচদিন পাঁচরাত পার হয়ে আরো ভয়ংকর পথে এসে পড়লাম আমরা, আর তখন নিজমূর্তি বার করলো মিংচু। আমি যেই বলেছি, 'এ পথে আসা তোমার ঠিক হয়নি'—সেই বিকটভাবে মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'আঃ আচ্ছা এক লোক জুটিয়েছি। খালি ফ্যাচ ফ্যাচ! বলি ঠিক পথে গিয়ে তিব্বত সরকারের অফিস থেকে পাসপোর্ট যোগাড় করে সোজা লাচাং মঠে যাবার ক্ষমতা তোর আছে? তিব্বত সরকার সহজে কাউকে ঢুকতে দেয় না ওদের দেশে? ঠিক পথে গেলে এ জীবনে আর স্বর্ণবুদ্ধ দেখতে হবে না।'

'ওঃ বুঝেছি। তার মানে তুমি লুকিয়ে চোরাপথে যাচ্ছো।'

'বুঝেছিস? ওরে আমার সোনার চাঁদ, এত বুদ্ধি তোর?' মিংচু হঠাৎ কোমরে হাত দিয়ে একটা পাক খেয়ে নিয়ে বলে, 'এত বুদ্ধি বলেই তো তোকে নিয়ে এসেছি। এখন বুঝলি তো? আর নিশ্চয় ফ্যাচ ফ্যাচ করবি না?'

আমি বললাম, 'কিন্তু আইন টাইন তো মেনে চলাই ভালো—'

মিংচু আবার আরো খিঁচিয়ে বলে উঠলো, 'দেখ, ধর্মকথা যদি কইবি তো,

এক ধাক্কায় ওই নীচের খাদে ফেলে দেবো। যা বলবো চুপ করে শুনবি, আর আমার নির্দেশমত চলবি, ব্যস! আর ট্যাঁ-ফোঁ নয়।'

বুঝলাম লোকটা মাঝে একটু ভালোর ভান করে আমায় ফাঁদে ফেলেছে, আসলে আইন ফাঁকি দিয়ে বেআইনী পৌঁছে যেতে চায় তিব্বতে কোনো মন্দ মতলবে। ভগবান বুদ্ধকে দেখবার জন্যে, বা তাঁর নখ স্পর্শ করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার যে করবে, সে কখনোই এত পাজীর মত কথা বলবে না। তীর্থের জন্যে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে থাকে বটে মানুষ, কিন্তু তারা কি লুকিয়ে যায়? সরকারের ছাড়পত্রের আপিসকে ফাঁকি দিতে?

কিন্তু বুঝতে পারলেও আমার তখন ওর কবল থেকে উদ্ধার পাবার আর কোনো উপায় ছিল না মাত্তর মরে যাওয়া ছাড়া।

কারণ রাগ দেখিয়ে ফিরে যেতে চাইলেই তো ও আমাকে খাদে ফেলে দেবে। চিরদিনের মতন বরফের কবরের মধ্যে শুয়ে পড়ে থাকতে হবে।

আর যদি লুকিয়ে পালাতে চেষ্টা করি, রাস্তা খুঁজে পাবো না। পথ দেখানেওলা তো ওই কুলিটা যার ঘাড়ে আমাদের খাবারের রসদ। ওর কাছ থেকে খসে পড়লে তো না খেয়েই মরতে হবে। তা'ছাড়া সাপ-খোপ, আরো কত হিংস্র প্রাণী আছে পাহাড়ে। কুলিটা আগুন জ্বেলে সারারাত জেগে পাহারা দেয়। আর আগুনের মালসা তো সব সময় গলায় ঝোলানোই আছে। কাঠকয়লা দিয়ে দিয়ে সে আগুনকে চিরজ্বলন্ত রাখা হচ্ছে।

লুকিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে শুধু শীতেই মৃত্যু নিশ্চয়। সে যে কী ভয়ানক শীত, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না মা। মাথা থেকে সারা গা এমন করে কম্বলে ঢাকা যেন আমরা এক একটি কালো ভাল্লুক। কিন্তু নাকটা আর চোখ দুটো তো খুলে রাখতে হবে? সেইটুকুই যেন ছুরি খেতে খেতে অসাড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ প্রথমটা মনে হচ্ছিল কে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে খোঁচা মারছে, ক্রমে ক্রমে সেই সাড়টা চলে গিয়ে অসাড় হয়ে গেল সব।

কিন্তু আগুন আর খাবার, এই দুটো জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলে প্রাণটাও যে অসাড় হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি!

অতএব পালানো যাবে না, ঝগড়া করাও যাবে না, ওই পাজী মিংচুটার বশেই চলতে হবে। আর সেটা ও বুঝেছিল বলেই এতটা দূরে নিয়ে এসে তবে নিজ মূর্তি বার করেছে। কিন্তু আমাকে ও নিয়েই বা এলো কেন তবে?

নিয়ে এলো কেন এই ভাবনা ভেবে ভেবে কূল পাইনি তখন। পরে অবশ্য পেয়েছিলাম মানে।

পরদিন সকালে কি জানি কি ভেবে মিংচু একটু সদয় হয়ে বললো, 'দেখছিস তো কী কষ্ট? বারে বারে ফ্যাচ ফ্যাচ করে মেজাজ খারাপ করে দিস কেন? আইন বেআইন আবার কি? ভগবানের রাজ্য এই পৃথিবীটার মানুষ ইচ্ছে মতন চলবে ফিরবে, তাতে কার কি বলবার আছে? এই পাহাড়, এই জঙ্গল, এই খাদ, এই হাজার হাজার মাইল নদী—এসব কি ওই নেপাল সরকার আর তিব্বত সরকারের বাপ-ঠাকুরদার কেনা? পৃথিবীর জমি, যেখানে হয়তো কখনো ভালো মানুষের পা পড়েনি, সেখানটাও ওদের দখলে গেল কেন বলতে পারিস?'

মিংচুর এই সব কথা শুনে আমার মনটা একটু বদলে গেল।

তাকিয়ে দেখলাম যতদূর চোখ যায়।

আর হঠাৎ যেন নতুন করে দেখলাম। পথ চলার ভয়ংকর কষ্টে চারিদিকে কোনো দিন তাকিয়ে দেখিনি, এখন দেখলাম কী আশ্চর্য দৃশ্য! যতদূর চোখ চলে, শুধু পাহাড়ের সারি আর তার চুড়োয় চুড়োয় যেন বরফের মুকুট। কোনো কোনোখানে আবার সে বরফ গলে গড়িয়ে এসে খাঁজে খাঁজে স্তূপাকৃতি হয়ে জমে আছে। সকাল বেড়ে উঠছে। আর সেই বরফের ওপর রোদ লেগে নীল সবুজ বেগুনে গোলাপী কত রকম রঙেরই আভা ফোটাচ্ছে তা বলে বোঝাবার নয়। মা সেই ভয়ংকর চমৎকার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, এই পথ দিয়েই নিশ্চয় যুধিষ্ঠিরেরা মহাপ্রস্থান করেছিলেন।

আচ্ছা এমন যদি হয়—হ্যাঁ মা, তখনও বোকার মত ভেবেছিলাম আমি—এমন

কুমকুম

যদি হয় আমরা ভুল করে তিব্বতের পথে না গিয়ে, স্বর্গের পথে চলে যাই! উঃ কী ভীষণ মজাই হয় তা হলে!

কিন্তু মা-গো শেষ অবধি দেখলাম কলিকালে ও সব হয় না। আর আরও একটা জিনিস বুঝলাম, পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে যতই চমৎকার হোক, সে পথ পার হওয়ার মতন যন্ত্রণা আর নেই। চলতে চলতে পা দুটো এমন ফুলে গেল যে মোজা জুতো ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। নাকের আগাটা বুঝি খসেই গেল হিমে হিমে, আর মানুষের মতন দু পায়ে ভর দিয়ে হাঁটাটাই ভুলে গেলাম যেন। চার হাত পায়ে হাঁটাটাই রপ্ত হয়ে গেল ভাল্লুকের মতন।

এদিকে সঙ্গের জিনিস কমে যাওয়ায়, একেবারে ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে খাওয়ার দশা গয়া পাচ্ছে দিন দিন, কাঠকয়লা কমে যাওয়ায়, আগুনও কম কম। কতগুলো রাত-দিন কেটে গেল তার আর হিসেব রইলো না।

ক্রমেই রাস্তা খারাপ হচ্ছে; গভীর গভীর চড়াই উতরাই। গাছের ডালপালা শেকড় মুঠোয় চেপে বুক ঘষটাতে ঘষটাতে নীচে নামা, আর ওপরে ওঠা।

নীচে গভীর খাদ, পাশে ভয়ংকর পাহাড়ী ঝরনা, একবার পা ফসকালেই ব্যস—দফা শেষ।

এখন আর কেউ কোনো কথা বলছি না; শুধু যেন মরীয়া হয়ে উঠছি আর নামছি। কেন উঠছি কেন নামছি জানি না। যেন কোন শয়তানের চাকরি করছি।

এখন আর মিংচুরও সে অহংকার নেই। এক একবার হাঁপাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ঝিম হয়ে কোনো একখানে বসে ঘুমিয়ে পড়ছে। আমিও প্রায় সেই।

শুধু কুলিটাই অটুট। সে হাঁপায় না, 'বাপরে মারে' বলে না, ঝিমোয় না। আর আশ্চয্যি একদিনের জন্যে জিগ্যেস করে না, 'তোমরা যাচ্ছো কেন? কি কাজ তোমাদের সেখানে?'

একদিন রাত্রে যখন কষ্টের জ্বালায় মনে করছি আজই জীবনের শেষ দিন, তার পরে সকালে কুলিটা বললো, 'এইবার আমাদের অনেক খারাপ রাস্তা পড়বে।'

কুমকুম

(১০)

" 'এর পরে আরো অনেক খারাপ রাস্তা পড়বে।'

তার মানে এতদিন আসল খারাপ রাস্তাটা পার হইনি আমরা! অথচ প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম এইবার বুঝি দুঃখের শেষ হলো। এই বার বুঝি ভালো পথে পড়বো।

আমি কুলিটার কথা শুনে মিংচুর মুখের দিকে তাকালাম। নিশ্চয় আমার সেই চোখে যন্ত্রণা আর রাগের জ্বালা ছিল, কারণ দেখলাম লোকটা আমার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকালো অর্থাৎ লজ্জা পেল।

হয়তো বা ওরও তখন আমারই মতন মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। কিংবা তাও নয়, লোভীদের মরে যেতে ইচ্ছে করে না। ও শুধু আমার সঙ্গে ঝগড়া বা আমাকে গালমন্দ করবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না।

যে কারণেই হোক, ও চুপ করেই থাকলো, আমিও আর কিছু বললাম না। আর হঠাৎ একটা কথা ভেবে মনে জোর পেলাম, যাক দেখাই যাক না। শেষ কথা তো মৃত্যু? মরার বেশী তো আর কিছু নেই, তা সে তো একবার ভিন্ন দু বার হবে না! তবে আর ভেবে কি হবে? বুঝবো এটাই আমার কপালে ছিল।

দেখেছি অনেক সময় এই কথাটা ভেবে অনেক কষ্ট সহ্য করা যায়। শুধু মনের জোর করে ভাবা, 'একবার ভিন্ন তো দু বার মরবো না। হয়তো এই রকম মরাই আমার কপালে আছে।'

তবে কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা 'হু-হু' করে ওঠে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হলো না বলে।

সে যাক—

কুলি অতঃপর আমাদের সেই খারাপ পথের উপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললো। তবে ঠিক কথা বলতে হলে, বলতে হয়, হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে চললো।

আমি ওকে একবার আমার সামান্য বিদ্যেতেই জিগ্যেস করেছিলাম, 'এ পথ তুমি চিনলে কি করে?'

ও যা উত্তর দিল তার মানে হচ্ছে, তারা নিজেরা সর্ট কাট করতে এই সব পথ দিয়েই যাতায়াত করে। আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ পথ দিয়ে যে কখনো কেউ গিয়েছে, বা যেতে পারে সে কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ওই অফুরন্ত বরফের ওপর দিয়ে ঠিক রাস্তা খুঁজে নিয়ে সর্বদা যমের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এগিয়ে যাওয়া, এ কি সম্ভব? ভাবলেই তো মন মাথা গা সব শিউরে ওঠে।

কুলিটার কথা ফললো এইবার।

এইবার আমরা যে পাহাড়ের দেয়ালের সামনে এসে পড়লাম, সে দেয়াল একেবারে খাড়া। মনে হলো কেউ যেন স্বর্গে যাবার জন্যে এগুলো বানিয়ে রেখেছে। এতদিন বরফের পাহাড় দেখলেও নদীটা ঠিকই দেখেছি—বয়ে যাচ্ছে জল নিয়ে।

কিন্তু এখন চোখে পড়লো জমাট হয়ে যাওয়া নদী। বরফে জমাট। গাছ নেই, পালা নেই, একটা বনের প্রাণী পর্যন্ত নেই। শুধু মরুভূমির মতন। বালির বদলে বরফ।

আমাদের সঙ্গের খাবার প্রায় শেষ। আগুনের কাঠ-কয়লাও জবাব দিচ্ছে। তবু আমরা মরছি না। একটা জিনিস শিখলাম, কষ্টে পড়লে কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতাটা বাড়ে। বাড়িতে সুখে আরামে থাকার সময় যে কষ্টের কথা ভাবাই যায় না, তার হাজার গুণ কষ্ট সয়েও বেঁচে থাকা যায়। আগে একটু ঠাণ্ডা লাগলেই অসুখ করতো, আর এখন? বরফের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে চলেছি, অথচ চলছিও তো। বেঁচেও আছি।

এরপর যা চললো, তার কথা আর লেখবার ক্ষমতা নেই আমার। সে যে কী ভয়ংকর পথ, আর কী ভয়ংকর কষ্ট! খাবার ফুরিয়ে গেল, জল ফুরিয়ে গেল। ধুঁকতে ধুঁকতে বুকে ঘষটাতে ঘষটাতে, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে আর মাঝে মাঝে চেতনা পেয়ে ক'দিন যে গেল তাও জানি না। শুধু এইটুকু জ্ঞান ছিল যতক্ষণ না মরে পথে পড়ে থাকছি ততক্ষণ এগোতেই হবে।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই পথই যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথ। এই ভাবেই

কুমকুম

চলতে চলতে আর কষ্ট সইতে না পেরে একে একে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব দ্রৌপদী সবাই মরে গিয়েছিলেন। আমরাও মরবো।

ভেবেছিলাম তাই।

আমার মনে হতো হয়তো আমরা স্বর্গেই চলে এসেছি, এই হয়তো স্বর্গ। শুধু দেবতাদের দেখতে পাচ্ছি না পাপী টাপী বলে।

কিন্তু আবার যখন দেখতাম কুলিটা তার জিনিস ফুরিয়ে যাওয়া খালি থলিটা কাঁধে ফেলে হামা দিয়ে দিয়ে চলেছে, মিংচু মাঝে মাঝে বসে পড়ে দু হাতে পেটটা চেপে ধরে হাঁ করে করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তখন সেই স্বর্গের ভুল ভাঙতো।

যাক সে কষ্টের কথা লিখে ফুরোবার নয়, বলে বোঝাবার নয়। শুধু এই এক ভগবানের লীলা যে তবুও আমরা বেঁচে রইলাম। আর অবশেষে একদিন সেই ভয়ংকর পথ পার হয়ে ভালো জায়গায় পড়লাম। মানে পাহাড় আর তত খাড়াই নয়। জায়গায় জায়গায় যেন মানুষের হাঁটাপথের দাগ।

সেই দেখে আমাদের সেই উপোস করা শরীরেও যেন জোর ফিরে এলো। তার পরদিন দেখলাম একটা আশ্চর্য দৃশ্য।

হ্যাঁ সেদিন সেটা খুব একটা আশ্চর্যই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল জীবনে কখনো এ জিনিস দেখিনি। জিনিসটা কী জানো মা? একজন মানুষ!

জলজ্যান্ত একটা মানুষ!

হেঁটে হেঁটে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তার মানে আমরা এখনো সেই পৃথিবীতে আছি, যে পৃথিবীতে মানুষ থাকে, হেঁটে চলে বেড়ায়।

আমরা বসে পড়লাম।

কুলিটা ইশারা করে বললো, দুই হাত তুলে আমরা যেন শরণাগতর ভাব করি। হাত তুলতে পারছিলাম না। তবু করলাম তাই।

দেখলাম একজন লামা। তিনি আমাদের উদ্দেশ করে কিছু বললেন না, শুধু

স্থির চোখে তাকালেন। কিন্তু মনে হলো যেন তাঁর চোখের জ্যোতি আমাদের বুক ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গেল।

মিংচু কুলিটাকে বললো, 'তুই বুঝিয়ে বল আমরা পথ ভুলে বিপদের জায়গায় পড়ে মরতে মরতে এসেছি।'

কিন্তু কুলিটা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো।

তার মানে মিথ্যে কথা বলবে না সে।

আমারও মনে হলো এই লামার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলার মতন পাপ আর নেই। রাস্তা ভুল করে তো বিপদে পড়িনি আমরা। ইচ্ছে করেই তো চোরাপথে এসেছি।

কিন্তু মিংচু ততক্ষণে নিজেই হাত-মুখ নেড়ে কথা টথা বলে বুঝিয়ে দিল পথ ভুল করে কী দুর্দশায় পড়েছি আমরা। না খেয়ে মরতে বসেছি।

লামা মানে সন্নিসী, আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই খুব দয়ালু। এখুনি ব্যস্ত হয়ে আমাদের খেতে দেবেন, বাড়ি নিয়ে যাবেন। ওমা কোথায় কি! একটু মাত্তর বিচলিত না হয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জেরা করতে লাগলেন, কোন্ রাস্তা থেকে রাস্তা হারিয়েছি, কি করতে, কোথায় যাচ্ছিলাম, আমি কে মিংচুই বা কে, মানে আমাদের পরিচয় কি।

ওদের ভাষা একটু একটু শিখেছি, সব বুঝতে পারি না। তবু মনে হলো, মিংচু যা তা বানিয়ে বানিয়ে বলতে লেগেছে, আর বার বার কাতর প্রার্থনা করছে একটু জল, একটু খাবার। কিন্তু হায় হায়, সন্নিসী ঠাকুরের দয়ার বালাই মাত্তর নেই।

বরং দেখলাম মিংচুর কথায় তাঁর মুখে অবিশ্বাসের ব্যঙ্গহাসি ফুটে উঠছে। তিনি আঙুল তুলে তুলে আরও কি বলে টলে বললেন, 'কই দেখি তোমাদের পাসপোর্ট!'

পাসপোর্ট!

শুনে সত্যি কথা বলবো, আমার খুব মজা লাগলো। বেশ হয়েছে, ফাঁকি দেওয়ার ফল ফলেছে, আমাকে ভুলিয়ে টেনে এনে এই কষ্ট দেওয়ার শাস্তি বুঝুক এবার। দেখাক পাসপোর্ট!

তা বেহায়া মিংচুটা বলে উঠলো, 'আমাদের সঙ্গের অনেক জিনিসপত্তর পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে পাসপোর্টও গেছে।'

ওঃ তাই বুঝি!

লামা কঠিন মুখে বললেন, 'তা হলে তোমরাও হারিয়ে যেতে পারো।'

বলে উলটো মুখো হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

তখন কিন্তু আমার ভারী রাগ হলো, যতই হোক, সাধু-সন্নিসী মানুষ তুই, একটু দয়া-মায়া নেই? দেখছিস মানুষগুলো মরছে, একটু খেতে দিয়ে জেরা কর। তা নয়, চলেই গেল গটগটিয়ে নিষ্ঠুরের মত!

হায় তখন তো বুঝিনি কত নিষ্ঠুর হতে পারে এই লামা-টামারা!

তবে খেতে আমরা পেয়েছিলাম। তিনি চলে যাবার পর যখন আমরা সেখানে শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছি, তখন আর একজন কমবয়সী লামা এসে আমাদের সামনে একটা জলভরা বড় তামার পাত্র নামিয়ে দিলেন, আর দিলেন কয়েকটা মোটা মোটা চাপাটি!

দেখলাম একজন লামা।···স্থির চোখে তাকালেন।

[পৃষ্ঠা—১০৩

আহা হা! পৃথিবীতে এখনো এমন চমৎকার জিনিস আছে! এখনো খাবার জল পাওয়া যায়!

কী ভাবে যে সেই জল আর রুটি আমরা খেয়েছিলাম, তা সেই ভগবান বুদ্ধই

জানেন। তবু বলবো কুলিটার সহ্যশক্তি! মিংচু আর আমি তো জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর রুটি নিয়ে খেতে লাগলাম বাঁদর-হনুমানদের মত দু হাতে ধরে, ও কিন্তু ধৈর্য ধরে বসে রইল যতক্ষণ না আমাদের দু জনের খাওয়া হলো।

আমরা ভাবি সামান্য একটা কুলি। কিন্তু এ রকম একটা কুলিকেও মহৎ মানুষদের দলে ফেলা উচিত। এই ভীষণ কষ্টের সাগর পার হয়ে এলো, এক দিনের জন্যে মুখে বিরক্তি নেই, রাগ নেই, আমাদের ওপর দোষ দেওয়া নেই—যেন পাথরের পুতুল।

আমাদের খাওয়া হলে, ওই লামাটি আস্তে আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা এই স্বর্ণবুদ্ধের মঠের সীমানায় এসেছ কেন?'

কথার ধরন শুনে মনে হলো, এটা ঠিক যেন জেরা নয়, যেন আমাদের ওপর মায়া করেই বলছেন।

আমি বলে উঠলাম, 'কেন এসেছি জিগ্যেস কর এই লোকটাকে। এ আমায় মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে এনেছে।'

মিংচু হাঁ হাঁ করে উঠলো, আমায় শাপ-শাপান্ত করলো, বুক চাপড়ালো, মাথা চাপড়ালো আর বারবার করে তথাগতের নামে শপথ করে বলতে লাগলো, পথ ভুলে এসে পড়েছে।

এঁর মুখেও দেখলাম অবিশ্বাসের ছাপ।

তবে বললেন, 'মেজ লামার হুকুমে আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। কিন্তু জানি না তোমাদের কপালে কী আছে।'

তার মানে আগে যিনি এসেছিলেন তিনি মেজ লামা।

আমরা ধুঁকতে ধুঁকতে এগোতে লাগলাম ওঁর পিছু পিছু। কপালে যাই থাক, এখন চাই মাথার ওপর একটু ছাত। গায়ের পাশে একটু দেওয়াল।

তা পেয়েছিলাম সে জিনিস!

ভগবান বঞ্চিত করেননি, তবে আগের কথাটা বলি—

অনেকক্ষণ ঘোরানো ঘোরানো পাহাড়ী পথ পেরিয়ে হঠাৎ দেখি একটা সমতল জায়গা। তার মানে তৈরি করা হয়েছে পাহাড়ের চুড়ো কেটে। কিন্তু সে যে কি হয়েছে, তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না।

এই তো একবেলা আগে ছিলাম চিরতুষারে ভরা যমপুরীর মতন জায়গায়। হঠাৎ দেখি সেখানে সবুজের চাদর পাতা। এ রকম জায়গায় যে এ রকম বিরাট সবুজ উপত্যকা থাকতে পারে, তা ভাবাই যায় না। বোধ হয় মাইলের পর মাইল জুড়ে সেই ক্ষেত। তারপর আর একটা বাঁক ঘুরতেই সমস্ত শরীর যেন বরফ হয়ে গেল।"

(১১)

টুটু দেখলো এরপর থেকে অনেকগুলো পাতায় লেখা ভারী কাটাকুটি যেন কী লিখতে হবে, কেমন করে লিখতে হবে, সেটা ঠিক করতে পারছে না।

হাতের লেখাও বাঁকা-বাঁকা কাঁপা-কাঁপা। টুটু সবটা পড়তে পারলো না। শুধু মাঝে মাঝে যেটুকু পড়তে পারলো তা থেকেই বুঝতে পারলো সেই ভয়ংকর জায়গা থেকে চলে আসবার সময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কিম্ভূত, তারপর একজনের দয়ায়—

হ্যাঁ, সেখানটা পড়তে পারছে—

"আমি জানি না আমি কোথায় পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, কতদিন পড়ে থেকেছিলাম সেখানে, আর কে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, আর কতদিন ধরে সেবাযত্ন করে বাঁচিয়ে তুলেছিল।

জ্ঞান আর অজ্ঞানের মাঝখানে টের পেতান ভালো বিছানায় শুয়ে আছি, আর কে যেন মাথার কাছে বসে আছেন সর্বদা।

কী কোমল তাঁর হাতের ছোঁওয়া, কী মায়া-দয়ায় ভরা চোখ দুটি।...

স্বপ্নের মতন আবছা-আবছা মনে হতো—ইনি কি তবে স্বয়ং বুদ্ধ? আমার দুর্দশা দেখে কোলে তুলে নিয়েছেন? মনে হতো—আচ্ছা, আমি কি মরে গেছি? মরে গিয়ে স্বর্গে এসে পৌঁছেছি? স্বর্গের কোনো দেবতা আমাকে যত্ন করছেন!

দিন আসতো রাত আসতো, ওই ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে কতদিন যেন পড়ে ছিলাম।

কুমকুম

যখন জ্ঞান হলো, দেখলাম মাথার কাছে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। আমাকে তাকাতে দেখে আস্তে বললো, 'উঠতে চেষ্টা করবেন না, আপনার শরীর খুব অসুস্থ।'

আমি আবার চোখ বুজলাম।

পরে, যখন ভালো করে জ্ঞান হলো, যখন ভাত খেলাম, কথা বলতে পারলাম, তখন সেই ছেলেটির মুখেই শুনলাম, আমি নাকি একটা খাদের মধ্যে পড়ে ছিলাম, এখানকার সেবাশ্রমের একদল সাধু মানস-কৈলাস তীর্থ ভ্রমণ সেরে ফিরছিলেন, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে বহু কষ্টে খাদে নেমে তুলে নিয়ে আসেন। তারপর দু-আড়াই মাস নাকি আমি এই সেবাশ্রমেই আছি।

সাধুরা এই ভাবে সেবাধর্ম নিয়েই যত সব ভয়ানক দুর্গম তীর্থে আশ্রম বানিয়ে রেখেছেন, কাজেই তাঁদের কাছে আছে অনেক ওষুধপত্র, আছে অনেক কম্বল-বালিশ। তা ছাড়া আশ্রমের কুটীরে তাঁরা পাহাড়ী ছাগল প্রতিপালন করেন, তার দুধ খাইয়ে খাইয়েই চাঙ্গা করে তোলেন রোগীদের। নিজেরা দুধ দোহান, নিজেরা জ্বাল দেন।

বললাম, 'কিন্তু কোথায় তাঁরা?'

ছেলেটি বললো, 'আছেন ভিতরের ঘরে, পাঠ করছেন। আজ আপনি ভালো আছেন বলে, নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বসেছেন, আমার ওপর ভার দিয়ে। তা ছাড়া আপনার এখন কথা বলা উচিত নয়।'

উচিত না হলেও কথা বললাম। ছেলেটির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল খুব। ক্রমে ক্রমে তাকে আমি আমার জীবনের সব কথা বললাম। ও মলিন-মলিন হেসে বললো, 'তুমি তোমার মা-বাপকে মনে দুঃখ দিয়ে চলে এসেছ বলে দুঃখ পাচ্ছো। আমিও সেই কাজই করেছি। যখন আমার বারো বছর বয়েস, চলে এসেছি সন্ন্যাসী হয়ে।'

আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলি, 'আর, যাওনি?'

'নাঃ।'

'ইচ্ছে করে না?'

ও হাসলো। বললো, 'সাধু-সন্নিসীরা কি অত ইচ্ছের বশে চলে?'

তার মানে, ঠিক উত্তরটা এড়িয়ে গেল। আমি বললাম, 'বলছো যে তোমারও বাংলাদেশে বাড়ি। আমারও তাই, চল না দুজনে চলে যাই।'

ও হেসে ফেললো। বললো, 'পাগল।'

'পাগল কেন? এই বিদেশে বিভুঁয়ে পড়ে আছো—।'

ও বললো, 'পড়ে আছি কেন? বল যে—আছি। ইচ্ছে করে আছি।'

'তোমার ভালো লাগে?'

ও বললো, 'ভালো লাগতেই যে হবে মশাই। তা ছাড়া স্বামীজীদের দেখলে বুঝতে—চলে যাওয়া কত শক্ত! ওঁদের ছেড়ে যাওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারি না। ওঁদের সেবা করে ধন্য হই।'

তারপর স্বামীজীদেরও দেখলাম।

বুঝলাম, ছেলেটির কথাই ঠিক।

আমি কি তবে এখানেই থেকে যাবো?

ওর মতই সাধুদের জন্যে গরম জল করে দেবো, এবং চা বানিয়ে দেবো, রান্না করে দেবো?

একদিন বলেও ফেললাম সে কথা সেই স্বামীজীকে—যিনি আমার মাথার কাছে বসে থাকতেন আমার অসুখের সময়।

—মাথার কাছে বসে থাকতেন আমার অসুখের সময়।

তিনি শুনে হাসলেন।

বললেন, 'না! তোমার মন সে ভাবে তৈরী হয়নি।'

'বেশ তো, আপনারা তৈরি করে নিন।'

উনি আবার হাসলেন।

বললেন, 'ভগবান ভিন্ন সে কাজ কেউ পারে না। হয়তো দেবেন তিনি তৈরি করে। সময় এলেই দেবেন।

তারপর আমার সব কথা শুনলেন। বললেন, 'স্বর্ণবুদ্ধের মন্দিরের কথা আমরাও শুনেছি, কিন্তু এও শুনেছি, সেখানে যাওয়া খুব কঠিন। তবে কেউ যদি শুধু দর্শন করবো বলে পবিত্র মনোভাব নিয়ে যায়, তাদের প্রতি লামারা খুব সদয়। কিন্তু তোমরা গিয়েছিলে চুরির মনোভাব নিয়ে—'

'আমি?' আমি রেগে উঠলাম, 'আমি চুরির মন নিয়ে গিয়েছিলাম?'

'আহা তুমি না হোক, তোমার সঙ্গী। ওকেই বলে কুসঙ্গ। লামারা সর্বজ্ঞ, ওরা বুঝতে পেরেছিলেন তোমার সঙ্গীর পাপ চিন্তার কথা। তাই অমন হিংস্র হয়ে গিয়েছিলেন। কত শত বছর ধরে ওই মন্দির আগলে আসছেন ওঁরা। শিষ্য থেকে শিষ্যে, ওই একই জীবনের ধ্যান জ্ঞান ব্রত। ওখানে কেউ হাত দিতে এলে—বাঘের মত হয়ে উঠবেন বই কি। তোমার ভাগ্য ভালো যে প্রাণে মারা পড়নি। যাক এখন বল কোথায় যেতে চাও?'

বললাম, 'আমি বাংলাদেশে যেতে চাই।'

উনি বললেন, 'তাই তো! তা হলে তোমাকে তিব্বতের সীমানা ধরে হাঁটতে হাঁটতে উত্তরবঙ্গের পথে নামতে হবে।'

তারপর একখানা ম্যাপ নিয়ে এসে বোঝাতে বসলেন কোথা দিয়ে গেলে সুবিধে।

কিন্তু আমার কি ছাই অত মাথায় ঢোকে? আমি শুধু—হুঁ হুঁ করে যাই।

সেই ছেলেটি পরে হেসে হেসে বললো, 'বুঝেছ কচুপোড়া, খালি হুঁ হুঁ। মনে হচ্ছে আবার তুমি রাস্তা হারাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'আবার তোমরা তুলে এনে যত্ন করবে।'

সেও হাসলো।

বললো, 'আমরা কে? যা কিছু করেন ভগবান। ভগবানই মানুষের মধ্যে দিয়ে বাঁচান। যাক তোমায় একটা ম্যাপ দেওয়া হবে, সেইটা নিয়ে দেখে দেখে যাবে।'

* * * *

কুমকুম

হ্যাঁ, সেই ম্যাপ আমার সঙ্গে ছিল, আর ছিল সাধুদের দেওয়া খাবার। সেই ছেলেটিও অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে এসেছিল, কিন্তু তবু আমি বোকা বুদ্ধু রাস্তা হারালাম। কোথায় না কোথায় গিয়ে পড়লাম—কতদিন যেন পাহাড়ী চাষীদের কবলে পড়ে তাদের চাকরগিরি করলাম, সে সব কথা আর লিখতে চাই না মা! সবই তো কষ্ট পাওয়ার কথা। তবু মাঝে মাঝে টের পাই মানুষের মধ্যে দিয়েই ভগবান বাঁচান। নইলে পাহাড়ীদের একটা ছোট্ট বউ কেন চুপি চুপি আমায় লোটা ভরতি দুধ খাওয়াতো? খাওয়াতো সব্বাইকে লুকিয়ে। আর বলতো,—'তুমি ঠিক আমার দাদার মত দেখতে।' বলতো 'তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি খুব বড় অসুখ থেকে উঠেছ। তোমার দুধ খাওয়া দরকার।'

বউটার দুঃখু-দুঃখু মুখ দেখে 'না' করতে পারতাম না।

লুকিয়ে দেওয়া দুধ আমার খেতে ইচ্ছে হতো না। কিন্তু বউটার দুঃখু-দুঃখু মুখ দেখে 'না' করতে পারতাম না।

ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর ভয়ে বেশী কথা বলতে পারতো না, মাঝে মাঝে তারা না থাকলে এসে বসতো। বলতো—'জানো আমার একজন কাকা আছে, খুব বড় কম্বল-ব্যবসায়ী। কম্বল বিক্রি করে করে তার লক্ষ লক্ষ টাকা। সে থাকে গ্যাংটকে, কিন্তু ব্যবসা করতে যে কত কত দেশে যায়! তোমাদের বাংলাদেশেও যায়। তার সঙ্গে যদি দেখা হয় তো বোলো—পার্বতীয়ার খুব কষ্ট।'

আমি তো অবাক।

'কষ্ট কি? তোমাদের কত চাষবাস আর মহিষ, ছাগল—'

ও হাসলো, বললো, 'অন্য কষ্ট আছে।'

তারপর তো ওর শাশুড়ীর গলা পেয়ে চলে গেল।

আমিও একদিন সেখান থেকে পিটটান দিলাম। পার্বতীয়ার সঙ্গে আর চুপি চুপি দেখা হলো না কোনো দিন। জিগ্যেস করা হলো না, 'তোমার কাকার নাম কি, ঠিকানা কি?' যে জায়গাটায় ওরা আছে তার নাম হচ্ছে, 'তাপলেজুং'! বউটি বলেছিল, 'আমার যদি অনেক টাকা থাকতো তোমায় দিতাম, তুমি রেলগাড়ি চড়ে গ্যাংটক চলে যেতে, কিন্তু কোথায় পাবো টাকা? তবে যদি তুমি আমার এই গহনাটা নিয়ে বিক্রি করে—' রুপোর একটা মোটা তাগা দেখালো।

আমি তো শুনে হাঁ।

আমি ওর গহনা নিয়ে বিক্রি করবো? বলে কি বউটা? তাই কখনো নেওয়া যায়?

আমি তো এই হাঁটতে হাঁটতেই জীবন কাটালাম। তবে হ্যাঁ, এখন বুঝছি রেলগাড়ির একটা সুবিধে ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছে দেবে। আর এ এই হেঁটে হেঁটে পাহাড়ে পথে ঘুরে মরে, দশদিনের পথ একশো দিনে!

* * * *

আমি এবার রেলগাড়ি চড়বো।

আমি যে করে হোক কিছু টাকা যোগাড় করবো। তারপর বলবো 'বাংলাদেশের টিকিট দাও তো একটা—'

টাকা! টাকা যোগাড় করা কি শক্ত! লোকে খাটিয়ে নেয়, ন্যায্য পয়সা দেয় না। যা দেয় খেতেই কুলোয় না। সত্যি বলতে আমি তখন মুটের কাজ করেই পেট চালাচ্ছি। আর সময় সুবিধে পেলেই পাহাড় থেকে নেমে আসছি।

কী আশ্চর্য!

কী কাণ্ড!

আমার এ কী ঘটে গেল!

স্বর্গের ভগবান কি আমায় পথ দেখিয়ে দেখিয়ে এনে দিলেন?

কুমকুম

নইলে কী করে আমি— ?

নেমে আসতে আসতে, লোকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কিছু খেতে খেতে অবশেষে একটা শহরে এসে পড়েছি। কিন্তু নাম জানি না। শুধু দেখছি মোটেই আর শীত নেই এখানে। আমার গায়ের এই জামা কম্বল যেন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠছে। কে জানে কোথায় এসে পড়েছি !

অবশেষে রাস্তায় একজন লোককে জিগ্যেস করলাম, 'ভাই, এ দেশটার নাম কি ?'

ও বার দুই আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললো, 'কোথা থেকে আসছো ?'

বললাম, 'কোথাও থেকে আসিনি। এমনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে—'

'সাধু বুঝি ?'

'না না, সাধু টাধু কিছু নয়। এমনি—'

'এমনি বললেই তো হয় না বাপু ! পরিচয় চাই, নইলে থানায় চল।'

বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা। শুধু শুধু লোকটা আমাকে একটা রাস্তার কুকুরের মতো তাড়াতে তাড়াতে থানায় নিয়ে চললো।

থানাতেও সেই একই ব্যাপার।

জেরা আর জেরা।

যেন আমি চোর।

অবশেষে বলে কিনা 'আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি, কিছু টাকা দিয়ে দে।'

বোঝো ! আমার নিজের নেই একটা কানাকড়ি, আমি দেবো টাকা !

বললাম, 'তার চেয়ে বরং আমায় জেলখানায় ভরে দাও ! খাব মাখবো, দিব্বি থাকবো।'

'হুঁ, বড্ড সাধ যে দেখি ! যা ব্যাটা বেরো।'

তাড়িয়ে দিল ধাক্কা দিয়ে।

কুমকুম

অথচ পথের ছোট্ট একটা ছেলে আমায় জল দিল, বললো, 'এখান থেকে পালাও। যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। নইলে পুলিসে ধরবে।'

কিন্তু আমি? আমি কি করবো? আমি কি কেবলই তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো পালিয়ে বেড়াবো? আমি এবার শক্ত হবো। আমি গ্যাংটক যাবো। সেখানে গিয়ে যেখানে যত কম্বল-ব্যবসায়ী আছে তাদের খোঁজ করবো, করে করে জিগ্যেস করবো, 'তোমার ভাইঝির নাম কি পার্বতীয়া?'

তারপর তার কাছ থেকে চেয়ে নেবো কিছু টাকা। বাংলাদেশে পৌঁছে যাবার মত টাকা। তার তো লক্ষ লক্ষ টাকা আছে। আর একথাও বলবো, 'পার্বতীয়া খুব কষ্টে আছে।'

কিন্তু গ্যাংটক কোন্ দিকে?

আবার সেই জিগ্যেস করা?

তা জিগ্যেস করতেই হলো।

এবার আর ভদ্রলোককে নয়। একটা মাঝারি ছেলেকে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা ভাই, বলতে পারো গ্যাংটক কোন্ দিকে?'

ছেলেটা বললো, 'আমি জানি না।'

'এই জায়গাটার নাম জানো?'

'জানি।'

'কি?'

'এর নাম হচ্ছে বিরাটনগর।'

'আচ্ছা বলতে পারো বাংলাদেশে যাওয়া যায় কোন্ পথে?'

ছেলেটার মুখে হঠাৎ একটা ঠাট্টা ঠাট্টা ভাব ফুটে উঠলো। বার দুই আমাকে দেখে নিয়ে মুচকি হেসে বললো, 'কোনো পথেই নয়। যেখানে আছো, সেখানেই থাকো।'

'তার মানে?'

'তার মানে তুমি বাংলাদেশেই দাঁড়িয়ে আছো।'

আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম।... ..."

কুমকুম

(১২)

"কী বলছে ছেলেটা !

আমি বাংলাদেশে পৌঁছে গেছি।

বলি—ও পাগল, না আমি কালা ! না কি সত্যিই।

ওরে বাবারে, তবে কী করবো আমি এখন ? এখানের রাস্তায় গড়াগড়ি দেব ? এখানের ধুলো তুলে মাথায় মাখবো ? ভগবান এত দয়ালু তুমি ? কোনো কষ্ট না দিয়ে বাংলাদেশে এনে দিলে তুমি আমায় ?

কোনো কষ্ট না দিয়ে !"

এখানে খাতাটা মুড়ে হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠলো টুটু। 'কোনো কষ্ট না দিয়েই বটে। কত কষ্ট পেলো তার লেখা-জোখা নেই, তবু বলে কোনো কষ্ট না দিয়ে ! বাংলাদেশ পেয়ে একেবারে বর্তে গেছে।'

হাসি থামিয়ে টুটু ভাবে, আশ্চর্য ! এইতো আমি বাংলাদেশে রয়েছি, কই কিছুই তো মজা বুঝতে পারি না। বরং অন্য অন্য দেশেই যেতে ইচ্ছে করে। মনে মনে তো ভাবি বড় হয়ে আমি ভূস্বর্গ-কাশ্মীরে বাড়ি বানিয়ে থাকবো, না হয়তো বিলেতেই চলে যাবো, যেমন অলক কাকু গিয়ে বসে আছে।···আর এই কিম্ভূত—তা কিম্ভূত বলেই বোধহয় এইসব উলটোপালটা। অবিশ্যি মার কাছে আসতে ইচ্ছে হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশ নামেই এত আনন্দ।

টুটু ভাবতে চেষ্টা করে, টুটুও যদি হারিয়ে গিয়ে অনেক অনেক বছর কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়াতো, টুটুও কি—বাংলাদেশ বলে হাঁপাতো ?

কি জানি, হয়তো হাঁপাতো !

তারপর আবার খাতাটা খুললো।

এখানে যেন কিম্ভূত ঝড়ের বেগে লিখে চলেছে।

"বাংলাদেশ···তবু আমার সেই বর্ধমান জেলার থেকে অনেক অনেক দূর। এর নাম উত্তরবঙ্গ। এর একদিকে পূর্ববঙ্গ আর অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে কত কত যেন জেলা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল জেলাটি হচ্ছে—বর্ধমান।

কুমকুম

কিন্তু আর আমি হাঁটতে পারছি না। মুটেগিরিও করতে পারছি না। আমি কি তবে এবার ভিক্ষেই করবো? আমার শরীরটা যেন আর আগের মত জোরালো নেই। খাদে পড়ে গিয়েই ভিতরে কিছু হয়ে গেছে বোধ হয়।...হাঁটতে কষ্ট হয়। তা'ছাড়া হাঁটলেই তো আবার রাস্তা ভুল করবো? রেলগাড়ি-ই চড়তে হবে।

রেলগাড়ি চড়ে দু'চার দিনের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাবো। ব্যস্! তারপর আর কোনো কষ্ট নেই, আর কোনো ভাবনা নেই।

গিয়ে বলবো, 'মা-গো, সেই তোমার হারিয়ে যাওয়া ছেলেটা আবার এলো।'

মার যত্নে আমার এই দুর্বল শরীরটা ভালো হয়ে যাবে, আমার গায়ে আবার জোর হবে। বাবা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে টনিকের ওষুধ এনে দেবেন, সেই যেমন ছোটবেলায় আমার টাইফয়েড জ্বরের পর দিয়েছিলেন। তারপর আর কি?

মাগো, তুমি যেন তা বলে তোমার দাড়ি-গোঁফ হয়ে যাওয়া ছেলেটাকে দেখে হেসে ফেলো না। আর ভেবো না বুনোদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্রেফ বুনো হয়ে গেছি। তোমার কাছে পৌঁছলেই দেখো আবার আমি যে বাবুরাম সেই বাবুরাম!

আমি আবার কিন্তু লেখাপড়া শিখবো মাস্টারমশাই রেখে। লেখাপড়া না শিখলে কিছুটি হবার জো নেই, এ আমি হাড়েহাড়ে টের পেয়েছি। মুখ্যুর কপালে শুধু মুটেগিরি।

কিন্তু গায়ের জোর ফুরিয়ে গেলে, মুটেগিরিও চলে না।

আচ্ছা দেখি ওই ভদ্দরলোকটির কাছে যদি—

নাঃ, ভিক্ষে চাওয়ার মতন শক্ত কাজ আর নেই।

যতই চেষ্টা করছি, হচ্ছে না।

তবে কি, বাংলাদেশে এসে পৌঁছেও বর্ধমান জেলায় যাওয়া হবে না আমার? না—না, পৌঁছতে আমায় হবেই। মার কাছে বসে এই খাতাটা পড়ে পড়ে শোনাতে হবে না? কতটুকুই বা লিখতে পেরেছি? গল্প করে করে সমস্ত কথা বোঝাতে হবে না?

আর আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধুদের খুঁজে বার করে করে আবার ভাব করতে হবে না ?

যেতেই হবে। আর মা কালীর মন্দিরে গিয়ে চরণামৃত খেয়ে বলতে হবে, মা কালী কত কি অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছি। সে দোষ কাটিয়ে নাও তুমি। শুয়োরের মাংস, বুনো-মুরগীর মাংস—কত কি-ই খায় পাহাড়ীরা। আমাকেও খেতে হয়েছে বইকি। তবু সাপটা খেতে পারিনি।

এবারে দুগ্‌গা পূজোর সময় কাঁসর বাজানোর ভারটা আমিই নেবো। সবাই যদি হেসে বলে, 'এ-মা এতবড় লোকটা কাঁসর বাজাচ্ছে ? কাঁসর তো ছোট ছেলেরা বাজায়।' তখন বলে দেবো 'তা তোমরা হাসো আর যাই করো, আমি বাজাবোই।' যেবার আমি চলে গেলাম, সেবার পূজোর সময় আমার জ্বর হয়েছিল, কাঁসর বাজাতে পাইনি, কী কষ্ট হয়েছিল আমার। পূর্ণিমার দিন হরিরলুঠের বাতাসা কুড়োতেও ছাড়ব না কি ? ছাড়বো না। কতদিন হরিরলুঠ চক্ষে দেখিনি।

কতদিন কত কী-ই দেখিনি।

কবে যেন সেই আমরা চিঁড়ের ফলার খেতাম, কবে যেন সেই মজা করে পান্তা ভাত খেতাম সে সবের নামও মনে নেই। কিন্তু সেই স্বাদটা মনে আছে।

বাংলাদেশ !

তার মানে সমতল মাটি।

বাংলাদেশ ! তার মানে চারিদিকে জল। চারিদিকে সবুজ। সেই বাংলা-দেশকে দেখতে পাচ্ছি।

এখন শুধু টাকা চাই ! কিছু টাকা !

বর্ধমান জেলায় যাবার মত টাকা !

এ কী ! এ কী দেখছি ! ভগবান কি আমায় পরীক্ষা করছো ? নয় তো এ কেন ? ইস্টিশানের বসবার ঘরের বেঞ্চের কোণে একটা টাকা ভরতি মনিব্যাগ কেন ?...

কুমকুম

আমি কি নিয়ে নেবো ?

ভাববো ভগবান আমার জন্যে রেখে দিয়েছেন ?

মা, তোমার কাছে লুকিয়ে আর পাপ বাড়াবো না, সত্যি কথাই বলি, আমি ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়েছিলাম ! সেই গুমটি-ঘরের দিকে সরে গিয়ে যেখানে কেউ নেই সেখানে খুলে দেখেছিলাম। তাই তো দেখলাম একগোছা নোট।

আমার মনের মধ্যে তখন কী অবস্থা হচ্ছে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছো মা ? যেন বুকের মধ্যেই গুম-গুম করে লাইন কাঁপিয়ে ইঞ্জিন গাড়ি এলো, যেন রেলগাড়ি চলতে লাগলো। আমার একদিকে লোভ। আর একদিকে ধর্ম। লোভ বলছে, নিয়ে নে না বাবা, কেউ তো দেখতে আসছে না। আর যার হারিয়েছে, তার তো হারিয়েইছে। সে তো আর পাচ্ছে না। রেলগাড়ির কর্তাদের কাউকে দিয়ে দিলে, সে কি করবে কে জানে ! হয় তো নিয়েই নেবে। তার চেয়ে বাবুরাম তুই-ই নে। তোর এতো দরকার, মনে কর, ভগবানই তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে···আর ধর্ম বলছে, ছি ছি বাবুরাম, পরের জিনিস নেবার কথা ভাবতে পারলি তুই ? তুই না বাবু রাজারাম রায়ের ছেলে বাবুরাম ! হতে পারে তোর এখন অভাব, তাই বলে—যে টাকা তোর নয় সে টাকা নিবি ?

লোভ বলছে, কুড়নো জিনিস নিতে দোষ কি ?

ধর্ম বলছে, পরের জিনিস নেওয়াটাই দোষ।

নাঃ, নেওয়া যাবে না।

এই টাকা নিয়ে মার কাছে যাবার টিকিট কিনবো ? তা হয় না। তা হলে মার কাছে মুখ দেখাবো কি করে ?

ব্যাগটা খুলে তন্নতন্ন করে দেখি, একটা শক্ত কাগজের টুকরো, তাতে ইংরিজিতে কি যেন লেখা। বোধ হয় ঠিকানা। ইংরিজি তো আর পড়তে পারি না। তখন আমি একটা বুদ্ধি করলাম। ব্যাগের মধ্যে টাকাগুলো পুরে আমার জোববার মধ্যে লুকিয়ে রেখে শুধু সেই কাগজটুকু নিয়ে ইস্টিশান মাস্টারের ঘরে গিয়ে বললাম,—'দেখ তো সাহেব, এতে কি লেখা আছে ?'

কুমকুম

'সাহেব' তো নামেই সাহেব। কালো কিষ্টি একেবারে।

তা সে সেই কাগজটুকু উলটেপালটে বললো, 'এ তো একটা ঠিকানা দেখছি।'

ঠিক, ঠিক ধরেছিলাম আমি।

আহ্লাদে প্রাণ নেচে ওঠে আমার। তাহলে আমার কথাই ঠিক। সাহেব বললেন, 'তা কী হবে এতে? তোমায় কেউ যেতে বলেছে সেখানে?'

মাথা কাত করে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তা কা দরকার? চাকরি খুঁজছো বুঝি?'

দুগ্‌গা বলে বলে দিলাম, 'হ্যাঁ।'

'কে দিয়েছে এটা?'

'একজন বাবু।'

'কি চাকরি করবে?'

বললাম, 'যা পাই।' তারপর বললাম, 'আমার টাকার খুব দরকার।'

সাহেব হেসে উঠে বললো, 'কারই বা দরকার নেই।'

তারপর বললো, 'কিন্তু এ তো দেখছি তিনটে স্টেশন পরের ঠিকানা। ওখানকার এস. ডি. ও.।'

এস. ডি. ও. কাকে বলে তা আমার জানা নেই। তবু বললাম, 'তিন ইস্টিশান পরে আমি যাবো কি করে? আমার কি টাকা আছে?'

'টাকা নেই? এইটুকু যাবারও টাকা নেই? কে তোকে পাঠিয়েছে বাপ? বোধহয় ঘাড় থেকে নামাতে একটা ঠিকানা গছিয়ে দিয়েছে। তা টাকা যখন নেই, তখন ওটা ছিঁড়ে ফেলগে যা।'

আমি এবার একটা কথা বললাম। বললাম, 'তুমি তো বাঙালী, তবে তুমি আমার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলছো কেন? আমিও তো বাঙালী।'

'তুই বাঙালী?' ইস্টিশান মাস্টার হো হো করে হেসে উঠে বললো, 'তুই যদি বাঙালী, তো আমি জাপানী। কোনখানটা তোর বাঙালী রে?'

কুমকুম

আমার রাগ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল একটি ঘুষি মেরে ওর 'তুই' বলা বার করে দিই। তবু কষ্টে রাগ চেপে বললাম, 'তা তুমি যদি দশ বিশ বছর জাপান দেশে থাকো, সাজগোজে জাপানীই বনে যাবে। তা বলে কি বাঙালী থাকবে না?'

এই সব কথাও যে আমি পাহাড়ী ভাষা, হিন্দী ভাষা আর বাংলা ভাষায় খিচুড়ি পাকিয়ে বলছি, তা আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু ওই ইস্টিশান মাস্টারমশাই সেটা বুঝতে পারছিল। তাই আবার হেসে হেসে বললো, 'এ কী তাজ্জব ভাষা রে বাবা খিচুড়ি! বাঙালা! তা হবে! কোথায় ছিলি এতদিন? নেপালে? ভুটানে?'

আমি বললাম, 'অনেক জায়গায়। কিন্তু সে কথা যাক, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা করো।'

'কী ব্যবস্থা করবো?'

'ওই তিন ইস্টিশান যেতে যাতে ভাড়া না লাগে তাই কর।'

'ও বাবা! এ বলে কি, তা যা চলে যা। টিকিটবাবু টিকিট চাইলে এইটা দেখাস।' বলে একটুকরো কাগজে কি যেন লিখে দিল আমার হাতে।

আমি হাতে চাঁদ পেলাম।

আমি রেলগাড়িতে উঠে বসলাম।

রেলগাড়ি! আমার দিন-রাত্তিরের স্বপ্ন।

সেই রেলগাড়িতে চড়লাম অবশেষে।

রেলগাড়ি ছুটছে! গাছপালা মাঠ নদী ছুটছে। আমার মনও ছুটছে।

ইস্টিশান মাস্টার লোকটা খারাপ নয়। পৃথিবীতে খারাপ লোক অনেক আছে বটে, তবে ভালো লোকও আছে ঢের।

তিন ইস্টিশান পরে নেমে পড়লাম।

টিকিটবাবুকে চোখেও দেখলাম না। আমি নেমে পড়ে সেই ঠিকানার কাগজটা দেখিয়ে বেড়াতে লাগলাম। কেউ বললো, জানি না, কেউ একটা যা তা পথ দেখিয়ে দিল। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেলাম সন্ধান। ওই এস্. ডি. ও.

কুমকুম

সাহেবরই চাকর রাস্তা দিয়ে আসছিল, তাকে দেখাতেই সে বললে, 'আরে এ তো আমাদেরই বাড়ি, আমার সাহেবরই নাম।'

আমি পৌঁছে গেলাম।

আমি বললাম, কেন এসেছি। টাকার ব্যাগটা বার করে দেখালাম।

সাহেব কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো—তারপর বললো, 'তুমি এই টাকাটা কুড়িয়ে পেয়েছিলে?'

"তাই তো বললাম।"

'তুমি সেটা আমাকে পৌঁছে দিতে রেলভাড়া খরচ করে এতদূরে এসেছ?'

'রেলভাড়া আমার লাগেনি'—বলে, ইস্টিশান মাস্টারের দেওয়া সেই কাগজটুকু দেখিয়ে সব কথা বললাম।

তবু সাহেবের অবাক্ ভাব যায় না।

'রেলভাড়া না লাগুক, কষ্ট তো হয়েছে।'

আরে এ তো আমাদেরই বাড়ি।

'কষ্ট কি?'

'তুমি তো টাকাটা নিয়ে নিতে পারতে?'

ছিঃ!

সাহেব আমায় চিরকালের জন্যে তার বাড়িতে থাকতে বলেছিল।

বলেছিল, 'এমন একটি লোক আমার দরকার ছিল।'

কুমকুম

কিন্তু আমি থেকে যাবো কি ?

আমার মনের মধ্যে যে রেলের বাঁশি বাজছে। আমায় যে বর্ধমান জেলায় যেতে হবে।

সাহেবকে বললাম আমার সব কথা।

সাহেবের চোখে জল দেখলাম।

সাহেব অবশ্য বাঙালী সাহেব। বাঙলাতেই বললে, 'তোমাকে আমার নমস্কার করতে ইচ্ছে করছে।'

সাহেব আমায় অনেক টাকা দিল।

আমি বেশী নিতে চাইনি।

কিন্তু সাহেব বললো, 'ওই ব্যাগে আমার কত টাকা ছিল জানো ? চার হাজার ! একটা জিনিস কিনতে যাচ্ছিলাম, ব্যাগটা হারিয়ে ফেললাম।

মন খারাপ করে ফিরে এলাম। আর ফিরে পাবো আশাও করিনি। সেই জিনিস তুমি আমায় এনে দিলে। তা থেকে যদি মাত্র দুশো টাকা তোমায় দিই, নেবে না কেন ? আমারও তো একটা 'মন' আছে ?'

নিলাম টাকা।

সাহেবই আমায় তার বাড়িতে একদিন রেখে খাইয়ে-দাইয়ে, নিজের চাপরাসী দিয়ে রেলগাড়িতে তুলে দিলো। কোথায় কোথায় গাড়ি বদলাতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলো।

আমি গাড়িতে চড়ে বসলাম।

আমার পকেটে দুশো টাকা ! আমার পকেটে বর্ধমান জেলার একটি গ্রামের টিকিট, যে গ্রাম থেকে বাবুরাম বলে একটা ছেলে একদিন গরুরগাড়ি করে পাচার হয়েছিল।

আমি আমার ঝুলি থেকে সব বার করে গায়ে চাপিয়ে নিয়েছি।

আমার সেই গলাবন্ধ লোমের কোটটা পরে নিয়েছি, যেটা মিংচু আমায় দিয়েছিল। লোকটা মন্দ ছিল বটে, খুবই মন্দ ছিল, কিন্তু লোকটা কী ভাবে মরে

গেছে ভেবে দুঃখ হয়। সেই দুঃখের স্মৃতিটার জন্যেই কোটটা পরা। এই কম্বুলে হাফ-প্যাণ্টটা অবশ্য আমার নিজের কেনা, প্রথম রোজগার করে কিনেছিলাম ভুটানবাজারে। এই মোজা দু পাটি সেই ডাক্তারবাবুর দেওয়া। সেই বাঙালী ডাক্তারবাবু। যাঁর কাছে থাকলে আমার জীবনে এত দুঃখ কষ্টের কিছুই হতো না। কিন্তু আমি সেই কুকুরটার জন্যে টিকতে পারিনি। দুষ্ট ছেলেগুলো ঢিল ছুড়ে ছুড়ে মেরে ফেলেছিল যে কুকুরটাকে।

এক এক সময় মনে হয়, আমার অবস্থাও যেন সেই কুকুরটার মতন। শুধু আমি মরিনি। আমি মার কাছে ফিরে যাবো বলে মরিনি।

ডাক্তারবাবু আমায় দু জোড়া মোজা দিয়েছিলেন। এক পাটি করে ছিঁড়ে গেছে, দুটোই দু পায়ে পরে নিলাম, মাকে সব দেখাতে হবে।

জুতো দুটোও দু-জোড়ার।

কবে কখন কোনটা হারিয়ে গিয়েছিল, কোনটা কবে জুটেছিল, মনে পড়ছে না। কিন্তু ওছাড়া আর কোনো জুতো আমার নেই।

বাঙালী ছোট ছেলেরা গলায় মালা পরে না, কিন্তু নেপালীরা পরে। এ-সব লামাদের আশীর্বাদী মালা। আমায় উপহার দিয়েছে কোনো কোনো বন্ধু। এই এতবড় জীবনটায় বন্ধুও তো জুটেছে কত।

মাকড়িটা দিয়েছিল আমায়, আমার কোনো এক সময়কার মনিব। ওই মাকড়িটা কেনা চাকরের চিহ্ন। কিন্তু আমি পালিয়ে এসেছিলাম। তবু মাকড়ি দুটো কান থেকে খুলতে পারিনি। সেঁটে বসে আছে, টানা-হেঁচড়া করতে গেলে লাগে। আছে থাক, মরুকগে।

আমি পাগড়ি পরি বলেই আমাকে লোকে বাঙালী বলে বিশ্বাস করে না। কিন্তু পাগড়িটা আমি ছাড়বো কি করে? এ যে এক সাধুর দেওয়া। এই লাল টকটকে সিল্কের চাদরটাও অন্য এক সাধুর দান। যিনি বলেছিলেন, সিঁদুর আর চন্দন দিয়ে কপালে একটি ত্রিশূল এঁকে পথে বেরোলে কোনো বিপদের ভয় থাকে না।

কুমকুম

আমি সকলের কথাই শুনে চলি।

কেন চলবো না?

যারা বলে, ভালর জন্যেই তো বলে!...

আমার সাজটা অদ্ভুত হলো।

তা হোক, ঝুলি করে বয়ে বেড়ানোর থেকে গায়ে চাপিয়ে নেওয়া ভালো। রেলগাড়িতে যদি ঘুমিয়ে পড়ি ঝুলি চুরি যেতে পারে। গায়ে থাকলে কিছুটি হারাবার ভয় নেই। যখন আমি মিংচুর সঙ্গে 'স্বর্ণবুদ্ধের মন্দিরের' উদ্দেশে গিয়েছিলাম, তখন যেখানে যা কিছু ছিল সব গায়ে চাপিয়েছিলাম বলেই না সব রয়ে গেছে। তবু একটা জিনিস এখন আর গায়ে দিলাম না, মুড়েসুড়ে থলিতে রেখে দিয়েছি। সেটা হচ্ছে, আমার একটা প্রিয় রামছাগলের চামড়া। ছাগলটা মরে গিয়েছিল, কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়তে পাচ্ছিলাম না। তখন সেই ছাগলের মালিক আমার মনিব বললো, 'আচ্ছা ওর ছালটা তোকে দেবো।'

মরা ছাগলের ছাল ছাড়িয়ে ওরা পোশাক বানায়, জুতো বানায়, এমনি গায়েও চাপায়।

আগে আগে গায়ে চাপিয়েছি ওটা, কিন্তু এখন বাঙলাদেশে দিচ্ছি না।

কী অবাক্ লাগছে! আমি রেলে চড়ে বসেছি, আমি বাড়ি যাচ্ছি।... যেখানে আমার সব আছে। কিন্তু আমার শরীরটা এত খারাপ লাগছে কেন? আমার কি বেমার হচ্ছে?..."

* * * *

টুটু দেখলো শেষের দিকের লেখাগুলো বাঁকাচোরা—কাঁপা। তারপর সাদা পাতা।

তার মানে রেলগাড়িতে বসে লিখেছে, তার মানে জ্বর গায়ে লিখেছে।

এই রেলগাড়ি চড়াটাই কি সেই টুটুর রেলগাড়ি? পিসীর বাড়ি যেতে টুটু যখন—তাই হবে, তাছাড়া কি? তখনই তো টুটু দেখেছে কিম্ভূত যেন বড় ক্লান্ত, যেন দাঁড়াতে পারছে না। আহা, বেচারা জ্বর গায়ে—

কিন্তু দুদিন পরেই কেন ও আবার সেই রেলেই ফিরে এল? ওর সেই 'খণ্ডঘোষ' না-কি গ্রামে কি কলেরা হলো? কলেরা হলেই তো তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়, ইচ্ছে থাকলেও হয়। নইলে মার কাছে গিয়ে—

টুটু খাতাটা উলটে উলটে দেখে, আর কোথাও কিছু লেখা আছে কি না দেখতে। কই, সবই তো সাদা। উলটোতে উলটোতে হঠাৎ খাতার খাঁজ থেকে টুক্ করে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ পড়ে। টুটু তুলে নেয়। ভাঁজ খোলে, পড়তে চেষ্টা করে।

চেষ্টা করেই পড়তে হয়, ভয়ানক বাঁকাচোরা লেখা।

কিন্তু পারছে, পডতে পারছে টুটু।

অনেক দিন ধরে, ওর হাতের লেখা পড়তে পড়তে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে তো? কিন্তু এ কী? পড়তে পেরে টুটুর চোখ দুটো অমন গোল হয়ে যাচ্ছে কেন? মুখটা অমন লাল লাল? টুটুর নিঃশ্বাসটা অমন জোরে জোরে পড়ছে কেন? টুটুর হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল কেন?

* * * *

নীচতলায় টুটুর বাবা-মা কথা বলছিলেন, 'টুটুর ধরন-ধারন মোটে ভাল লাগছে না, সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক, লেখা পড়াতেও তেমন মন নেই—'

টুটুর মা বলেন, 'সেই পিসীর বাড়ি থেকে ঘুরে আসা পর্যন্তই এই রকম দেখছি—'

'পিসীর বাড়ির দোষ দিও না'—টুটুর বাবা রেগে উঠে বলেন, 'যাতে-তাতে পিসীর বাড়ি তুলো না, আমি বলছি রেলগাড়ির সেই লোকটাকে দেখে পর্যন্তই—'

'ভগবান জানেন, কিছু তুকতাক করে দিয়ে গেছে কিনা—। টুটুর মা কাঁদো-কাঁদো হন, 'আমি তো সঙ্গে ছিলাম না। ওই জন্যেই ওকে একা ছাড়তে চাইনি আমি।'

'একা মানে? আমি ছিলাম না?'

'তুমি? তুমি থাকাও যা, না থাকাও তা। এই তো একটা বাজে লোক, কিম্ভূতকিমাকার লোক রেলে যেতে আসতে দু-দুবার তোমার ছেলের সঙ্গে ভাব

করলো, কি সব কাগজ-পত্তর না কি দিল, আর কে জানে কি নাকি তুকতাক করলো, তুমি আটকাতে পারলে ?'

'তুমি থাকলেও আটকাতে পারতে না।' টুটুর বাবা রেগে রেগে বলেন,—'তুমি বলতে পারতে, যাও সরে যাও, আমার ছেলের সঙ্গে কথা বোলো না। পারা যায় না।'

'তা বলে আমার ছেলেটার অনিষ্ট হওয়া দেখবো আমি ? জানো, আজকাল ওর খাওয়া-দাওয়াতেও মন নেই। আগে আমসত্ত্ব খেতে কী ভালবাসতো, ঘুগনির জন্যে রোজ আবদার করতো, এখন আর কিছুই করছে না ওসব।'

'ভাবছি একটা ডাক্তার দেখালে হয়—।'

'ডাক্তার ! ডাক্তার কি করবে ?' টুটুর মা বকে ওঠেন। 'ডাক্তারকে তুমি বলতে পারবে, কি অসুখ ?'

'তা একটা কিছু তো করতে হবে ?'

'আমি বলি কি ছাতের দরজাটায় স্ক্রু মেরে আটকে দাও।'

'ছাতের দরজায় !'

টুটুর বাবা ভেবে পান না ছাতের দরজা আটকানোটা কোন চিকিৎসা ! কবিরাজী ? হাকিমী ? দৈব ? ওঝার ব্যাপার ?

অবাক্ না হয়ে পারেন না।

টুটুর মা, অতএব আরো রাগেন।

'ছাতে কি তা জানো না ? ছেলেটা যে সারাক্ষণ কেবল ওই ছাতের ঘরেই পড়ে থাকে, বলিনি তোমায় সে কথা ?'

'তা বলেছ বটে।'

'তবে ? ওই, ওইখানেই ভূতে পাচ্ছে। সেই বাজে লোকটার কাগজ-পত্তরে ভূতের মন্তর লেখা আছে কি না তাই বা কে জানে !'

'ভূতের মন্তর !'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই বিশ্বাস।'

কুমকুম

টুটুর বাবা হয়তো হেসে উঠতেন, ঠিক সেই সময় টুটু দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে এল সত্যিই ভূতে তাড়া খাওয়ার মত। আর এসেই 'মা' বলে একটা চিৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

'এ কী টুটু, কী হলো?

শরীর খারাপ লাগছে?

ভয় পেয়েছো?

লেগেছে?

কেটে গেছে?

পড়ে গেছো?

বল না বাবা, হলোটা কি?'

বলবে কি—

টুটু আরো ডুকরে ওঠে। 'কিম্ভূতের মা কিম্ভূতকে চিনতে পারলো না—।'

'কে চিনতে পারলো না? কাকে চিনতে পারলো না? কি বলছিস পাগলের মতন? বল তো শুনি?'

'মা গো, কত কষ্ট করে, কত দুঃখু পেয়ে বেচারী জ্বর গায়ে মার কাছে গেল, যত্নটত্ন পাবে বলে আর মা চিনতেই পারলো না? কেন? কেন? কেন ওর মা অত নিষ্ঠুর হবে?'

আর এসেই 'মা' বলে একটা চিৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

টুটুর মা বাবা তো দিশেহারা। কী বলে চলেছে ছেলেটা?

বার বার জিগ্যেস করতে থাকেন তাঁরা।

কিন্তু গুছিয়ে কথা বলবার ক্ষমতা কি আছে টুটুর তখন? সে এলোমেলো

কথাই চালিয়ে যায়, 'কিম্ভূত তো ওর নাম নয়, আসল নাম তো বাবুরাম, আসলে তো আমার মতনই ছোট ছেলে। ছোট বলেই বোকামী করেছিলো।

সার্কাসের দলে মিশবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো! তারপর তো খুব মন কেমন করেছিলো ওর, কিন্তু কি করে ফিরবে? ওকে যে সার্কাসওয়ালারা আটকে রাখলো! ও যে টাকা পয়সার অভাবে আর ফিরে আসতে পারলো না, শুধু কষ্টই পেলো। কত কত দেশে গেল ও, ভগবান বুদ্ধের স্বর্ণমন্দির পর্যন্ত, তবু তো বাংলাদেশে ফিরে আসবার জন্যেই পাগল হয়ে বেড়িয়েছে বেচারা। কেন? মার জন্যেই তো? মার জন্যেই তো অত কষ্ট করে খাতা লিখে লিখে মরেছে? অথচ—।'

টুটু মার গায়ের ওপর মুখ ঘষতে থাকে, অথচ ওর মা চিনতেই পারলো না ওকে। বললো, 'না বাপু, তোমাকে আমি হারানো ছেলে বলে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার ছেলে ছিল দুধের মতো ফরসা।.....'

'এতদিন অত কষ্ট করে রোদে ঘুরে ঘুরে কালো হয়ে যেতে পারে না মানুষ?'

কিন্তু টুটু—

টুটু ও-সব কিন্তু-টিন্তুর ধার ধারে না।

টুটু বলে চলে, 'বাবুরাম তো সবই চিনতে পেরেছিল। ইস্টিশান, বকুলদীঘি, বুড়ো বট, মা কালীর মন্দির, বাড়ি। আর মা-বাবাকে তো পেরেইছিল, বুড়ো-বুড়ী হয়ে গেলেও পেরেছিল। চিনতে পেরে ওর কী আহ্লাদ হয়েছিল, কিন্তু ওর বাবা বললো, 'বুড়ো হয়ে গেছি বলে ভেবো না ঠকানো সহজ। আজ পর্যন্ত অনেক নিরুদ্দেশ ছেলে উদ্দিশ করে গেছে, সব কটা জোচ্চোর। এসেছো—অতিথশালায় দুটো ভাত খেয়ে সরে পড়ো। ওই কালীমন্দিরের পেছনে অতিথশালা আছে 'বাবুরাম স্মৃতি সদন'। ওইখানে গিয়ে বসলেই ভাত পাবে।'

কিম্ভূত যে কেঁদে উঠে বললো, 'ও বাবা, আমিই সেই বাবুরাম', তখনও বিশ্বাস হল না। উঃ, মাগো জ্বর গায়ে ফিরে গেল বাবুরাম, বর্ধমান জেলা থেকে! কিছুটি না খেয়ে! ওঃ মা আ!'

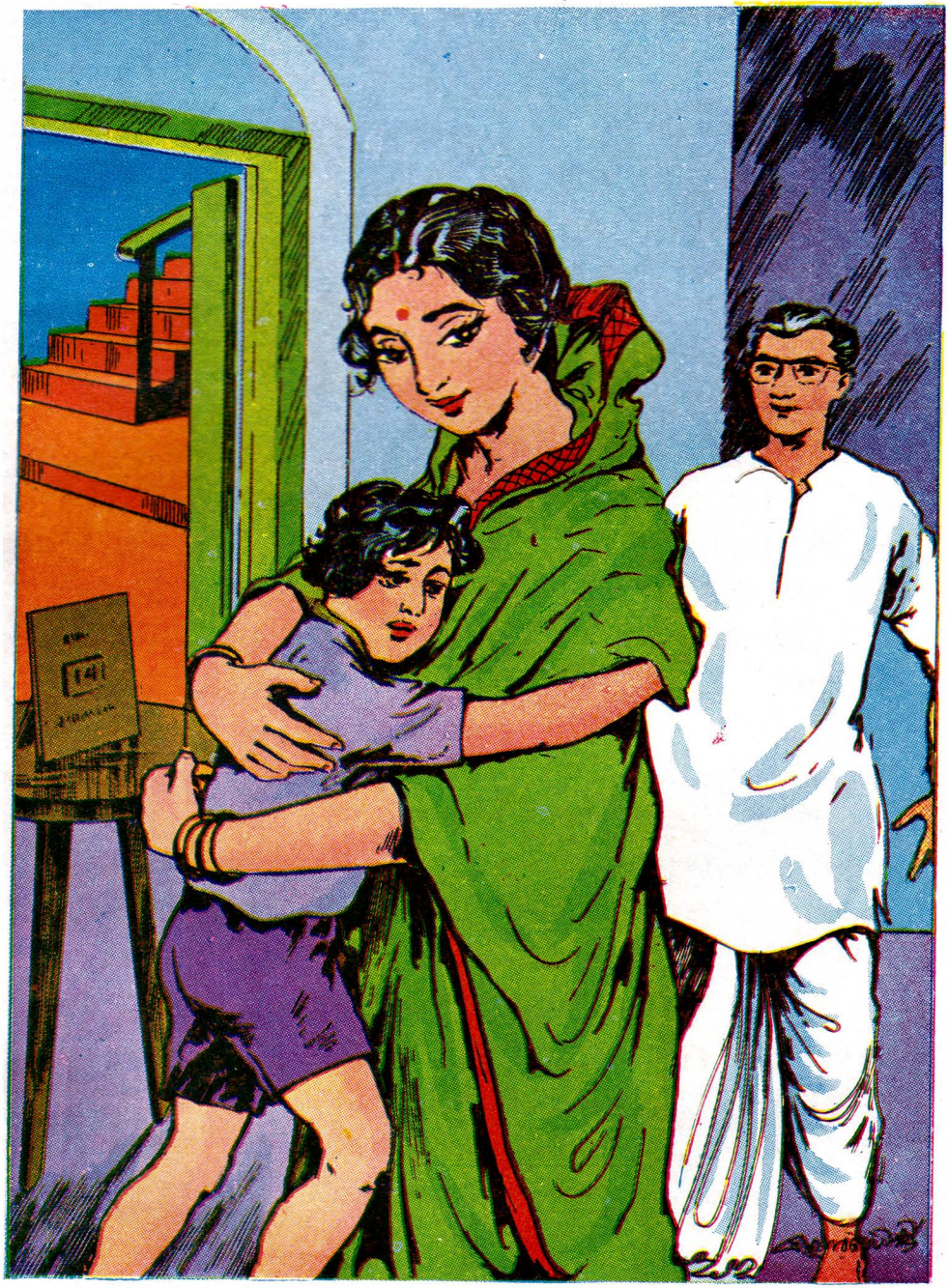

টুটু মার কোলে মুখ চেপে বলে, 'না।'

[পৃঃ ১২৯

কুমকুম

টুটুর মা হতাশ দৃষ্টিতে তাকান। টুটুর মা বুঝতে পারেন কোনো গল্পের কাহিনীই টুটুকে এতো উত্তেজিত করেছে। তাই টুটুর মা বলেন, 'পৃথিবীতে অনেক ঠগ, জোচ্চোর লোক থাকে টুটু—তারা ঠকায়, তারা সবকিছু জাল করে, তাই ওঁরা অত অবিশ্বাস করেছেন!'

'পৃথিবীতে জোচ্চোর আছে বলে ওঁদের ছেলেও জোচ্চোর হবে? মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে ফিরে দেয় যে!'

'টুটু তুই একটু আস্তে করে সব বল বাবা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি কিছু বলতে চাই না।'

টুটু ঠিকরে ওঠে, 'আমি বুঝতে পেরেছি, আমিও যদি পালিয়ে গিয়ে হারিয়ে যাই, ফিরে এলে তোমরা আর চিনতে পারবে না—' আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে টুটু, 'বেশ বেশ, আমিও তাহলে সন্নিসী হয়ে যাবো। বাড়ির দেওয়ালের গায়ে লিখে রেখে যাবো—'হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসতে নেই, একেবারে হারিয়ে যাওয়াই ভালো'।'

টুটু ছুটে চলে যাচ্ছিল, মা খপ্ করে ধরে ফেলেন। বলেন, 'তুই আমায় ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে হারিয়ে যেতে পারবি?'

টুটু জোরে মাথা নাড়ে, 'কক্ষণো না।'

'তবে?'

টুটুর মা বলেন, 'তবে তো সমস্যা মিটেই গেল। হারিয়ে না গেলে তো এ-সব কথাই নেই। বল আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে যাবি না?'

খেপা খেপা ছেলেটার জন্যে ভাবনায় টুটুর মার বুক কাঁপে। টুটুর মার মনে হয়, সত্যিই বুঝি ছেলেটা তাঁর সন্নিসী হয়ে চলে যাচ্ছে। বুঝি হাত ছাড়িয়েই ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

টুটুর মা যেন সেই পালিয়ে যাওয়াটা আটকাতেই টুটুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেন, আর বার বার বলতে থাকেন, 'বল বল যাবি না?'

টুটু মার কোলে মুখ চেপে বলে, 'না।'

কুমকুম

টুটুর মার মুখে হাসি ফোটে।

'ব্যস, তবে তো সব গোলমাল মিটেই গেল। হারিয়ে না গেলে তো ভুলে যাবার কথাই ওঠে না। তোর ওই বাবুরাম না কে, তার মা-বাবার কী দোষ বল? বললাম তো জগতে কত ঠগ, জোচ্চোর লোক আছে তা কি জানিস তুই? তারা এসে বানিয়ে বানিয়ে বলে, 'আমিই তোমার সেই ছেলে—' তাদের জ্বালায় মন অবিশ্বাসী হয়ে যায়, সত্যিকেও মিথ্যে বলে মনে হয়।'

টুটু কিন্তু এতখানি যুক্তিতেও ভোলে না। ও জেদের গলায় বলে, 'তা কেন? মিথ্যেকে যদি 'মিথ্যে' বলে বুঝতে পারলো, তো সত্যিকে 'সত্যি' বলে বুঝতে পারবে না কেন?'

এ 'কেন'র উত্তর দেওয়া শক্ত।

তাই টুটুর মা অন্য কথা বলেন।

বলেন, 'তা সত্যি। ওই বাবুরামের মা-টার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু নেই মনে হচ্ছে। কিংবা বুড়ো হয়ে চোখ খারাপ হয়ে গেছে।'

'কক্ষণো না। তুমি আমায় ভোলাচ্ছ।'

'তোমাকে ভোলাচ্ছি? ও বাবা! তোমাকে ভোলানোর সাধ্য আমার ঠাকুমারও নেই। তুমি কি সোজা ছেলে? আমার জেঠামশাই।'

টুটু মার কোলের কাছ থেকে ছিটকে ওঠে। জলভরা চোখ তুলে ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'ও-সব কথা এখন আমায় বলবে না তুমি, ভাল লাগছে না। এখন আমার বাবুরামের জন্যে মন কেমন করছে।'

ললাটের লিখন

'কালো বউ ফরসা বউ ওসব হলো ললাটের লিখন, বুঝলি গোবিন্দ—' নরহরি উদাস উদাস গলায় বলে, 'ও নিয়ে আর মন খারাপ করছি না, সময়ে সবই সয়ে যাবে। তবে কি না সেই যে ছেলেবেলায় ঠাকুমা ঘুম পাড়ানোর কালে হ্যানোত্যানো ছড়া কাটতো ঃ

চাঁদের কণা কুড়িয়ে
বউটি দেব গড়িয়ে।

* * * *

লোকের বউ কালো ঝুল,
আমার নাত বউ পদ্মফুল।

* * * *

ঘরে কেন আবার পিদিপ জ্বালো ?
(আমার) খোকার বউ তো করছে ঘর আলো।'

ইত্যাদি প্রভৃতি—

কুমকুম

সেইগুলোই মাথা খারাপ করে রেখেছিল। মনে মনে তাই 'বউ' ভাবলেই মনে হতো চাঁদের মত রং, লক্ষ্মী ঠাকুরের মতন মুখ, মুক্তোর মতন দাঁত, তার বদলে হলো কিনা রক্ষেকালী মার্কা।

এই আর কি—

গোবিন্দ তার চিরবন্ধু নরহরির এই 'মন খারাপ করছি না—' আর 'তাই আর কি' এই দুটো কথাকে ঠিক মত খাপ খাওয়াবার চেষ্টায় হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, 'কিন্তু আমি যে ভাই কলকাতা যাবার আগে শুনে গেলাম খুব সোন্দর মেয়ে দেখা হয়েছে তোর জন্যে। মেয়ের রং নাকি পাকা টমেটোর মতন, চোখ নাকি পটল চেরা, নাক নাকি টিয়ে পাখি, আঙুল নাকি চাঁপা কলা—'

'চাঁপা কলা কিরে মুখ্যু? বল চাঁপার কলি।' নরহরি বলে।

'এই হলো একই কথা—' গোবিন্দ বলে, 'তা সেই কনেটার কি হলো? সব বানানো বুঝি?'

'বানানো নয় ভাই—' নরহরি ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'জুটেছিল তেমন মেয়ে, কথাবাত্রাও সব পাকা, পাকা দেখার দিন স্থির! শত্রুতা করলো সেই মেয়ের দিদিমা। বুড়ী তীর্থে যাবার আর সময় পেলনা, তখন গেল তীর্থে। আর নিজের মেয়েকে কুমন্ত্রণা দিয়ে গেল কিনা 'আমি ফিরে আসার আগে যেন আমার নাতনীর বিয়ে দিয়ে বসিস নি।' দেখ দেখি ভাই অনাছিষ্টি আবদার? বিয়েটা তোর নাতনীর সঙ্গে হবে বই তো তোর সঙ্গে হবেনা? আর তুই কিছু পাঁড়িও ঘোরাবিনা? তবে? আর এতই যদি ইয়ে তো অমন মোক্ষম সময় যাওয়া কেন তীর্থে? কেদার বদরী পালিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়ায় চেপে?···তা এসব সাদা বাংলা কে বোঝে বল? আজ্ঞাবাহী কন্যে অমনি জেদ ধরে বসলেন। 'মা ফিরে না এলে বিয়ে হবেনা।'

আর ফিরে আসা মানেই তো দুমাসের ধাক্কা।

গোবিন্দ অবাক্ হয়ে প্রাণবন্ধু নরহরির কথা শোনে। কনের মার জেদটাকে তার ভয়ানক একটা সৃষ্টিছাড়া জেদ বলে তো মনে হয় না কই?

কুমকুম

আহা নাতনীর বিয়ে বলে কথা।

বুড়ী কবে থেকেই হয়তো মণ্ডা মেঠাই দই বোঁদে ক্ষীরের পান্তুয়ার স্বপ্ন দেখছে। তাই গোবিন্দ মলিন গলায় বলে, 'তা তোরই বা দু মাস পরে বিয়ে হলে কী এমন রাজ্য রসাতলে যেতো ভাই? তুই তো আর বিয়ে পাগলা রামসুন্দর হয়ে যাসনি?'

'বিয়ে পাগলা?' নরহরি হাতদুটো উলটে বলে, 'আমি কিছুই হয়নি বাবা, পাগলা হয়ে উঠেছিল কাকা।'

'পাগলা হয়ে উঠেছিল কাকা?'

গোবিন্দর চোখ দুটো শীতকালের নতুন আলুর মতন গোল হয়ে ওঠে, 'বিয়ে করবি তুই, আর পাগলা হয়ে উঠলো কাকা? আমার মাথা ফাতা যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে রে নরহরি।'

'মাথা গুলিয়ে যাবারই কথা—' নরহরি উদাস গলায় বলে, 'সেই পাঁঠা জোড়াটাই হলো কাল! ওদের জন্যেই সাততাড়াতাড়ি বিয়ে ঘটানো।'

গোবিন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

'সেই পাঁঠা জোড়াটাই হলো কাল! তার জন্যেই তাড়াতাড়ি বিয়ে!' গোবিন্দের প্রাণের বন্ধু নরহরির কি পদ্মফুলের বদলে ঘেঁটুফুলের মত বউ হওয়ায় ব্রেন গুবলেট্ হয়ে গেছে?

'অমন করে তাকাচ্ছিস কেন?' নরহরি বলে, 'ভাবছিস পাগল হয়ে যা-তা বলছি, আরে বাবা পা মাথা কিছুই আমার গোল হয়ে যায়নি, সব ঠিক আছে। সত্যিই কারণ ওই পাঁঠা। আরে—তুই তো তাদের দেখে গেছিস?' নরহরি বলে, 'সেই যে সেবার হাট থেকে কিনে এনেছিল কাকা ছোট্ট একজোড়া কালো চকচকে পুরুষ্টু পাঁঠা? কাকার ঘরের জানলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকতো? কাকী কচি কচি জামপাতা এনে খাওয়াতো!'

গোবিন্দর অবশ্য এসব কিছুই মনে নেই, তবু সে ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে

বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে। সেই যে বেশ কালো কালো—তা কি হলো সে দুটোর? মরে গেল বুঝি? সেই শোকেই কাকা—'

'নাঃ, সাদা বাঙলাও বুঝবিনা তুই—' নরহরি রেগে ওঠে, 'পাঁঠা দুটোর মৃত্যুশোকে কাকা পাগল হয়ে গিয়েছিল। এমন কিম্ভূতকিমাকার চিন্তা তোর মাথায় এল? ও দুটোকে তো মারবার জন্যেই কিনেছিল কাকা। বলি ভাইপোর বিয়েয় বড় করে একটা ভোজ দেবে তো। নাকি দেবে না?'

'কী মুশকিল! সে তো দেবেই, আর দিচ্ছেই তো। নইলে আজ আমরা এসেছিই বা কি করতে?'

গোবিন্দ বলে, 'আত্মীয় ভোজ' মিটিয়ে আজ কাকা 'বন্ধুভোজ' দিচ্ছে সমারোহ করে—'

'হ্যাঁ, ওইটিই হচ্ছে কথা। একটা সমারোহের ভোজ দেবার ইচ্ছে কাকার বহুদিনের। বেশ কবজি ডোবানো মাংস দিয়ে। তা ভোজ দেবার তো সুযোগই আসে না। ঠাকুমার শ্রাদ্ধে ভোজ একটা হলো বটে, তা সে তো নিরিমিষির পিণ্ডি। তাই কাকা এই ভাইপোর বিয়েটাকে তাক করে রেখেছিল।'

'রেখেছিল!'

কলের পুতুলের মত শুধু শুধুই কথাটা আওড়ায় গোবিন্দ। যেন নরহরির কাহিনীটা মাথায় নিতে চেষ্টা করে।

'তা, ওই যেই না বিয়ের জন্যে কনে দেখা ও সঙ্গে সঙ্গে ওই পাঁঠা জোড়াটা কিনে ফেলা।'

গোবিন্দ আবার কাহিনীটাকে মাথায় নিতে চেষ্টা করছে—'তোদের জাতে বিয়ের নান্দীমুখে বুঝি পাঁঠা লাগে?'

'তোমার মুণ্ডু লাগে। নান্দীমুখে পাঁঠা লাগে কী? ওরে হতভাগা, খ্যাঁটে পাঁঠা লাগে না? ওই কবজি ডোবানো খ্যাঁটে? দুদিন করে ভোজ দেবে, তা কম করে না মন দেড়েক মাংস লাগবে? আর আজকালকার বাজারে সেই পাহাড়প্রমাণ মাংসের দাম কত পড়বে ভাব?'

গোবিন্দ ভয়ে ভয়ে বলে, 'তা ভাই ভোজ টোজ দিতে তো খরচ লাগবেই।'

'আহা সে তো তুই বুঝবি, আমি বুঝবো, কিন্তু কাকা? কাকা চায় করবে সবই কিন্তু চুলচেরা হিসেবে। যেই বিয়ের ঠিক হলো, কাকা অমনি সারা উঠোনে শাক বুনলো।'

'শাক বুনলো!'

'হ্যাঁ, বিয়েতে শাকভাজা হবে না? ওদিকে কাকীকে আর গাছের কুমড়ো, মাচার পুঁই, কিছুতে হাত দিতে দিল না। আর ওই তো বললাম বিয়ের কথার সূচনাতেই কচি দুটো পাঁঠা! কাকা বললো, 'ছাগল পুষতে তো পয়সা খরচ নেই? গাছের পাতায় পোষা। অথচ কচি দুটোকে ধাড়ি করে ফেলতে পারলেই চার কিলো মাংসর দামে দেড় মন মাংস। কুড়ি টাকা দিয়ে কিনে ফেললো তাই।.....তা তোকে বলবো কি ভাই, বিয়ে যেন আর এগোয় না। কনে দেখা পছন্দ করা সবই হলো, কিন্তু 'কথা'র আর শেষ নেই। গহনা, শাড়ি, ঘড়ি, আংটি, বোতাম, দানসামগ্রী এই সব যত হাবি-জাবি নিয়ে যতরাজ্যের কূট-কচালে কথায় দিন যায়, হপ্তা যায়, মাস যায়।

আমি যদি বলি—'ব্যাপারটা কি?' মা রেগে বলে, 'তুই থাম্‌তো। লাখ কথা নইলে বিয়ে হয়না তা জানিস?'.....আর কি বলবো বল? দেখছি এদিকে লাখ ছেড়ে কোটি কথা হয়ে যাচ্ছে, আর ওদিকে কাকার পাঁঠাজোড়া পেল্লায় ধাড়ি হয়ে উঠছে।.....কাকা বলে, 'আর নয় এবার কথায় থামা দাও, আর রাখতে পারছিনা ও দুটোকে। কে কখন চুরি করে নিয়ে যায় ভেবে ঘরে ছাগল নিয়ে শুয়ে শুয়ে প্রাণ গেল আমার।'.....মা বললো, 'এইবার কথা শেষ, ওরা বরকে ঘড়ি দেবে, আংটি দেবে, বোতাম দেবে, জরির জুতো চেলির জোড় আর শার্টিনের বিছানা দেবে।.....আমরা কনেকে নাকচাবি দেবো, কান ফুল দেবো, সোনা বাঁধানো লোহা দেবো। ব্যস্ এইবার শুধু 'পাকা দেখা'র দিন দেখো।' হলও ভাই দেখা—।' নরহরি করুণ কণ্ঠে বলে, 'কনেটার একটা ফটোও দেখালো আমায়, সে

আর কি বলবো রে? ঠাকুমার ছড়াগুলো ওই। ওই বিনামেঘে বজ্রাঘাত! কনের দিদিমার তীর্থ যাত্রা!'

গোবিন্দ এতক্ষণে কাহিনীর কিছুটা বুঝে ফেলেছে। তাই গোবিন্দ বলে ওঠে, 'তখন বুঝি কাকা দেরি করতে রাজী হল না?'

'ঠিক তাই। কনের মা যেই বলে পাঠালো, 'আমার মা কেদার-বদরী থেকে না ফিরলে বিয়ে হবেনা—', কাকা সেই তুড়িলাফ খেতে লাগলো। বলে, 'এ্যাঁ, এতোদিন ধরে ছাগল জোড়াটাকে পুষছি আমি, আর এখন আমায় কেদারবদরী দেখাতে এলো? বুড়ীকে একবার হাতে পাই তো এইখানেই বদরী বিন্দাবন দেখিয়ে দিই।.....কন্যে পক্ষ হয়ে এতো অহংকার।.....তোদের মেয়ে ছাড়া আমাদের ছেলের আর কন্যে জুটবে না? ওই লগ্নেই নরার বিয়ে দেব আমি।'

ব্যস্, যে কথা সেই কাজ। পরদিনই ওর দোকানের এক পাওনাদারের মেয়ের সঙ্গে একেবারে পাকা কথা করে এসে তবে জল গ্রহণ!

'সে কি!' গোবিন্দ কাতর গলায় বলে, 'কেউ দেখলোনা?'

'নারে! কাকা বললো 'দেখো সেই দুধে আলতার পাথরে দাঁড় করিয়ে'।'

'আর সেই লাখ কথার কী হলো? যেটা নইলে নাকি বিয়ে হয় না!' গোবিন্দ ক্যানকেনিয়ে বলে।

নরহরি দুহাত উলটে বলে 'আরে ভাই সবই, 'কর্তার ইচ্ছে' হলে সবই হয়। .....কাকা একেবারে কাঠকবুল। বলে, 'শাকগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, কুমড়োয় পচ্ ধরছে, পাঁঠাগুলো ধাড়ি হচ্ছে, আর ধৈর্য ধরবো না আমি। ছাগল নিয়ে শুয়ে শুয়ে আমার নিজের গায়ে বোকা পাঁঠার বোটকা গন্ধ জন্মে গেল! সাবান মেখেও গন্ধ ঘোচেনা। ওদিকে হতভাগারা রোজদিন দু জনে দু ঝুড়ি পাতা খাচ্ছে, দু গামলা ভাত খাচ্ছে। তোমার ছোট জা বলছে ছাগলের জন্যে আর পাতাও কুড়োতে পারবো না, আর ভাতও সেদ্ধ করতে পারবো না!'

কুমকুম

মা তেড়ে উঠে বললো, 'ছোটবউ না পারে আমি ভাত সেদ্ধ করে দেব।'

কাকা আরো তেড়িয়ে উঠে বললো, 'না হয় ভাতই সেদ্ধ করে দেবে! বলি মাংস সেদ্ধ করে দিতে পারবে? ভোজের মাংস? ওই ধাড়িদের আরো দু মাস পুষলে, ওদের মাংস সেদ্ধ হবে আর? থোড় হয়ে যাবে বুঝলে? স্রেফ থোড়!'

মা তেড়ে উঠে বললো, 'ছোট বউ না পারে আমি ভাত সেদ্ধ করে দেব।'

মা কেঁদে ফেলে বললো, 'তোমার মাংসটাই বড় হলো?'

'আমার মাংস নয়। পাঁঠার মাংস' ভুল শুধরে দিল কাকা।

'ওই হলো একই কথা—', মা বলে, 'তাই বলে অমন সোন্দর মেয়েটাকে হাতছাড়া করবে তুমি?'

কাকা তখন সান্ত্বনা দিয়ে বোঝালো, 'দুনিয়ায় কত হাজার হাজার সোন্দর মেয়ে, সব কটাকে তো আর তুমি বউ করে ঘরে আনতে পারবে না? তবে আর বাকী একটার জন্যেই বা খেদ করে লাভ কি?'

'আর ওরা?'

কুমকুম

গোবিন্দ বুড়ো আঙুলটাকে কেদার বদরীর দিকে ঘুরিয়ে ধরে বলে, 'ওরা কিছু বললো না?'

'ওরা তো জানতেই পারেনি আগে! কাকা একেবারে বিয়ের চিঠি ছাপিয়ে ঘটা করে গিয়ে তাদের নেমন্তন্ন করে এল।'

'তাদের নেমন্তন্ন করে এল?'

'এলো তো! বললো 'যতই হোক হলে-হতে-পারতো কুটুম তো! ওদের বাড়ি গিয়ে কত ছানার জিলিপি, দেদো মণ্ডা, নিমকি সিঙাড়া সেঁটে এসেছি। তাছাড়া তারাও দিনের পর দিন ছাগল দুটো দেখে গেছে। জিভে কি আর একটু জল আসেনি? ইদানীং ব্যাটাদের কী কান্তি কী পুষ্টিটি হয়েছিল! গা দিয়ে মাছি পিছলে পড়ছিল।'

হঠাৎ নরহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ঘরে যেটি এনেছে কাকা সেটিও কান্তিতে পুষ্টিতে, বলে লাবণ্যে ওদের থেকে কিছু কম নয়। থাকগে ভাই ওসব কথা। তবে রান্নাঘরের খোসবুটা ভালই বেরিয়েছে কী বল? কাকা রাঁধে ভাল।'

'কাকা! কাকা রাঁধছে?'

'রাঁধছেই তো। কালও রেঁধেছে। কাকা বলে শুধু শুধু রসুইয়ে ঠাকুরকে পয়সা দিতে যাব কেন? আমি তাদের চেয়ে কমটা কিসে? তাদেরও পাঁচটা পাঁচটা দশটা আঙুল, আমারও তাই।'

নরহরি বলেছিল, 'কাকারও দশটা আঙুল', কার্যক্ষেত্রে মনে হলো কাকার বুঝি দশদশে একশোটা আঙুল। নইলে কাকা একা শুধু দুটি হাতে সমগ্র যজ্ঞিটা বাগিয়ে ধরে কি করে?

রেঁধেছে কাকা, পাত করেছে কাকা, ডাক দিয়েছে কাকা, এখন নেচে কুঁদে পরিবেশন করে বেড়াচ্ছে কাকা। মাংসর হাঁড়িটা বয়েও নিয়ে এল একা কাকা।

অবিশ্যি এনে যখন নামালো, তখন কাকার চেহারা দেখে মনে হলো যেন

কুমকুম

শ্মশানে মড়ার খাট বয়ে এনে নামালো। গায়ে ঘাম, ঠোঁট খড়ি ওঠা, চুল উস্কো, কোমরে গামছা বাঁধা।

তার পর সেই মাংস ইয়া বড় হাতায় করে তোলে আর পাতে ফেলে ফেলে দিয়ে বলে, 'খা বাবা খা। কবজি ডুবিয়ে খা। তোদের জন্যেই আমি—বলি রান্নাটা ভাল হয়েছে তো। সেদ্ধ ভাল হয়েছে?'

নরহরির যাবতীয় বন্ধুর দল সমস্বরে বলে ওঠে, 'তুলো তুলো!'

'শুনলি? শুনলি নরা?' নরহরির কাকা ভাইপোর দিকে বিজয় গৌরবের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'তোর আগের পক্ষের দিদি শাশুড়ীর কেদারবদরী ফেরার অপেক্ষায় থাকলে হতো এটি? ছাগল পেকে থোড় হয়ে যেতো। হুঁ বাবা! আর কালো বউ ফরসা বউ—ওসব হলো ললাটের লিখন। ঘরের ভেতর তুমি কয়লার ছাই কি আলকাতরার টিন নিয়ে ঘর করলে ক্ষেতি হচ্ছেনা কিছু।.....কিন্তু বিয়ের ভোজটি ভাল না হলে? অপযশ, মনোকষ্ট, লোকলজ্জা!'

মাংসের হাঁড়িটা বয়েও নিয়ে এল একা কাকা। [পৃষ্ঠা ১৩৮

———

মজার জিনিস

অপরাধের মধ্যে বলে ফেলেছিলাম, 'একঘণ্টা লক্ষ্মীছেলে হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারিস তো একটা মজার জিনিস দেব।'

অতিষ্ঠ হয়েই বলেছিলাম, নইলে ছোট ছেলেকে লোভ দেখিয়ে কাজ বাগানো আমার দুচক্ষের বিষ। মিঠুর মা যখন তখন ছেলেকে নানাবিধ লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে বশে আনতে চেষ্টা করে। দেখে আমিই বরং লম্বা লেকচার দিই।

এইসব লোভ দেখানো থেকেই যে তাদের মনে লোভের, দুর্নীতির, অন্যায় বাসনার সৃষ্টি হয়, এসব বিশদ বুঝিয়ে ছাড়ি ছোট মামীকে। অথচ সেই আমিই—

কিন্তু কী করব?

'নিরুপায়' বলে একটা কথা আছে তো? বাড়িসুদ্ধু মহিলারা গেলেন ম্যাটিনী শোয় সিনেমা দেখতে, মিঠু রইল আমার হেফাজতে! আর—অবিশ্যি এ হচ্ছে আমার স্বখাত সলিল।

আমিই মহত্ত্ব দেখিয়ে বলেছিলাম, 'থাকুক। থাকুক—আমার কাছে।'

কুমকুম

নিজের ওপর রীতিমত আস্থা ছিল, ছোট ছেলেকে অবলীলায় কায়দা করতে পারি। তাই এই নির্বুদ্ধিতা।

দিদিমা বলেছিলেন, 'বলছিস তো রাখব, পারবি ?'

'না পারবার কি আছে ?' বলে মিঠুকে তুলে কাঁধে চাপালাম।

হায় তখন কি জানি কী কাজ করলাম ? কী ভার কাঁধে নিলাম ?

বাড়িতে সকলের মাঝখানে থাকে, ঠিক অনুধাবন করতে পারি না।···এ একেবারে নির্জন নিরালায় শুধু আমি আর মিঠু।

আর ?

আর বাড়ির সমস্ত কাচের বাসন, শিশি-বোতল, ঘড়ি পেন বই কাগজ, মহিলাদের স্নো পাউডার ক্রীম সিঁদুর আলতা, চাকরের ঝাঁটা ন্যাতা ঝাড়ন, ঝিয়ের বাসন মাজবার শালপাতা, কয়লাভাঙা হাতুড়ি।

না আরও সব ছিল বইকি।

ছিল দিদিমার পুজোর আসন, কোষা-কুষী, পেতলের গিরিধারী।···অবিশ্যি বাকী সব নাম আমার মনে আসছে না এখন।

মোটকথা মিঠু আর আমি একা থাকার মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আবিষ্কার করলাম বাড়িতে এত জিনিস আছে। 'আছে', মানে—'ছিল'। এখন আর নেই। নেই তার কারণ ওরা চলে যাবার পরই আমি স্নেহপরবশ হয়ে মিঠুকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়ে, একখানি ডিটেক্‌টিভ গল্প নিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

ধারণা করতে পারিনি দু'বছরের ছেলেটা আসলে একটা ষাট মাইল স্পীডের দুতলা বাস। 'মুডে' থাকলেই সে ওই স্পীডে আছে।

ডিটেক্‌টিভ গল্পটা আর শেষ হল না। হবেও না কোনদিন। কারণ ওর শেষটা 'শেষ' হয়ে গেছে। নৌকো তৈরির জন্যে আমার হাতের বইটার শেষ পাতাগুলোই সবচেয়ে উপযোগী মনে হল মিঠুর !

ওদের সিনেমার আড়াই ঘণ্টার মেয়াদের আধঘণ্টার মধ্যেই ঘটে গেল এসব।

কুমকুম

ওই দু বছরের ছেলেটার জন্যে—'দুরন্ত দুর্দাম দুঃশাসন দুঃসহ দুর্বার দুর্ভাবনা দুরাত্মা দুর্নিবার' ইত্যাদি করে 'দু' দিয়ে যত শব্দ আছে, সবই প্রায় আউড়ে ফেললাম, কিন্তু কাজ কিছু হল না।

তবে ?

চোখের ওপর দেখছি ভাঙল বলে হাত পা মাথা, গেল বুঝি ছেঁচে নাক মুখ চোখ, পড়ল বুঝি ঘরের দেওয়ালগুলো, নামল বুঝি ঘরের ছাত, কী করে তবে নিজের নীতিতে অচল থাকব ?

যে নীতি বলে—মারব না। লোভ দেখাব না !

তোমরা হয়তো ভাবছ এসব আমার অত্যুক্তি। পঞ্চাশটা কুকুর তেড়ে আসার মতই ব্যাপার, কিন্তু তা নয় ! আমার বরং মনে হচ্ছে—কিছুই বলা হল না।

মিথ্যে বলব না, কষে একটা থাপ্পড় দিতে উঠিয়েছিলাম হাত। ভেবেছিলাম—ভাগনেকে মারলেই শুনেছি হাতকাঁপা রোগ হয়, কিন্তু মামাতো ভাইকে মারলে ? না শুনিনি কিছু, তবে মারতে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল।

ওরা তো তা হলে বলবে 'ছি ছি, মাত্র দুটো ঘণ্টা সামলাতেই এত অধৈর্য ? তুই আবার ছেলে পিটোনো নিয়ে লেকচার দিস ?'

মারা হল না।

লোভই দেখালাম।

কোন রকমে একবার ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখে বললাম, 'তুই যদি একঘণ্টা চুপ করে বসে থাকিস, একটা মজার জিনিস দেব।'

ঝপ্ করে স্থির হয়ে গেল মিঠু।

চোখ বড় বড় করে বলল, 'কী দেবে ?'

'বললাম তো মজার জিনিস।'

'মজার জিনিস। কী মজার জিনিস ?'

আমি তখন মরিয়া। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা মাত্র না করে বলে যাচ্ছি—'যখন দেব দেখতে পাবি।'

'চুপ করে বসে থাকব ?'

'হ্যাঁ। একঘণ্টা।'

মিঠু হঠাৎ বসে পড়ল। মাটিতেই বসে পড়ল। দুটো পা যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে।

মনে মনে খুব খানিকটা খুশির হাসি হেসে নিলাম নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। যাক এখন কিছুক্ষণের মত নিশ্চিন্দি। এরপর, ওরা এসে পড়লে, একবার দোকানে বেরিয়ে প্রকাণ্ড একখানা ক্যাডবেরি চকোলেট এনে দিতে হবে—যা মিঠুর সবচেয়ে প্রিয়। অথচ ছোট মামী আদৌ খেতে দিতে চায় না, খিদে নষ্ট হয়ে যাবে বলে।

ভাবলাম ছোট মামীকে শাসন করে দিতে হবে যাতে না ছেলের হাত থেকে 'অত বড় খাসনি' বলে কেড়ে নেন।

বইয়ের পাতায় মনঃসংযোগ করতে যা দেরি, মিঠু ডাক দিল, 'ছোটুদা, একঘণ্টা হয়েছে ?'

না, আধ কথার দিক দিয়ে যায় না মিঠু। শুধু 'ট'কে 'ক' আর 'ঘ'কে 'ধ' বলে। এই ! তা সে শুনতে গেলে কানে তত ধরা পড়ে না।

আমি হেসে উঠলাম।

'আরে পাগলা, একঘণ্টা কি রে ? সবে তো এক মিনিট।'

আমার বইয়ের নায়কের তখন অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গিন। চোর-ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভকে তখন পুলিসে ঘেরাও করে, তার মুখের সামনে রিভলভার বাগিয়ে ধরেছে। আর ডিটেক্‌টিভ-বেশী চোর বুক ফুলিয়ে পুলিসের বড় কর্তার সঙ্গে কথা বলছে।

এই ভয়ংকর সময়ে আবার ডাক, 'ছোটুদা, হয়েছে ?'

'এই সেরেছে। এখন ঢের দেরি যে। চুপ করে বসে থাক, নইলে পাবি না।'

মিঠু সেই ছড়ানো পা দুখানা নিয়েই যতটা সম্ভব চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে থাকে। তবে বসে থাকে ঠিকই। কিন্তু নীরবে নয়—প্রতি মিনিটে প্রশ্ন করে, 'ছোটুদা, হল ?'

আমার ডিটেক্‌টিভ (অর্থাৎ চোর-ছদ্মবেশী) তখন কাটা-কাটা ধারালো-ধারালো

কুমকুম

বিদ্রূপবাণীতে পুলিস সাহেবকে ধুলোর অধম করছে। মিঠু প্রবল বিক্রমে ডেকে উঠল —'ছোটুদা, হয়ে গেছে ?'

'আরে বাবা থাম। বলছি হয়নি।'

···ডিটেক্‌টিভ-বেশী চোর গটগট করে চলে যাচ্ছে, মোটর ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়—

'ছোটুদা, মজার জিনিস দাও। অ ছোটুদা !'

বই মুড়ে ফেলে নিঃশ্বাস ফেললাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মাত্র সাত মিনিট হয়েছে। এর মধ্যেই তো অতিষ্ঠ করে তুলছে। এক ঘণ্টার আশা কবি-কল্পনা।

দূর হোক বাবা, দিয়েই নিই আগে, বসে বসে খাক, আমিও বইটা শেষ করে বাঁচি।

মিঠুকে কোলে নিয়ে দোকানে গেলাম।

'সবচেয়ে বড় চকোলেট—'

'নে এই নে মজার জিনিস।' বলতে যা দেরি।

বই মুড়ে ফেলে নিশ্বাস ফেললাম।

মিঠু মুহূর্তে উপঢৌকনটি আবেগে পথের ধুলোয় আছড়ে ফেলে দিয়ে সগর্জনে বলে উঠল, 'ও কী মজার জিনিস ? ও তো চকোলেট।'

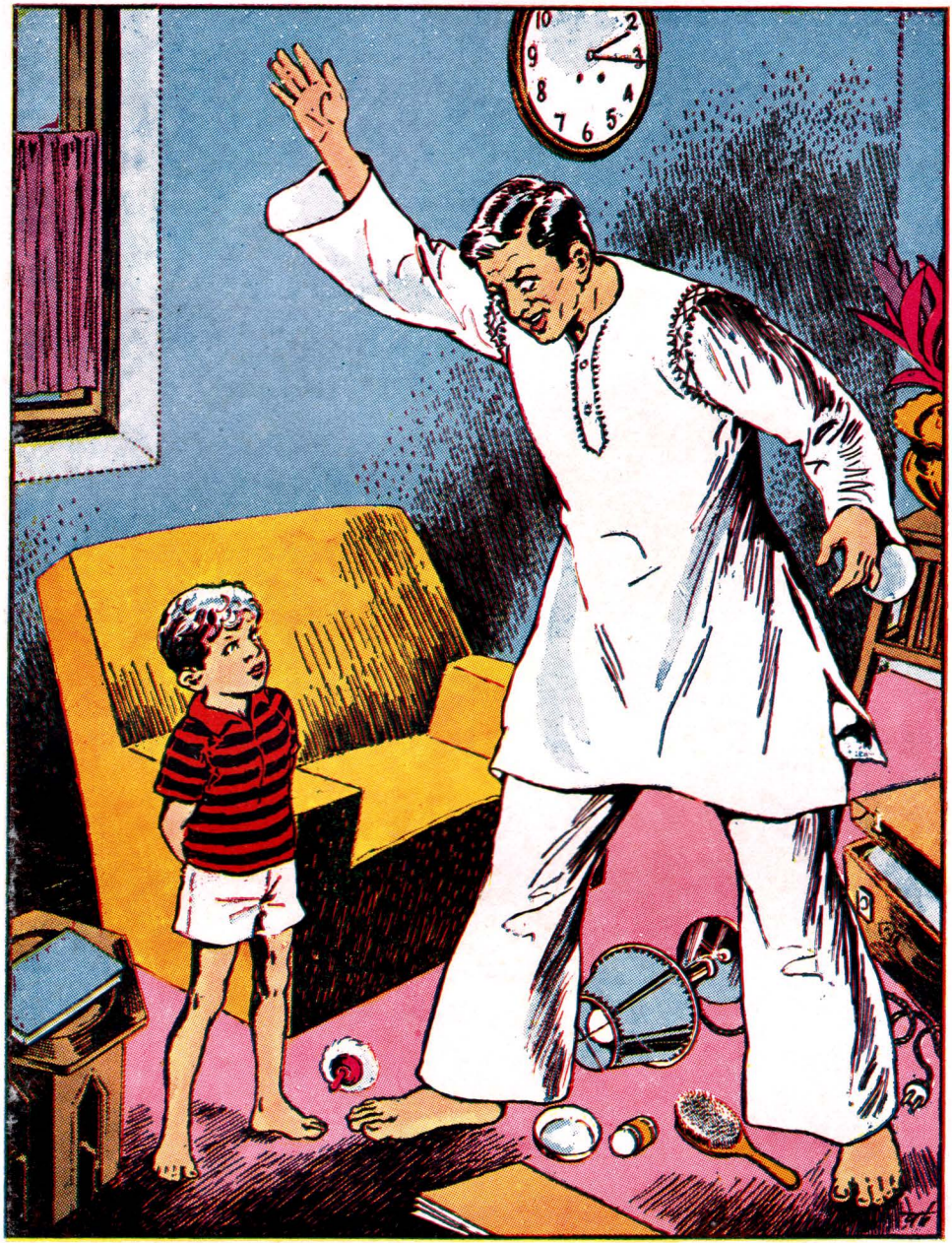

মিথ্যে বলব না, কষে একটা থাপ্পড় দিতে উঠিয়েছিলাম হাত

[পৃঃ ১৪২

কুমকুম

চকোলেটখানার এ হেন দুর্দশা দেখে মনটা অবশ্যই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল না। তবু নত হলাম, 'তবে কী নিবি বল? লজেন্স?'

'না, লজেন্স বিচ্ছিরি। মজার জিনিস দাও।'

'বিস্কুট? বিস্কুট খাবে তা হলে মিঠু বাবু, তাই না? কি বিস্কুট বল তো বাবু? ক্রীম? সার্কাস? কুচো নোনতা—'

'না—আ আ—' মিঠু হাত-পা ছোড়া শুরু করে দিল, 'মজার জিনিস নেব।'

দোকানটা স্টেশনারি।

হরেক রকম মজার জিনিসেরই বাজার।

অগত্যা চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে যাকে বলে অবলোকন করে নিই। কী নেব ওই বিচ্ছুর জন্যে?

'বল? কাঠের ঘোড়া? তুলোর হাতি? প্ল্যাস্টিকের খরগোশ? বাঁশি? ঝুমঝুমি? লাল ছড়ি? বলি, তা হলে এইটা?'

কিন্তু কোথায় কি?

মিঠু ততক্ষণে নিজমূর্তি ধরেছে—'নেব না! ও নেব না! বিচ্ছিরি! মজার জিনিস দাও।'

'আরে বাবা এই তো সব মজার মজার জিনিস। নিবি না কেন?'

'ও বিচ্ছিরি! ও ছাই! ও পচা!…মজার জিনিস—'

চারখানি হাতপায়ের সাহায্যে যতটা বিদ্রোহ প্রকাশ সম্ভব, তা প্রকাশে ত্রুটি করে না মিঠু।

'তোমায় কামড়ে দেব…তোমার চুল ছিঁড়ে দেব,…তোমার নাক ভেঙে দেব… তোমাকে লাঠি দিয়ে মারব…মজার জিনিস দিচ্ছ না।'

দোকান থেকে পালিয়ে আসতে পথ পাই না। কোন রকমে সেই মাথা-'চাল্লি'-করা আর হাতপা-ছোড়া ছেলেকে বাড়িতে এনে ফেলি।

'মিঠু লক্ষ্মী ছেলে, এই নাও।'

কুমকুম

এগিয়ে দিই আমার সাধের ক্যামেরাটা—যেটা নাকি মিঠু কেন, মিঠুর বাবা হাত দিতে এলেও কেড়ে নিতে দ্বিধা করি না।

কিন্তু এখন প্রাণরক্ষার দায়। নিক—ভাঙুক। আছড়ে কুচিকুচি করুক।

হরি হরি! মিঠু ফিরেও তাকাল না: শুধু বলল, 'ও তো ক্যামেরা। মজার জিনিস কই?'

এগিয়ে দিই ফিলিমের খালি কৌটো—যার জন্যে কাড়াকাড়ি লাগায় মিঠু। কিন্তু আজ মিঠু আমার সঙ্গে পূর্বজন্মের শত্রুতা সাধছে।

'ও তো কৌটো—'

পাগল হয়ে উঠি।

ঘড়ি, আংটি, চশমার খাপ, মানিব্যাগ, ফাউন্টেন পেন, সেফটি রেজার, ছুরি, কাঁচি যা সামনে পাই তাই তুলে ধরি—'এই নে। নে মজার জিনিস, পাজী শয়তান বিচ্ছু বুনো।'

এগিয়ে দিই আমার সাধের ক্যামেরাটা।

মিঠু অবিচলিত।

'ও তো ঘড়ি।

ও তো আংটি।

ও তো কাঁচি।

ও তো ছুরি।

ও তো দাড়ি-কামানো।

ও তো কলম।

ও তো টাকা।...মজার জিনিস দিচ্ছ না তুমি। তোমাকে আকাশে পাঠিয়ে দেব... তোমাকে সমুদ্দুরে ফেলে দেব। রাক্ষস, খোক্কস, ভূত! মজার জিনিস দেবে বলে দেয় না।'

কুমকুম

ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। শুধু 'জিনিস' খুঁজতেই নয়—উদ্দাম মিঠুর মার খেতে খেতে।

'মিঠু রসগোল্লা খাবি ?'

'না—আ—আ।'

'মিঠু, নতুনদির রঙের বাক্স নিয়ে ছবি আঁকবি ? মিঠু—'

'না আ, আ। মজার জিনিস ! মজার জিনিস !'

উন্মাদ হয়ে উঠি। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠি।

ভবিষ্যৎ ভাবি না।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কোন কিছু নিয়েই চিন্তা করি না। শুধু সমস্ত বাড়িটা তচনচ করে, মানে মিঠুর তচনচের পরেও যতটা যা অবশিষ্ট ছিল তা থেকে—শুধু 'জিনিস' সংগ্রহ করি আর বলি, 'এই নে। এবার দেখছিস তো ?'

কিন্তু মিঠু অন্ধ, মিঠু কানা।

শুধু মিঠু সবজান্তা।

'ও তো টচ্‌···ও তো টেতিস্‌কোপ···ও তো থার্মোমিটার···ও তো—'

'ওরে শয়তান, ভূত, মামদো, বেহ্মদত্যি, চুল ছাড় বলছি—'

'মজার জিনিস···'

'ওরে মিঠু, দত্যিকুলের পেল্লাদ, আমার মামাদের বাপের ঠাকুর চোদ্দ পুরুষ, বংশের বাতি, শিবরাত্তিরের সলতে, সগ্‌গের পিদ্দিম, কী নিবি তাই বল ! বল তুই ! দেখি তুই কী চাস ! বল কি নিবি ?'

'মঁজাঁর জিঁনিঁস !'

মিঠুও আমলে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, এলিয়ে যাচ্ছে। চুলের মুঠোটা ধরার মধ্যে জোর কমে আসছে···তবু সংকল্পে অটুট মিঠু।

'মজাঁর জিঁ ই—ই স।'

আর কিছু নেই বাড়িতে।

কুমকুম

মিঠুর হাতে ধরে দেবার মত আর কিছু নেই। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সবে হাত বাড়িয়েছি। ভগবান! পৃথিবীতে এত জিনিস দিয়েছ মানুষকে। শুধু এতটুকু এক তিল মজার জিনিস দিতে পারনি?

আর তো মার খেতে পারা যাচ্ছে না।

আর কী চেষ্টা করব?

তবু দেখছি খাটের তলা, উঁকি মারছি আলমারির উঁচু মাথায়।...

কী এখানে? একটা ভাঙা নরুন, একটা মরচে-ধরা গুনছুঁচ, কার একটা পুরনো মাদুলি, একখানা সমুদ্রের ঝিনুক...পেড়ে নিই সেটাই। গম্ভীর মুখে বলি 'মিঠু, আর নয়! এই নাও তোমার মজার জিনিস—'

হঠাৎ ঝপ করে স্থির হয়ে গেল মিঠু।

লাল চোখ দুটো তুলে বলল, 'মজার জিনিস?'

'হ্যাঁ তাই তো।'

মিঠু চোখ চকচকে করে ফেলল। পরমাগ্রহে সেই ঝিনুকখানা, খুব সম্ভব যেটা দিদিমার কোনও এক গ্রীষ্মের দিনের ঘামাচি মারার, সেটা নিয়ে উলটেপালটে দেখল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। তারপর—উঠে এসে রীতিমত অপরাধ মোচনের ভঙ্গিতে বলল, 'ছোটুদা, আর মারব না।'

মিঠুর এই দুবছর বয়সের মধ্যে হাজার জিনিসের চেহারা চিনে ফেলেছে মিঠু, শিখে নিয়েছে হাজার জিনিসের নাম।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে শুধু—মানে আমার ওপর অনুগ্রহে, দেখে ফেলেনি সমুদ্রের ঝিনুক।

দেখেনি বলেই শেষ পর্যন্ত একটা মজার জিনিস দিতে পারা গেল মিঠুকে। হোক তুচ্ছ, যা অদেখা অচেনা, নাম-না-জানা, তাই তো মজার।

শুধু দুবছরের মিঠু কেন, এই পৃথিবীসুদ্ধু লোক তো ঐ মজার জিনিসের বায়না নিয়েই ছুটোছুটি করে মরছে। ভাল মন্দ দামী অদামী ভাবছে না।

———

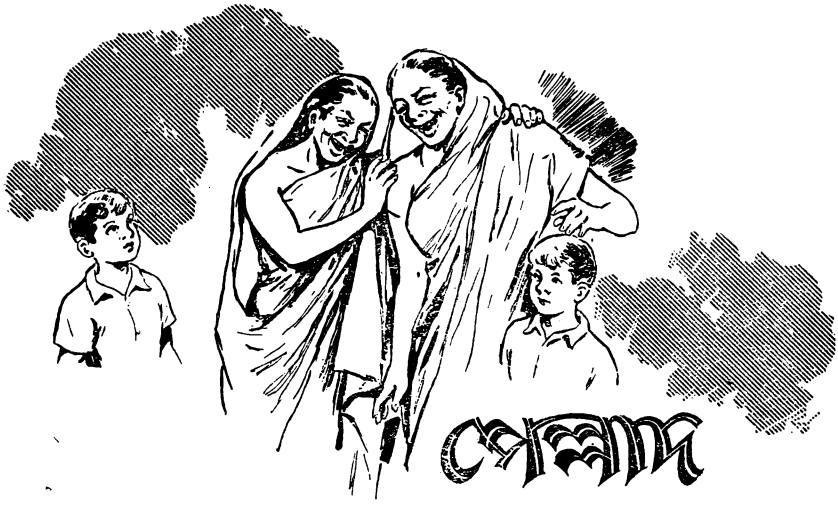

পেল্লাদ

সক্কালবেলা দু বাড়ির গিন্নীতে হয়ে গেল এক পালা। সমীরের ঠাকুমা আর অমলের দিদিমাতে। ফ্ল্যাটবাড়ির এই এক অসুবিধে! রাতদিন পাশাপাশি, অতএব ঘেঁষাঘেঁষি। আর মানুষের যা স্বভাব, বেশী ঘেঁষাঘেঁষি হলেই বেজায় মেশামিশি, তারপর দারুণ রেষারেষি!

আর শেষ পর্যন্ত দাঁতে পেষাপেষি।

সমীরের ঠাকুমা আর অমলের দিদিমাও মানুষ ছাড়া আর কিছু নন। শেষ পর্যন্ত শেষ অবস্থাটা হয়ে গেল আজ ওঁদের।

অথচ এই কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত দুই বান্ধবীতে গলায় গলায় ছিল! এই বাসাতে এসেই হয়েছিল ভাব! ওঁরা বলেছিলেন, 'ফ্ল্যাটবাড়ির এই এক সুবিধে। গিন্নীতে গিন্নীতে ভাব হবার বেশ একটি জায়গা আছে।'

জায়গাটি আর কিছুই নয়, ওই সিঁড়িটি।

এই সিঁড়িই ওঁদের ক্লাব, পার্ক, গঙ্গার ঘাট। সত্যি হরঘড়ি তো যেতে পাচ্ছেন না ওসব জায়গায়! কর্তাদের অফিসবন্ধু আছে, মেয়েছেলেদের কলেজ-বন্ধু আছে,

আর ছোটগুলোর আছে 'ইস্কুলের ছেলেমেয়ে'। বউদেরও সমিতি আছে, সিনেমা আছে, কিছু না-হোক বাপের বাড়িও আছে। কিন্তু গিন্নীদের ?

গিন্নীদের কি আছে ?

সংসারের কাজকর্ম সেরে পাড়া বেড়াতে বা গঙ্গা-নাইতে গেলেন তো, বান্ধবী জুটলো। নইলে থাকো মুখে তালাচাবি দিয়ে। সেকাল নয় যে বুড়ীদের বকবকানি সহ্য করবে লোকে। বকলে চাকরবাকররা তক্ষুণি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আর নাতিপুতিরা উলটে একশো কথা শুনিয়ে দেবে। অতএব তালাচাবিই ভালো।

এখানে এসে ওই তালাচাবির কষ্টটা ঘুচেছিল। সিঁড়িতে যেতে আসতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুই বুড়ী আদি-অন্তের গল্প জুড়তেন। অন্নসমস্যা, অর্থসমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, সমাজ-সমস্যা, দেশের দুর্নীতি-সমস্যা, আর শাসন-সমস্যা, কিছুই বাদ পড়তো না তাঁদের সেই সিঁড়ি ক্লাবের অধিবেশনে।

ওই সমস্যা-সংকটের সূত্রেই আলাপ গাঢ়। 'আপনি' থেকে 'তুমি'। তারপর—সেই বেদম মেশামেশি, যে মেশামেশির ফলে এ বাড়ির রান্না তরকারি ও বাড়ির লোক খায়, ও বাড়ির লোক এ বাড়ির চায়ের টেবিলে এসে বসে। এদের বাড়িতে বড় মাছ এলে, কেটে ওদের দেওয়া হয়, ওদের বাড়িতে তত্ত্বর মিষ্টি এলে, এদের ঘরে অর্ধেক চলে আসে।

গিন্নীতে গিন্নীতে ভাবটা ক্রমশঃ ছোঁয়াচে অসুখের মত সকলকে এসে আক্রমণ করে ফেলে।

সমীরের আর অমলের বাবাতে বাবাতে, মাতে মাতে, দাদাতে দাদাতে, আর দিদিতে দিদিতে দিব্যি জমে ওঠে।

বাবারা দুজনে দাবা খেলেন, মায়েরা একত্রে সিনেমা যান, দাদারা একসঙ্গে খেলা দেখতে, আর দিদিরা একসঙ্গে রবীন্দ্র সংগীত শিখতে যায়। তাদের মধ্যে একদিন একজনের কোনো কারণে কামাই হলে, অপরজন স্বরলিপি তুলে এনে তাকে দেয়। দাদাদের মধ্যে একজন কোনে কারণে খেলা দেখতে বা বেড়াতে যেতে না পারলে, অপরজন যায়ই না।

কুমকুম

মায়েরাও একজন যদি কোথাও থেকে বোনার প্যাটার্ন শিখে আসেন তো তক্ষুণি অন্যজনকে শেখাতে আসেন, 'অন্যজন' একটা রান্নার বই কিনলে তক্ষুণি ওঁকে সেটা ধার দিতে যান।

মোটকথা কেউ কারুকে বাদ দিয়ে কিছু করার কথা ভাবতেই পারে না। দুটি পরিবার যেন একটিই সুখী পরিবার।

আর সমীর আর অমল ?

তাদের তো কথাই নেই।

তাদের তো ঠাকুমা কোম্পানির ভাব হবার আগেই ভাব হয়ে গেছে গল্পের বই চাওয়ার মাধ্যমে। তার উপর আবার এ পাড়ায় আসার পর দুজনে একই স্কুলে ভরতি হয়েছে, একই ক্লাসে। এক সঙ্গেই যাচ্ছে আসছে। অতএব এক হরিহর আত্মা !

যেন কানাই বলাই ! যেন গৌর নিতাই ! যেন শ্রীদাম সুদাম।

অর্থাৎ কাল সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তাই ছিল। হঠাৎ ওই সন্ধ্যাকালেই হয়ে গেল এক খণ্ড-প্রলয়। হলো কিন্তু একটা তুচ্ছ কারণেই। সমীরের জন্মদিনে পাওয়া মামার দেওয়া একটা গল্পের বই অমল পড়তে নিয়ে গিয়ে নাকি একফোঁটা কালি লাগিয়ে ফেলেছিল, বিপত্তি সেই থেকে।

সমীর হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, 'কালি লাগিয়েছিস কেন ?'

অমল থতমত খেয়ে বললো, 'লাগাই নি তো, লাগানোই ছিল।'

মিথ্যে কথাই বললো অবশ্য।

ভয়েই বললো।

যদি সাহস করে বলতো, 'লেগে গেছে ভাই, রাগ করিস নি', তা হলে হয়তো সেখানেই মিটে যেত ব্যাপারটা, কিন্তু ওই ভয়টাই 'কাল' করলো ! সমীর এহেন একটা ডাহা মিথ্যে কথায় আরো রেগে চোখ পাকিয়ে বললো, 'লাগানোই ছিল ? চালাকি পেয়েছিস ? মিথ্যুক ! আমার সুন্দর বইটা দেখে হিংসেয় মরে গিয়ে ইচ্ছে করে কালি লাগিয়েছিস তুই !'

এরপর অবশ্য অমলও চোখ পাকাবে।

কুমকুম

কে পারে এত অপমান সহ্য করতে ? তা আবার প্রাণের বন্ধুর কাছে !

অমল চোখ পাকিয়ে বললো, 'ওঃ ইচ্ছে করে লাগিয়েছি ? তা তাই লাগিয়েছি। বেশ করেছি, কী করবি ?'

এ যুগের ছেলেরা কথায় হারে না।

তা ছাড়া তারা আছে তো ভোলানাথ, হলো তো ভৈরব। আছে তো শিব, হলো তো রুদ্র !

অতএব সমীর বলে উঠলো, 'তোর ঘাড় ধরে আর একটা বই আদায় করবো !'

'ঈস্ ! আমার ভারী দায় পড়েছে ! একফোঁটা কালি লেগেছে বলে, আবার, কিনে দেব ! আর কিছু না ?' অমল সাহসের সঙ্গে বললো। এখন সাহস বেরোলো।

সমীর গর্জন করলো, 'কেমন না দিস দেখবো !'

অমল ব্যঙ্গ করলো, 'কেমন নিতে পারিস দেখবো।'

'হ্যাংলা পাজী বিচ্ছিরী, পরের বই চেয়ে পড়ে ! পড়বার এত শখ তো কিনে পড়তে পারিস না ?'

'তুইও তা হলে হ্যাংলা পাজী বিচ্ছিরী, আমার কত বই চেয়ে চেয়ে পড়েছিস।'

'আমি তোর বইয়ে কালি লাগিয়েছি ?'

'আমিও তোর বইতে কালি লাগাই নি।'

'তবে কালি এলো কোথা থেকে ?'

'তুই নিজে লাগিয়ে আমার নামে দোষ দিচ্ছিস।'

'কী বললি, নিজে মিথ্যে কথা বলে, আবার আমার নামে দোষ ?' সমীর আর সামলাতে পারে না নিজেকে, লাগিয়ে দেয় একটা ঘুষি, প্রাণের বন্ধুর পেটে।

বলাই বাহুল্য, অমলও ছাড়ে না।

দিয়ে দেয় এক ঘা বসিয়ে।

তারপর দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে গিয়ে লাগায়, 'অমল মেরেছে।'... 'সমীর মেরেছে।'

মেরেছে !

শুনে তো ওপরওলারা 'থ' !

মেরেছে মানে ?

হয়েছিল কি ?

কি হয়েছিল বলতে গিয়ে দুজনেই বোঝে আসলে কিছুই হয় নি। বলতে গেলে নিজেরাই বকুনি খাবে। তাই দুজনেই একটু রং চড়ালো।

না চড়ালে বিপদ বলেই চড়ালো।

সমীর বললো, 'আমি শুধু বলেছিলাম, "কালি লাগলো কি করে রে ?" তাই না শুনে ও আমাকে "মিথ্যুক পাজী, নিজে লাগিয়ে আবার কথা বলতে এসেছে", বলে ঠাঁই ঠাঁই করে মেরে দিল।'

অমল বাড়িতে এসে বললো, 'ওর বইতে একটু কালি লাগা ছিল, আগেই দেখেছি। তবুও হঠাৎ ও আমায় দমাদ্দম পিটিয়ে দিয়ে বললো, "হিংসে করে আমার মামার দেওয়া বইতে কালি লাগিয়ে দিয়েছিস।" '

তারপর এও বললো, 'বলেছে "হ্যাংলা ! পরের বই চেয়ে পড়ে ! তোর বাবার বুঝি পয়সা নেই ? বই কিনে পড়তে পারিস না ?" '

এরপর আর অমলের বাবার মুখ গম্ভীর হবে না ?

উনি বললেন, 'কী বই ?'

'ঘনাদার গল্প।'

'ওঃ। ঠিক আছে। কাল একটা কিনে এনে দিয়ে দিও তোমার প্রাণের বন্ধুকে। তোমার মার কাছ থেকে যা টাকা লাগে নিয়ে নিও।'

অমলের মা বললেন, 'আশ্চর্য ! সমীরটা ভেতরে ভেতরে এত শয়তান ? দেখায় যেন ভিজে বেড়ালটি !'

এই দুদিন আগেই যে এই ভিজে বেড়ালকে তিনি 'সোনার চাঁদটি' বলেছেন, তা আর মনে থাকে না। অমলের দিদিমা পূজো করতে করতে শুনছিলেন গোলমাল, তাড়াতাড়ি পূজো সেরে নিয়ে এসে বাজখাঁই গলায় বলেন, 'কী হয়েছে রে ? কে কাকে মেরেছে ?'

কুমকুম

অমলের বাবা গম্ভীর গলায় বলেন, 'আপনার বান্ধবীর সোনার চাঁদ নাতিটি মেরেছেন আপনার নাতিকে।'

এখন আর 'ওর বন্ধু ওকে মেরেছে,' কি 'আমার বন্ধুর ছেলে আমার ছেলেকে মেরেছে', তা বললেন না। এমন ভাব দেখালেন যেন দু বাড়ির কেউ কাউকে চেনে না, যত নষ্টের গোড়া ওই বুড়ীরা!

অমলও তড়বড় করে 'সত্য ঘটনাকে' আর একটু বর্ণবহুল করে দিদিমাকে শুনিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'তোমার ওই বন্ধুটিও কম নয় দিদা। আমার দিকে যা করে তাকায়! একদিন সিঁড়িতে ছুঁয়ে ফেলেছিলাম বলে কী রাগ!...বলে কি না "রাতদিন মুরগী খাচ্ছিস, মাংস খাচ্ছিস, ছুঁলি যে?" '

অমলের দিদিমা নিজেও অবশ্য এহেন কথা রাতদিনই বলেন, কিন্তু এখন রেগে গেলেন। বললেন, 'বটে! আর ওঁর নিজের নাতি যখন বিছানায় বসে ডিমসেদ্ধ খায়? তোমাদের রাগ বেশী—তাই বলি না, নইলে ওদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে কাপড় ছাড়া উচিত। বিচার-আচার কিছু আছে ওদের? পুরো ম্লেচ্ছ!'

অমলের মা বলেন, 'তাছাড়া অহংকারীও কম নয়! এই তো সমীরের মা, আমাদের যেন মানুষই ভাবে না! সর্বদা বলে, "এ আর তোর দ্বারা হয়েছে? এ আর তুই শিখতে পেরেছিস!" '

ক্রমশঃই কথায় কথা বাড়ে, অমলও তাতে দিব্যি ফোড়ন কাটতে থাকে! আজ আর মা পড়তে বসবার জন্যে তাড়া দেন না, কাজেই ব্যাপারটা মন্দ লাগে না অমলের।

তার ঘুষিটা একটু বেশী জোর হয়ে গিয়েছিল মনে হচ্ছে, বেদম লেগেছে বোধ হয় সমীরের, কিন্তু অমলের কি দোষ? সমীরই তো আগে মেরেছে!

ওদিকেও ঘটনা প্রায় একই।

সমীরের বাড়ির সবাই যখন শুনলো, বেচারা সমীর শুধু একবার জিগ্যেস করেছিল 'কালি লাগলো কি করে ভাই?' তাতেই অমল পাজীটা ওকে দুদ্দাড়িয়ে মেরেছে, তখন তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন তাঁরা। তার ওপর সমীরের মা যখন

দেখলেন তাঁর দাদার ভাগনেকে দেওয়া বইটার একটা পাতাও সাদা নেই, অত বড় বইটা আগাগোড়া কালিতে জোবড়ানো, তখন মুখটা তাঁর লাল আর কাঠ হয়ে গেল।

সমীরের দিদি একবার জিগ্যেস করেছিল, 'পাতাগুলো এখনো ভিজে ভিজে কেন রে?'

সমীর অম্লান বদনে বলেছিল, 'ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে কালি তুলতে গিয়েছিলাম রে দিদি! কী রকম কালি ঢেলেছে দেখেছিস? উঠল না।'

আর একবার কেঁদে ফেললো সমীর।

'ওই অমল ছেলেটি হচ্ছে একের নম্বরের বদ!' বললেন সমীরের মা।

'ওদের বাড়ির কেউ ভালো না, সব বিচ্ছু।' বললেন সমীরের বাবা।

তোমার ওই বন্ধুটিও কম নয় দিদা! [পৃষ্ঠা ১৫৪

সমীরের দাদা আর দিদি মনে মনে ভাবলো, 'অতটা না হলেও, খুব সাদাসিধে কেউ নয়, আছে প্যাঁচ!'

আর, কি কি প্যাঁচ আছে তাই ভাবতে বসলো।

সমীরের ঠাকুমা অনেকক্ষণ গুম থেকে বললেন, 'আচ্ছা, আসুক সকাল।'

আর সেই সকাল আসতেই হয়ে গেল এক পালা।

ঠাকুমা দিদিমাকে বললেন, 'তোমার নাতিটি তো সোজা ছেলে নয় অমলের দিদিমা! চেয়ে হ্যাংলামি করে সমীরের মামার দেওয়া বই না কি পড়েছে, ছিঁড়েছে —কালি লাগিয়েছে। আবার কি না মেরে পাট করেছে ছেলেটাকে!'

তোমার নাতিটি তো সোজা ছেলে নয় অমলের দিদিমা।

দিদিমা ঠাকুমাকে বললেন, 'আগে নিজের নাতির গুণ ছাখো দিদি, তারপর অন্যকে বলতে এসো। অতবড় অসভ্য পাজী বদ ছেলে আমি আর ভূ-ভারতে দেখিনি।'

দিদিমা বললেন, 'ধুরন্ধর ছেলে হচ্ছে তোমার নাতিটি। ওইটুকুন ছেলে, কী পাকা-পাকা কথা! বলে কি না—'

কি বলে, কি বলেছে, অথবা কি বলেনি, তাই নিয়ে লেগে যায় বচসা। বচসা থেকে প্রলয়ের পালা।

সিঁড়ি দিয়ে আরো অন্য বাড়ির যারা সব নামে ওঠে, তারা একবার করে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে নিজের কাজে চলে যায়। ঠাকুমা এবং দিদিমা ভ্রূক্ষেপও করেন না। তারস্বরে পরস্পরকে বোঝাতে থাকেন তাঁর নাতি কত অসভ্য বাঁদর ভূত!

তারপর ওপর দিকে ওঠে।

উনি যদি বলেন, 'সুশিক্ষা পেলে কি আর এমন হয়? তোমার মেয়েটি ছেলেকে

শিক্ষা-দীক্ষা তো দেয়ই না, দেয় শুধু কুশিক্ষা!' তো ইনি বলেন, 'আর তোমার বউ? সে তো ছেলেকে শুধু আদর দিয়ে বাঁদর করে।'

আরো কথা হয়।

আরো কথা হয়।

শেষ পর্যন্ত কাটান ছেঁড়ানই হয়ে যায়।

যায়।

কাটান ছেঁড়ানই হয়ে যায়। তারপর থেকে ক্রমশঃ সিঁড়িতে উঠতে নামতে কেউ কারুর দিকে তাকায় না, মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, যেন জীবনে কোনোদিন চেনা ছিল না।

তাছাড়া—এরা ওদের ছেলেকে বলে, 'এ বাড়িতে আসবি তো ঠ্যাং ভাঙবো।' ওরা এদের ছেলেকে বলে, 'এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোবি তো কুকুর লেলিয়ে দেবো।'

এ বাড়ির দাদাবাবু ও বাড়ির দাদাবাবুকে দেখলে শিস দিয়ে চলে যায়, ও বাড়ির দিদিমণি এ বাড়ির দিদিমণিকে দেখিয়ে দেখিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব করে।

মোটকথা, 'পারিবারিক ঝগড়া' শাস্ত্রে যা যা আছে, সবই মেনে চলে এরা। যেমন আরো অন্যেরা করে থাকে।

সেই একটি ফোঁটা কালির দাগ, আগাগোড়া কালিমাখা করে ছাড়ে।

তবু এতটা কে ভেবেছিল?

এতখানি কে ধারণা করেছিল?

অন্ততঃ সমীরের বাড়ির কারুর মনের কোণেও এতখানি ভয়ংকর আশঙ্কার ছায়া ছিল না।

অথচ হলো তাই।

ঘটলো সেই ভয়ংকর ঘটনা। হঠাৎ ওই বাচ্চা ছেলেটাকে গুম করে ফেললো

ওরা। সকাল থেকে লক্ষ্য পড়েনি অতটা। ছুটির দিন, স্কুলে যাবে না খেলে বেড়াচ্ছে, এই ধারণা। ক্রমশঃ দেখা গেল ছেলে আর ফিরলো না।

নাওয়া খাওয়ার সময় চলে গেল।

দুটো বেজে গেল, তিনটে বেজে গেল।

'ওই ওরা ; আর কেউ নয়।' সমীরের মা কেঁদে উঠে বলেন, 'ওরাই আমার সমীরকে চুরি করে গুম করে ফেলেছে, নইলে ছেলে কোথায় যাবে ? ইস্কুলে যায়নি যে রাস্তায় বিপদ্ ঘটেছে।'

সমীরের দাদা দিদি এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাট তোলপাড় করে বেড়ায়—'সমীর এসেছে ? সমীর এসেছিল ?'

তোলপাড় করে, কারণ ওরা মার মতন অতটা বিশ্বাস করেনি। ওরা ভাবছিল, অমলের সঙ্গে তো ভাব নেই আর, বোধ হয় অন্য বন্ধু করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরাও হতাশ হলো।

ওরাও বিশ্বাস করলো মায়ের কথা। ভাবলো, ওরা সমীরকে গুম করে ফেলেছে।

ক্রমশঃই বেলা বাড়ছে, ক্রমশঃই এদের কান্না-কাটি বাড়ছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট নেই কারো। শেষ পর্যন্ত সমীরের ঠাকুমা বলে ওঠেন, 'রোসো বড় বঁটিখানা নিয়ে আমি একবার যাই ওদের বাড়িতে। বলবো, "হয় আমাদের ছেলে দে, নয়, তোদের সবাইকে কাটবো।"'

সমীরের মা কেঁদে ওঠেন, 'ওমা—আপনার পায়ে পড়ি, যাবেন না। যদি বা এখনো প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে থাকে, এরপর আর রাখবে না। তার থেকে আমি ওদের পায়ে ধরে বলি গে, "আমার যথাসর্বস্ব নাও, আমার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও।"'

'পায়ে ধরবে ?'

সমীরের বাবা চিৎকার করে ওঠেন, 'আমি এই থানায় যাচ্ছি ডায়েরি করতে। ছেলে লুকিয়ে রাখা বার করছি।'

'ওগো যদি মেরে ফেলে ?'

'মেরে অমনি ফেললেই হলো ? মগের মুলুক ?'

সমীরের বাবা গটগট করে বেরিয়ে যান থানার উদ্দেশ্যে। একটা ট্যাকসী ধরে চলে যাবেন ছুটে।

কিন্তু যাওয়া কি হলো ?

না, থানা পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।

রাস্তার মোড়েই অমলের বাবার সঙ্গে দেখা। তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাকসীর জন্যে।

সমীরের বাবা ক্রুদ্ধ-গলায় বলে ওঠেন, 'ছেলে কোথায় ?'

অমলের বাবা হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলেন, 'সেই খোঁজেই তো যাচ্ছি দাদা ! সকাল থেকে তো পাওয়া যাচ্ছে না ! আপনাকে কে বললো ?'

আমাকে কে বললো !

হতভম্ব হয়ে যান সমীরের বাবা, 'আমাকে কে বলবে মানে ? আমার ছেলে হারালো, আর আমায় বলে যাবে পাড়ার লোকে ?'

সমীরের মা কেঁদে ওঠেন, 'ওমা—আপনার পায়ে পড়ি, যাবেন না।' [পৃষ্ঠা ১৫৮

ভেবেছিলেন ওকে দেখতে পেলে জামার কলার চেপে ধরবেন, কিন্তু অমলের

কুমকুম

বাবার মুখটা দেখে মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল! এ কী ছেলে-চোরের মুখ? এ যে ছেলে-হারানো মুখ! তাই শুধু বলেন, 'আমার ছেলে হারালো আর আমায় বলে যাবে পাড়ার লোকে? আমি যাচ্ছি থানায় ডায়েরি করতে—'

অমলের বাবা আরো কাতর গলায় বলেন, 'জানি দাদা অমল আপনারও ছেলে! মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তাই আপনার সঙ্গে এতখানি মনোমালিন্য করেছি। অথচ আপনি তার জন্যে থানায় ছুটছেন! আপনি দেবতা!'

'দেবতা'র পোস্টটা নিতে অবশ্য ভালোই লাগছিল সমীরের বাবার, কিন্তু এ রকম গোলমেলে পোস্টটা নেওয়া তো শক্ত! তাই বলে ওঠেন, 'কিন্তু হারিয়েছে তো সমীর!'

'কী যে বলেন দাদা, হারিয়েছে তো আমার অমল!'

'খবরদার! হারিয়েছে আমার ছেলে!'

'দোহাই দাদা, হারিয়েছে আমার ছেলে!'

'বাজে কথা বলবেন না, হারালো আমার ছেলে, আর দাবি করছেন আপনি? আমি তো ভাবছিলাম আপনিই বুঝি—'

'উলটো-পালটা কথা বলবেন না দাদা, হারালো আমার ছেলে, আর দাবি করছেন আপনি? আমি তো ভাবছিলাম—'

'কী ভাবছিলেন?' হতাশ গলায় বলেন সমীরের বাবা!

'ভাবছিলাম আপনাদের বাড়িতেই খুঁজিগে! কিন্তু সাহস করি নি, তাই থানায় যাচ্ছিলাম।'

কাতর গলায় বলেন অমলের বাবা।

সমীরের বাবাও বলে ওঠেন, 'ঠিক তাই! আমিও ঠিক ওই কথাই ভেবেছি, আর ওই কারণেই থানায় যাচ্ছি।'

অমলের বাবা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠেন, 'তার মানে আমাদের দুজনেরই ছেলে হারিয়েছে! ও দাদা দাদাগো!'

সমীরের বাবাও তাঁর হাত ধরে ডুকরে ওঠেন, 'ও ভাই ভাইরে!'

কুমকুম

বলা বাহুল্য রাস্তায় লোক জমে যায়।

একযোগে সবাই দুজনকেই প্রশ্ন করতে থাকে, উপদেশ দিতে থাকে, সান্ত্বনা দিতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত বলে, 'বুঝেছি মশাই ছেলে ধরার ব্যাপার! কিন্তু এ অবস্থায় থানায় যাবেন না, প্রেসার বেড়ে যাবে, বাড়ি যান, একটু সুস্থ হোন তারপর যা হয় করবেন। আশ্চর্য একই দিনে দুই বন্ধুর—'

ওরাই একটা ট্যাক্সী ডেকে তুলে দেয় দুজনকে।

সত্যিই আর তখন থানায় যাবার ক্ষমতা ছিল না কারুরই।

শুধু দুজনে ভাবতে ভাবতে যায়, একই গাড়ি থেকে দুজনকে নামতে দেখলে বাড়ির লোক কি বলবে?

কিন্তু বাড়ির লোক আর বলবে কি?

বাড়ির লোক তো বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়িতে কাতার দিয়ে! দুবাড়ির সবাই। মাঝখানে সমীর আর অমল।

তাদের দুজনের এক একটা কান তাদের মায়েদের হাতে!

'এর মানে?'

এঁরা বলেন ওঁদের, ওঁরা বলেন এঁদের।

তারপর দুই জননী শাঁখের গলায় বলে ওঠেন, 'ওদেরই জিজ্ঞেস কর।'

ওরা এতক্ষণ মায়ের কবল থেকে কান ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, এতক্ষণে সে চেষ্টায় সফল হয়ে বলে ওঠে, 'কী আবার! তোমরা খালি রাতদিন ঝগড়া করবে, ইচ্ছে করেই তো তাই হারিয়ে গিয়ে গল্প করছিলাম আমরা ছাতে ট্যাঙ্কের পিছনে বসে।'

ঠাকুমা আর দিদিমা ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে ওঠেন, 'আগে কারা ঝগড়া করেছিল রে বাঁদর?'

'তাতে কি?' ওরা অগ্রাহ্যের গলায় বলে, 'আমাদের ঝগড়া তো পরদিনই সেরে গিয়েছিল। তোমরাই বসে বসে পাকিয়েছ ঝগড়া!'

ঠাকুমা দিদিমার গায়ে ঢলে পড়ে বলেন, 'দিদি শুনলে?'

কুমকুম

এ মা ও মায়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলেন, 'দিদি দেখলে ?'

'দেখলাম ! শুনলাম ! বলি গেলা তো হয় নি সারাদিন !'

'হবে না কেন ?' ওরা আরো অগ্রাহ্য দেখায়, 'এক টাকার চিনে বাদাম খাইনি বুঝি দুজনে ? দেখে এসো না খোসা !'

'অ্যাঁ—এক টা-কার চিনে বাদাম ! ওরে বাবা, কী হবে !'

'কিছু হবে না !' দুই কর্তা হা হা করে হেসে ওঠেন, 'জানো না পেল্লাদরা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না !'

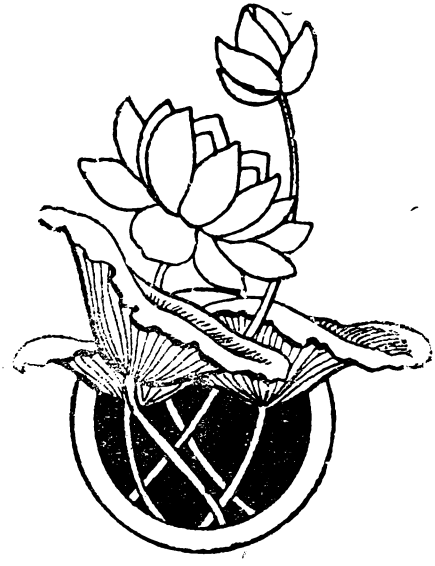

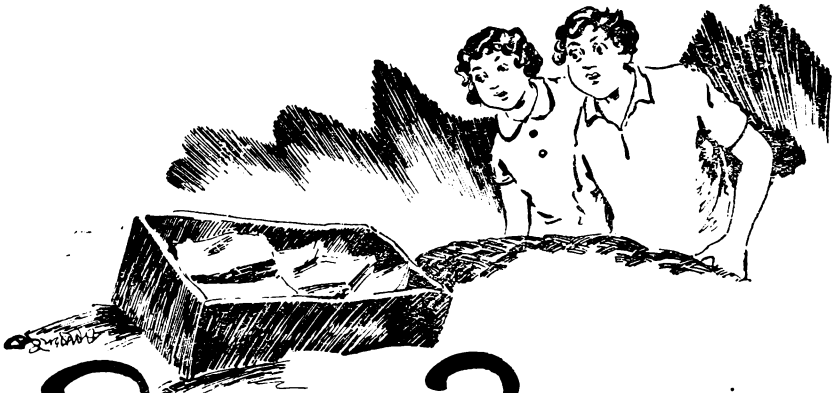

কীয় কীলাহয়

মিনটু আর বাবুনটু স্কুল থেকে এসে বাড়ির চেহারা দেখে একেবারে বইতে যাকে বলে 'মোহিত', তাই হয়ে গেল। খিদেটিদে তো স্রেফ হাওয়া। আহ্লাদে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চার বাহু তুলে—মানে দুজনের মিলিয়ে—নাচতে ইচ্ছে করল তাদের।

ইস্কুল থেকে ফেরার এক মিনিট আগেও কি জানতো আজ তাদের জন্যে এমন অগাধ ঐশ্বর্য জমানো আছে!

সকালে যাবার সময় দেখেছিল বটে দুটো মিস্ত্রী মতন লোক দরজার কাছে কতকগুলো বাঁশটাশ নিয়ে কি যেন করছে। কিন্তু তারা যে বাবুনটু মিনটুর জন্যে একেবারে রাজভাণ্ডার খুলে দেবার তোড়জোড় করছিল, তা কে ভেবেছে।

ভুলেই তো গিয়েছিল।

এসে দেখল বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে, আর সেই বাবদ একেবারে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এক! কয়লার ঘর থেকে লেপের চালি পর্যন্ত তছনছ কাণ্ড! তোলমাটি ঘোল।

ছোটদের কাছে এর চাইতে অপূর্ব দৃশ্য আর কী আছে? প্রতিদিনই তো এসে

সেই সাজানোগোছানো বাড়ি দেখতে হয়, আর সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে বাড়ির জন্যেই বকুনি খেতে হয়।

'ছাড়ো, ছাড়ো, চটপট জুতো ছাড়ো। এইমাত্র বাড়িঘর সাফ হয়েছে।...আঃ, এসেই চেয়ার টেবিলগুলো নড়াচ্ছ! একটু কি ভব্যতা নেই? বিছানায় ওঠবার কী দরকার হচ্ছে এক্ষুণি? হাত মুখ ধোবার তর সইছে না?...ভাঙল...ভাঙল সব শেষ করল! গেছো বাঁদর দুটো! কাচের গেলাস দুটো শরবত খেতে দেওয়া হয়েছে তোমাদের, গুঁড়ো করতে দেওয়া হয়নি, বুঝলে?'

চলতেই থাকবে এইসব।

যতক্ষণ না তারা খেয়েদেয়ে আবার খেলতে যাবে, ততক্ষণই চলতে থাকবে।

আর আজ?

আজ কোথায় চেয়ার, কোথায় টেবিল, কোথায় বা বিছানার ওপর টানটান করে পাতা বেড-কভার! আর মেজে? তার কথা তো বলেই কাজ নেই। চুনেতে বালিতে আর জলেতে যাকে বলে অপূর্ব। জুতো তো ছেলেমানুষ, রাস্তার সব ধুলো এনে ছড়ালেও টের পাওয়া যাবে না।

কিন্তু শুধুই কি এই? এইটুকুই কি আসল? এর জন্যেই কি এসেই মোহিত হয়ে গিয়েছিল তারা দুই ভাই বোন? আর কিছু নয়?

লেপের চালি থেকে, আলমারির মাথা থেকে, দরজার ওপরের তাক থেকে, সিন্দুকের পিছন থেকে, আর ঠাকুমার ঘরের সেই বিরাট চৌকিটার অসীম রহস্যময় তলা থেকে যত সব তুলে রাখা, গুঁজে রাখা, আর ভুলে থাকা জিনিস কি বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েনি বাবুনটুদের চোখের সামনে?

আজ মা ঠাকুমা পিসীমা কে কোথায় কি নিয়ে ব্যস্ত কে জানে। এরা যে হাতের বই খাতা নামিয়েই বসে পড়েছে 'চিচিং ফাঁকে'র ঘরের মধ্যে, তা আর কেউ তাকিয়ে দেখছে না।

ওরা দিশেহারা হয়ে এখানে ওখানে জড়করা জঞ্জালের স্তূপ থেকে 'দরকারী দরকারী' জিনিস বাছতে থাকে।

কুমকুম

কিন্তু এত জিনিস ওরা রাখবে কোথায়? এই সব রাশি রাশি গাদা গাদা? ভাঙা ছবির ফ্রেম, ছেঁড়া বেতের ব্যাগ, খালি সাবানের বাক্স, ফুঁকো ইন্‌জেকশনের শিশি, সমুদ্রের শুকনো ফেনা, সেকালের মোটাসোটা ডবল পয়সা, মরচেধরা তেফলা ছুরি, স্প্রিং কেটে যাওয়া পাঞ্চ মেসিন, লাল নীল চক, ছেঁড়া জগন্নাথের পট, হাঁটুমচকানো নটরাজ, ডানাভাঙা পরী পুতুল, শাঁখের আংটি, চন্দরপুলির ছাঁচ, এর কোনটা ফেলবার?

জড় করতে করতেই তো স্তূপাকার হয়ে ওঠে। অথচ আরো রহস্য আবিষ্কার হতে থাকে। কত দিনের কত হারানো জিনিসও তো পাওয়া যাচ্ছে।

মিনটু মুহুর্মুহুঃ চেঁচিয়ে ওঠে, 'ও দাদা, দাদা রে, ছাখ ছাখ, সেই তোর গরম কোটের সোনালী বোতামটা! দাদা, আমাদের সেই ছিঁড়ে যাওয়া কুকুরটার চোখদুটো! আরে ব্যস্, বাবা রাগ করে তোর যে পিংপং বলটা হারিয়ে দিয়েছিলেন সেইটা! আবার বলা হয়েছিল কিনা 'রাস্তায় ফেলে দিয়েছি!' এখন? এখন যদি—ওরে দাদা কাণ্ড ছাখ, ঠাকুরমার সেই ছুঁচে সুতো পরানোর যন্তরটা—আর মার সেই বোনার কাঁটাটা! যেটা হারিয়ে মা—দাদা! দাদা গো, এসব কিচ্ছু দেখছিস না তুই? অন্য কি এত দেখছিস মন দিয়ে?'

কিন্তু বাবুনটু তখন অন্য জগতে।

মিনটু এসে দাদার হাতের জিনিসটায় চোখ ফেলে। কি নিয়ে দাদা অজ্ঞান!

ওমা এ কী! পাঁপরভাজার মত হলদে আর মুচমুচে হয়ে যাওয়া একখানা ছেঁড়া বইয়ের পাতা। সেইটা দু হাতে মেলে ধরে দাদা যাকে বলে 'বিস্ময়বিস্ফারিত লোচন', সেইভাবে বসে আছে।

'ছেঁড়া পাতাটায় এত কি পড়ছিস দাদা?'

বাবুনটু এবার এ জগতে ফিরে আসে। 'রুদ্ধশ্বাস বক্ষে' বলে, 'ছেঁড়া পাতায় কী আছে জানিস?'

'কী রে?'

'এই ছাখ!'

কুমকুম

'বারে, এটা তো পড়াই যাচ্ছে না।'

'চমৎকার! অমনি বলে দেওয়া হল 'পড়াই যাচ্ছে না।' যাচ্ছে না তো পড়লাম কি করে? মন দিয়ে দেখবি তো?'

অতএব সেই ভাজা পাঁপরের মত হলদেটেরঙা মুচমুচে কাগজের ওপরকার খুদে খুদে খেঁদো খেঁদো অক্ষরগুলির প্রতি ভাল করে মন দেয় মিনটু। আর সেই লেখাগুলি মনে ঢুকতে ঢুকতেই মিনটুর বিঘত-প্রমাণ চুলগুলো সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে।

'দাদা!' রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে উচ্চারণ করে মিনটু।

বাবুনটু মৃদু মৃদু হেসে মিনটুর দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ তার নিজের চুল এতক্ষণে নরম হয়ে বসেছে। নিঃশ্বাসটা পড়েছে ভালভাবে।

কিন্তু মিনটুর চুল এখনো খাড়া।

'হাসছিস কেন দাদা? বলনা, সত্যিই সত্যি?'

'কী বোকা! সত্যি না তো কি মিথ্যে? ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে না?'

'দাদা! আমার রথের পার্বণী পাওয়া টাকাটা এক্ষুণি দিয়ে দিচ্ছি।'

'তা তুই দিবি কেন, আমারই তো রয়েছে। অবিশ্যি দু জনের নামেই আলাদা আলাদা পাঠানো যায়।'

'যাবে?'

'যাবে না? কী তবে পড়লি এতক্ষণ ধরে? লেখা রয়েছে না 'আপনার নাম ও আপনার পছন্দসই একটি ফুলের নাম লিখিয়া এক টাকার ডাকটিকিটসহ আবেদন করুন।'

লেখা রয়েছে বটে।

বার বার পড়ার পর এখন জলের মত পড়তে পারছে মিনটু।

'কিন্তু?' মিনটুর মুখে চিন্তার ছায়া, 'আমরা এত ছোট, আমাদের 'আপনি' বলেছে কেন? ওরাও ছোট নাকি?'

বাবুনটু তার এই অবোধ ও নির্বোধ বোনটার দিকে একটি করুণার দৃষ্টি হেনে বলে, 'ইশ মিনটু, সাধে বলি তুই একের নম্বর হাঁদা! ওরা কি শুধু আমাদের জন্যে

লিখেছে? পৃথিবীর সব্বাইয়ের জন্যেই লিখেছে। দেখলি না সেদিন রাস্তায় যে বক্তৃতা হচ্ছিল, তাতে সব্বাইকে ডেকে ডেকে বলছিল 'আপনারা শুনুন—', তা আমরা শুনছিলাম না?'

এতবড় অকাট্য দৃষ্টান্ত দর্শনের পর মিনটুর মনে আর দ্বিধা সন্দেহের লেশও থাকে না, সে আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'তা হলে আর এক মিনিটও দেরি করছিস কেন দাদা, চল ডাকটিকিট কিনতে।'

বাবুনটু এবার এই অবোধ শিশুর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি ফেলে! একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, 'তোর বলার অপেক্ষায় দেরি করছি যে। নীচে পর্যন্ত পড়েছিস? একেবারে শেষ লাইন—'

মিনটু ভয়ে ভয়ে বলে, 'পড়লাম তো!'

'কী পড়লি?'

'এই তো—পাঠাবার ঠিকানা—, তার নীচেটা তো ছিঁড়েই গেছে।'

'ওই—ওইটি হচ্ছে কথা! ঠিকানার জায়গাটাই ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে। সেই হারানোটা খুঁজে বার করতে না পারলে—'

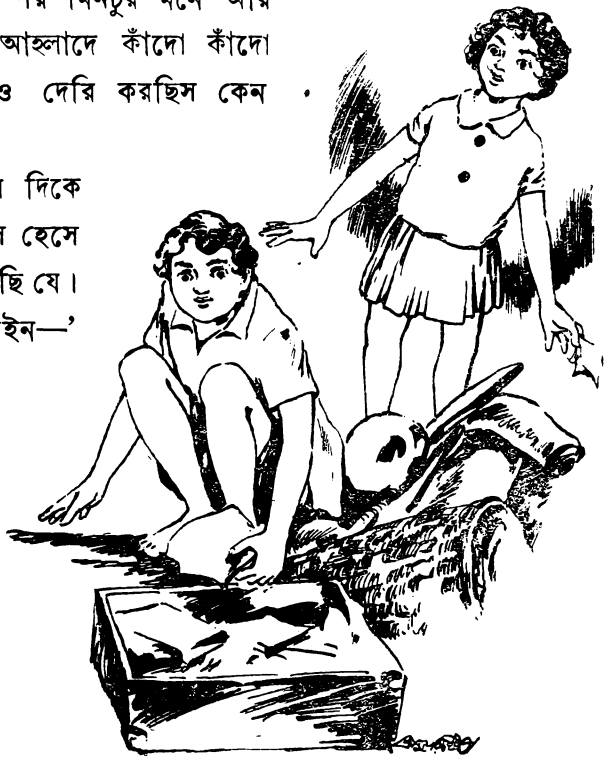

বিঘত প্রমাণ চুলগুলো সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে। [পৃঃ ১৬৬

কথা শেষ হয় না, বাবুনটুর ঠাকুমার গলা বেজে ওঠে, 'বউমা, তোমার ছেলে মেয়ে এখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি?'

'দাদা দাদা, শীগগির লুকিয়ে ফেল। এক্ষুণি সবাই দেখে ফেলবে।'

তা মিনটু বলার আগেই বাবুনটু তৎপর হয়ে উঠেছে। উইয়ে খাওয়া যে

কুমকুম

প্যাকিং বাক্সটার মধ্যে পুরনো পঞ্জিকার খাঁজে ওই অমূল্য পৃষ্ঠারত্নটি নেহাত দৈবক্রমেই পড়ে ছিল, সেই বাক্সটির মধ্যেই আস্তে শুইয়ে রাখে তাকে, আর আস্তে একখানি পাঁজি তাতে চাপা দেয় লুকিয়ে ফেলার জন্যে।

চেনে তো বড়দের!

নিজেরা অসাবধানে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু যেই বাবুনটুদের হাতে দেখবে, অমনি 'দেখি দেখি, কোথায় পেলি? নষ্ট করবি, দে দে' বলে কেড়ে নেবে।

পকেটে রাখলেই সবচেয়ে শান্তি ছিল, কিন্তু যা কাগজ! পাট করলে ফাট ধরবে।

'দাদা, আর এই দরকারী জিনিসগুলো?'

মিনটু সেই ধুলোভরা আরশোলামাখা দরকারী জিনিসগুলি বুকে করে কাতরে তাকায়।

'ওগুলোও এর মধ্যে রাখ—' বাবুনটু কাজে সাহায্য করে, 'এর মধ্যে রাখাই ভাল, এই বিচ্ছিরী বাক্সটায় কেউ হাত দেবে না।'

'মিনটু বাবুনটু!' পিসীর গলা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, 'কিরে! ইস্কুল থেকে ফিরে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেলি যে? খেতেটেতে হবে না?'

'এই তো যাচ্ছি—'

প্যাকিং বাক্সটা ঠেলতে ঠেলতে একটা কোণের দিকে নিয়ে যায় ওরা প্রাণপণ শক্তিতে।

'এই ঠিক। এখানেই থাক। খেয়ে এসে নেব।'

'কিরে তোরা কথার সাড়া দিচ্ছিস না যে?'

মা এসে দাঁড়ান।

'কী কাণ্ড! বাড়ি এসে মুখ ধোওয়া নেই খাওয়া নেই, বসে বসে ধুলো ঘাঁটছিস! ওই জন্যেই গণেশকে বলেছিলাম খোকাবাবু খুকুবাবু আসার আগেই জঞ্জালগুলো অন্ততঃ ফেলে সাফ কর। তা শুনলে না তো! কতক্ষণ ধুলো ঘাঁটছিস?'

কুমকুম

'কতক্ষণ আবার, এই তো—' দুই দু গুণে চারখানি হাত জামায় মুছতে মুছতে ওরা বলে, 'ধুলো ঘাঁটছি বুঝি? আমরা তো শুধু চোখ দিয়ে দেখছি।'

'আচ্ছা অনেক দেখা হয়েছে, এইবার দয়া করে চোখটা অন্য দিকে ফেরাও।'

মা তাদের ধরে নিয়ে যান।

খাওয়ায় আজ মন নেই। খিদেও চলে গেছে।

পেটের মধ্যে গ্যাস বেলুন।

বড়দের কান বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলাবলি করে ওরা, 'এক্ষুণি গিয়ে হারানো টুকরোটা খুঁজতে হবে।'

'ওর মধ্যেই আছে বোধ হয়। ওই বাক্সটার মধ্যে!'

'তাই সম্ভব। আস্তে আস্তে একটি একটি করে সব বই নামিয়ে দেখতে হবে।'

'কিন্তু যদি না পাস দাদা?'

'পাবো, পাবো না কেন, কোথায় আর যাবে! ওর মধ্যেই আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া অনেক পাতা আছে। হয়তো সমস্ত বইটাই ঝুরিঝুরি হয়ে আছে।'

'বইটা কি রে দাদা?'

'কি, তা অবশ্য বাবুনটুরও বুদ্ধির বাইরে, তবু ছোট বোনের কাছে কে চায় হারতে? তাই গম্ভীরভাবে বলে, 'আশ্চয্যি, এটুকুও বুঝতে পারছিস না? কাশীরাম দাসের মহাভারত।'

'মহাভারত! মহাভারতে তো ভীম অর্জুনদের কথা আছে—'

'চমৎকার! শুধু ভীম অর্জুনের কথা আছে? আরও কত কথা আছে তা জানিস? ঠাকুমা সেদিন বললেন না 'যা আছে ভারতে, তা আছে মহাভারতে'।'

আর একটা অকাট্য যুক্তি।

মিনটু মুখের খাবারটা জল খেয়ে খেয়ে গলায় চালান দেয়।

কুমকুম

'সাপের মন্তরের মত বিড়বিড় করে কি বকছিস তোরা?' মা এসে হেসে ফেলেন।

'এই আমরা মনে মনে একটা অঙ্ক কষছি—' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে বাবুনটু, পাছে মিনটু ফাঁস করে দেয়।

'সাপের মন্তরের মত বিড়বিড় করে কি বকছিস তোরা?'

জানে ফাঁস করলেই এখন হাজার জেরার মুখে পড়তে হবে।

কিন্তু খেয়ে গিয়েই খোঁজা হয় না।

এসে দেখে দালানে কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। বালতি বালতি জল ঢেলে আর ঝাঁটা নিয়ে গণেশ যেন মল্লযুদ্ধ করছে। আর ঠাকুমা তারস্বরে তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

'বাক্সটায় জল দেবে না তো?'

শঙ্কিত প্রশ্ন করে মিনটু।

বাবুনটু কম্পিত কণ্ঠে বলে, 'বোধহয় দেবে না। দেখি দাঁড়িয়ে।'

তা তাদের ভাগ্য ভাল। বাক্সটা নিয়ে কেউ টানে না।

কিন্তু অন্যদিকে এমনি ওদের ভাগ্য সেই বিকেল থেকে আর যতক্ষণ না তারা রাত্তিরে ঘুমুল ততক্ষণ কেউ না কেউ দালানে রয়েই গেল। পিসী খেলনার আলমারি সাজাচ্ছেন, মা বাক্স গোছাচ্ছেন, ঠাকুমা বাসনের সেলফ, বাবা ওষুধের তাক, গণেশ জুতোর র‍্যাক,—গোছানোই চলছে।

বাড়ি সংসারের সব জিনিসই যে এই দালানে ছিল তা তো কোনদিন দেখেনি ওরা।

কুমকুম

শেষ পর্যন্ত লেপের চালি।

এদিকে 'আর কত রাত অবধি ঘুরবি, ঘুমোগে যা' বলে বকুনি চলছে মিনটু বাবুনটুকে।

অগত্যাই শুতে যেতে হয়।

'কাল খু—ব ভোরে উঠে, বুঝলি ?'

'হ্যাঁ রে দাদা, কেউ যখন উঠবে না।'

'তোর কোন্ ফুলটা পছন্দ ?'

'গোলাপ ! তোর ?'

'রজনীগন্ধা !'

কিন্তু ভোরে উঠে যে এই দৃশ্য দেখতে হবে এ কথা কি ওরা স্বপ্নেও ভেবেছিল ?

দেখল সেই ভোরেই গণেশ সেই ভাঙা বাক্সটাকে উঠোনের জলের কলে ফেলে উলটে পালটে ধুচ্ছে।

এর মানে !

কোথায় গেল ওর ভেতরের জিনিসপত্তর !

'গণেশ !'

প্রচণ্ড এক চিৎকার করে ছুটে নীচে নেমে যায় ওরা !

কিন্তু গণেশকে মেরে কি হবে ! গণেশের কী দোষ ! ঠাকুমা গণেশকে কাল থেকে বলে রেখেছেন সকালে রাস্তা ঝাড়ু পড়বার আগে খুব ভোরে ওই জঞ্জালের বাক্সটা রাস্তায় উপুড় করে ঝেড়ে নিয়ে এসে ভাল করে ধুয়ে রাখতে। কয়লার গুঁড়ো থাকবে।

রাস্তা ?

সে তো এতক্ষণে ঝাড়ুদারে সাফ করে নিয়ে গেছে।

তার মানে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে মিনটুর সেই সমস্ত দরকারী দরকারী জিনিস।

কুমকুম

কাল যেগুলোকে মিনটু রাজ্যের ধুলো আর আরশোলা ঘেঁটে সংগ্রহ করে লুকিয়ে রেখেছিল বড়দের চোখে পড়বার ভয়ে।

আর বাবুনটুর ?

সব কথা শুনে সব্বাই হি হি করে হাসতে থাকে।

তার তো আরোই গেছে।

ঝাড়ুদারের ঝাঁটার ঝাপটে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার সেই অজানা আশ্চর্য ঠিকানাটা খুঁজে পাবার আশা। যে ঠিকানায় একটি ফুলের নামের সঙ্গে এক টাকার ডাকটিকিট পাঠালেই বাবুনটুর হাতের মুঠোয় এসে যেত একটা অন্য জগৎ।

হাতে এসে যেত 'ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, পরীক্ষায় পাস ফেল, ইচ্ছাপূরণের উপায়, কর্মে সাফল্যের উপায়, বিনা পরিশ্রমে বড়লোক হইবার উপায়, বিনা চেষ্টায় বিদ্বান্ হইবার উপায়।'

ওদের আর্তনাদে আর গণেশের প্রবল চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ সকলেই ঘুম ভেঙে উঠে আসে। আর আশ্চর্য! আশ্চর্য! সব কথা শুনে সব্বাই হি হি করে হাসতে থাকে। এমন কি মাও!

মিনটুর সেই ভয়ংকর দরকারী জিনিসগুলো হারিয়ে যাওয়ায় কারো মনে কোনো কষ্ট নেই, দুঃখু নেই বাবুনটুর সেই ভয়ংকর আশার আশাভঙ্গে।

কুমকুম

ওসব যেন কিছুই নয়।

এ পৃথিবীতে তবে ছোটদের মনের কথা বুঝবে কে ?

রাজ্যহারা সর্বহারা দুটি ভাই বোন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ একসময় নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'ঠাকুমা বাবা মা পিসীরা কি ছোটবেলায় ছোট ছিল না ?'

মিনটু ম্লানমুখে বলে, 'সে কথা ওরা বোধহয় ভুলে গেছে।'

'ভুলে গেছে ? ভুলে যাওয়া যায় ? আমরা ভুলে যাবো ?'

'কে জানে, যেতেও পারি ! আশ্চয্যি কি !' মিনটু দার্শনিকের মতো মুখে বলে, 'বড় হয়ে গেলে যে কী হয়, আর কী না হয় !'

মুক্তির উপায়

জগৎ-সংসারে যেমন জল মাটি আলো বাতাস রোদ্দুর—এই পাঁচটা জিনিস আছে, থাকবেই, অনাদি অনন্তকাল থাকবে, মানুষ না থাকলেও থাকবে, ঘরে সংসারেও তেমনি পাঁচটা জিনিস আছেই, থাকবেই। থাকবে—একেবারে নিশ্চিত অমোঘ অনিবার্য নিয়মে।

সংসারে বরং তেল থাকবে না, চিনি থাকবে না, চাল থাকবে না, মসলা থাকবে না, এমন কি হয়তো আমরাও থাকবো না, তবু ওরা থাকবে। ওই পঞ্চপ্রাণী।

কী? তোমরা বুঝি ভাবতে বসলে—পঞ্চপ্রাণী আবার কী বস্তু রে বাবা? 'মহাপ্রাণী' বলে একটা জিনিস আছে শুনেছি, মানুষের একেবারে ভেতরের ভেতরে নাকি তার বাসা, কিন্তু পঞ্চপ্রাণী! কী সে?

কিংবা হয়তো 'পঞ্চ' নিয়েই ভাবতে শুরু করেছ। কি বল তাই না? ভাবছো—পঞ্চগব্য তো জানি, পঞ্চশস্যও জানি, পূজোর ঘটে পঞ্চপল্লব আর পূজোর আলপনায় পঞ্চগুঁড়ি দেয় তাও জানি, ছেলেবেলায় একে চন্দ্র গোনবার কালে পাঁচে

কুমকুম

পঞ্চ বাণও শুনেছি, তাছাড়া পঞ্চরত্ন। পঞ্চ অমৃত, পঞ্চ পাণ্ডব এ সবই তো জানা আর শোনা ব্যাপার, কিন্তু ওই পঞ্চপ্রাণী! ওরা? ওরা কি তবে ম—

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছ; মশা, মাছি, পিঁপড়ে, আরশোলা, ইঁদুর—এদের কথাই বলছি আমি। তা ওই পঞ্চজন তো নেহাত 'পাঁচজন' মাত্র নয়! ওঁরা যে একাই একশো জন, এক থেকে এক কোটি জন।

কাজেই ওঁদের লীলাখেলায় বেচারা মানুষদের যে জীবন মহানিশা এ আর কে না জানে? অন্ততঃ আমাদের গজা আর রসমুণ্ডিদের বাড়িতে ওঁদের লীলাটা দেখবার মত। সকলের বাড়ি এত হয় না।

গজার মা বলেন, 'এ হচ্ছে ছেলেমেয়েদের নামের গুণ। ওই নামের গন্ধে গন্ধেই আমার বাড়িতে এদের এত দৌরাত্ম্যি! শ্বশুরমশাই আর নাম খুঁজে পেলেন না, নাতি-নাতনীর নাম রাখলেন গজা আর রসমুণ্ডি! এতে আর—ছুটে আসবে না পিঁপড়ে মাছি ইঁদুর আরশোলার দল?'

অবিশ্যি ওই সব কীট পতঙ্গ প্রাণী পক্ষীরা মানুষের ভাষা আর সে ভাষার নামের মানে বুঝতে পারে, এমন প্রমাণ নেই, কিন্তু গজার মা বলেন একথা।

ঝালাপালা হয়েই বলেন। সকল জ্বালা তো তাঁরই।

গজার ঠাকুমা তো বেতো আর বুড়োমানুষ, তিনি খালি বলেন, 'অ বৌমা, একটু ভালো করে সাবধান কর না! সংসারের সকল জিনিস তো দেখি ওদের ভোগেই যায়।'

কিন্তু কি করে সাবধান করবেন বেচারী গজা-রসমুণ্ডির মা? যেখানে যা রাখবেন, মিনিটের মধ্যে সেসব নয়ছয়, তচনচ, কুটপাট! যেটা পিঁপড়েয় পারে না, সেটা আরশোলায় সারে, যেটা ওরা দুজনেও পারে না, সেটার ভার নেয় ইঁদুরচন্দ্ররা। এ ছাড়া মাছিরা শুধু একবার বসেই তো ঘুচিয়ে দিতে পারে খাওয়া! এ রকম জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে শত্রু নিয়ে সংসার করা কি সোজা ঝকমারি?

এই তো কালই গজার বাবার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে একথালা চমচম

দিয়ে গেল। একেবারে ক্ষীরের গুঁড়ো ছড়ানো—ইয়া লম্বা লম্বা গাঙ্গুরামের চমচম! গজার মা তাড়াতাড়ি জালের আলমারিতে ভরে ফেলে, একটু শুধু চান করতে গেছেন, এসে দেখেন ব্যস্! থালার চমচম প্রায় তিনভাগ হাওয়া!

যে কয়টা বাকী পড়ে আছে, তার ওপর জন বারো আরশোলা আর জন তিনেক ইঁদুর বসে।

আর পিঁপড়ে? সে তো হাজারে হাজারে লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে এসে আলমারিটার রংই বদলে ফেলেছে।

আচ্ছা জাল-আলমারিতে পিঁপড়ে না হয় এলো, কিন্তু ইঁদুর? আরশোলা? ওরা কি করে ঢুকলো?

কিছুই না। দু-চারজন বীর আর স্মার্ট ইঁদুর যুবক কটাকট জালটির তার কেটে ফেলে দরজা করে দিয়েছে আরশোলাদের, সেই পথে এসেছে আবার মাছিরা, মশারা।

কিন্তু শুধুই কি খাবার জিনিস?

শুধুই কি দুধ ফল মাছ মিষ্টি ছানা মাখন কচুরি চপ?···বালিশ বিছানা শতরঞ্জি কম্বল নয়? গজার দাদুর জমানো জমানো রাজ্যির পুরনো পাঁজি? গজার ঠাকুমার হরিনামের মালা? আর তাঁর পূজোর গোপাল ঠাকুর, জগন্নাথ? মা কালী? মা কালী অবিশ্যি কাগজে ছাপা, ও তো খাবেই ওরা, বলতে গেলে মূল খাদ্যই ওদের ওই, তাছাড়া জগন্নাথ হচ্ছেন কাঠের, সেও উপাদেয় আর পোশাকী খাওয়া ওনাদের। গোপাল ঠাকুরটিই মাটির। কিন্তু তার ওপরকার সমস্ত রংটুকু চেটে পুটে খেয়ে, মাটির ঢেলা বানিয়ে ছেড়েছে ওরা।

এই শত্রুদের ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে সংসার করা কি সোজা? সোজা নয়, খুবই শক্ত, কিন্তু আজ যা হয়ে গেল এ দুঃখের তুলনা নেই।

সত্যি, একেবারে অবিশ্বাস্য, অভাবিত, অকল্পনীয় আর অনাসৃষ্টি শোচনীয়! দেখে গজার মার চোখ দিয়ে জল এসে গেছে, আর গজা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

তার ওপর জন বারো আরশোলা আর জন তিনেক ইঁদুর বসে। [পৃঃ ১৭৬

কুমকুম

গজা আর রসমুণ্ডির পড়ার বইয়ের বিষয় ভাবছ? নাঃ সে নয়। সে তো হয়েই গেছে একপালা গরমের ছুটির আগে। মাত্র গরমের ছুটির দেড়টা মাস; তার বেশী নয়। ওই দেড়টি মাস শুধু বইগুলোয় হাত পড়ে নি। ওমা, ছুটির পর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল দুই ভাইবোনের সতেরো আর বারো এই দুইয়ে মিলে উনতিরিশখানা বইয়ের চিহ্নমাত্র নেই। একেবারে ধুলো গুঁড়ো কিছু না।

গজার বাবা নাকি বলেছিলেন, 'অসম্ভব! ইঁদুর-আরশোলার বাবার সাধ্য নেই যে অমন নিশ্চিহ্ন করে খায়, এ ওই বিচ্ছু দুটোর কারসাজি, বই ফেলে দিয়েছে। পড়বার ভয়ে ফেলে দিয়েছে।' গজার মা রেগে উঠে থামিয়েছিলেন তাঁকে।

এ ওই বিচ্ছু দুটোর কারসাজি, বই ফেলে দিয়েছে।

সত্যি, গজার বাবা কি জানেন ওই কীটপতঙ্গ প্রাণীট্রাণীরা আরো কত বিচ্ছু। সেই কথাই বললেন গজার মা এখন, 'দেখ দেখ, আলমারিতে তুলে রাখা জিনিসের অবস্থা দেখ। রাতারাতি এই কাণ্ড করে বসে আছে! কাল সন্ধ্যেবেলা এনেছেন দাদা, আর আজ সকালেই—'

কথাটা সত্যি, মাত্র কাল সন্ধ্যাবেলাই গজাদের মামা এদের পূজোর কাপড়-জামা নিয়ে এসেছেন এখানে—মানে গজাদের এই কোন্নগরের বাড়িতে। এখনো চলে

কুমকুম

যান নি মামা, আর কি না, মানে তাঁরই চোখের সামনে তাঁর সবচেয়ে পছন্দ করে কেনা জিনিসটারই এই দুর্দশা!

মামাও দেখে মলিন হয়ে গেলেনঃ 'হায় হায় গজার প্যাণ্টটাই গেল! অন্ততঃ উনিশটা দোকান ঘুরে ওটা কিনেছিলাম। সবাই বলে—এত বড় মাপের হাফপ্যাণ্ট লালরঙের? বলেন কি? এ আপনি কোথাও পাবেন না।...আমিও গোঁ ধরেছি পেয়ে তবে ছাড়বো।—আরে বাবা ছেলেটা না হয় মাথাতেই খানিক লম্বা হয়ে গেছে, তাই বলে বয়েসটা তো আর সত্যি বেড়ে যায় নি? আমার বিশেষ সাধ একটি লাল ডেক্রনের প্যাণ্ট ওকে পরাবো! তা সেই প্যাণ্ট খুঁজে খুঁজে করলামও যোগাড়। দেখে ছেলেটা কী খুশীই হলো—আর কি না—'

—'শুধু ছেলেটা?' গজার বাবা বলেন, 'ছেলের মাও তো ওই প্যাণ্টের শোকে ধরাশয্যে নিয়েছেন।'

তা নিয়েছেনই সত্য। গজার মা প্রায় শয্যাই নিয়েছেন।

নেবেন না?

বাপের বাড়ি বলে কথা। বাপের বাড়ি থেকে পূজোর তত্ত্ব এলো, রাতারাতি কি না সে জিনিস সাত ফুটো! আর কার জিনিস? না গজার! রসমুণ্ডির ফ্রকটা গেলেও বা যা হোক হতো।

বারো শো বাহান্নটা ফ্রক আছে তার।

বেচারা গজা। কুল্লে বোধ হয় ষোলো কুড়িটা প্যাণ্ট সম্বল।

তা ছাড়া, লাল ডেক্রনের? একটাও না। অমন সুন্দর লাল টুকটুকে ডেক্রন যে পাওয়াই যায় বাজারে, তাই জানতেন না গজার মা। ছেলেটার মলিন-মলিন মুখটার দিকে তাকাতে পারছেন না তিনি। আর দাদার মুখের দিকেও। লজ্জাই কি কম? দাদা তো বললেন, 'ছি ছি বলিস কি? তোদের আলমারির মধ্যেও আরশোলা? কি করে সংসার করিস?'

কি করে যে করেন, তা গজার মা-ই জানেন। আর মনে মনে শ্বশুরের ওপর

দোষারোপ করেন। ওই গজা আর রসমুণ্ডি! ওই নামের জন্যেই!···কিন্তু কি আর করা?

প্যাণ্টটা তুলে জানলার সামনে ধরে দেখছিল গজা, একটা দুটো তিনটে ছটা সাতটা—ওরে সর্বনাশ আরও দুটো যে! তার মানে নটা ফুটো! তার মানে ঝাঁজরা! দুধ-ছাঁকা ছাঁকনি! আটা-চালা চালুনি! মাপে বড় হলে, মশারির কাজও চালানো যেতো!

করুণ করুণ গলায় গজার মা বলেন, 'তুই মন খারাপ করিসনে গজা, ও আমি লালসুতো দিয়ে খুব ভাল করে রিপু করে দেবো।'

'রিপু! নটা! নটা রিপু করা প্যাণ্ট পরে—'

গজা উদাস ব্যথিত দৃষ্টি তুলে তাকায়। গজার মা বলেন, 'কি করবি বাবা বল! যা হবার তা হয়ে গেছে! কিন্তু আশ্চর্যি। আলমারির ভেতরে তো কখনো—'

গজা বিষণ্ণ সুরে বলে, 'ডেক্রন যে ওদের ভীষণ প্রিয় খাদ্য!'

ডেক্রন যে আরশোলাদের ভীষণ প্রিয় খাদ্য, সে কথা জানতেন না গজার মা, গজা কোথা থেকে জানলে তাও জানেন না, কিন্তু সে প্রশ্ন করলেন না তিনি, শুধু বললেন, 'সবাইয়ের সব থাকলো, শুধু তোরটাই গেল!'

গজা নিজের কপালে হাত ঠেকালো।

হঠাৎ ওদিক থেকে রসমুণ্ডির খুকখুক হাসি শোনা গেল। মা তাঁর ছেলের এই মর্মান্তিক শোকের সময় মেয়ের এই বর্বর হৃদয়হীনতায় দারুণ চটে গিয়ে বলেন, 'হাসছিস যে! হাসছিস কেন রে পাজী মেয়ে?'

রসমুণ্ডি হাসির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'দাদা বলেছে মামার সঙ্গে কলকাতা যাবে।'

'কলকাতা যাবে। মামার সঙ্গে! ওই ছুতোয় বিরাগী হয়ে যাবে না তো? কিংবা রেলে কাটা পড়তে!' গজার মা সাদা ফ্যাকাশে মুখ করে ঘরে এসে বললেন গজার বাবাকে।

কুমকুম

গজার বাবা অবশ্য অতদূর ভাবতে পারলেন না, একটু বকেই বলে উঠলেন, 'একটা প্যাণ্টের জন্যে—'

'একটা প্যাণ্টের জন্যে! বলছ কি তুমি? পূজোর জিনিস বলে কথা। মামার বাড়ি থেকে আসা পূজোর জিনিস। তুমি চিরকাল মামার বাড়িতেই মানুষ, বুঝবে কি করে ওর মর্ম।...আমরা তো জানি, ছেলেবেলার কথা তো ভুলি নি। যেদিন মামার বাড়ির কাপড়-জামা আসতো, উৎসাহে আহ্লাদে সারারাত ঘুম হতো না।...ভোরবেলা উঠেই আর একবার চুপি চুপি দেখে নিতাম। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ভিন্ন হাত দিতাম না। তাও কী-ই বা জিনিস! ছিটের ফ্রক, তাঁতে ডুরে এই তো! তখন তো এতো নাইলন ডেক্রন টেরেলিন গ্যাবার্ডিন ছিল না? তবেই বোঝ?'

অতএব বুঝতেই হয় গজার বাবাকে। মানে চুপ করে যেতে হয়।

গজার মা গজাকে সাধতে আসেন, 'যাবি কেন বাবা? ওঁকে বলবো ঠিক ওই রকম একটি লাল প্যাণ্ট—'

গজা উদাস মুখে বলে, 'ও চেষ্টা করো না মা। দেখলেই তো সইলো না।'

'কিন্তু তুই হঠাৎ কলকাতায় যাবি কেন?'

'এমনি মনটা ভাল নেই, তাই—'

গজার দাদু বলেন, 'গজা হঠাৎ কলকাতা যাচ্ছে যে?'

গজার মা কেঁদে ফেলে বলেন, 'কেন আর! আপনার নামকরণের শেষ পরিণাম! যদি ওই সব নাম না রাখতেন নাতি-নাতনীর, বাড়িতে এত পিঁপড়ে আরশোলা ইঁদুর মাছির উপদ্রব হতো না। আর তা না হলে ওর প্যাণ্টও ঘুচতো না। আর তা না ঘুচলে, গজা এমন করে চলেও যেতো না—'

গজার দাদু হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে সময় লাগে।

বুঝতে সময় গজার ঠাকুমারও লাগে, বুঝে তারপর তিনি বলেন, 'একটা পাজামার জন্যে দেশত্যাগী হবে ছেলেটা? বল কি বউমা?'

বউমা সকাতরে বলেন, 'একটা ছুঁচের জন্যেও হতে পারে মা, মানুষের যে কখন কি হয়।...কিন্তু গজা, তুই কি আমাকে ছেড়ে—'

আবার খুকখুকিয়ে হেসে ওঠে রসমুণ্ডি। আর রেগে আগুন হয়ে ওঠেন গজার মা, 'ফের তুমি হাসছ পাজী মেয়ে? কেন এত হাসির কী হলো?'

রসমুণ্ডি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলে, 'হাসছি না তো! কাঁদছি!'

তা এই সব কান্নাকাটির মধ্যেই রওনা দেয় গজা। গজার মামা বলেন, 'তুই ভাবিস নি ফুলি, ওকে আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে কালই পাঠিয়ে দেবো। আর পারি তো আর একটা ওই রকম লাল প্যাণ্ট—।'

গজা হাত জোড় করে, 'দোহাই মামা, ওইটি করতে যেও না। দেখলে তো মনের মতন জিনিস আমার সয় না।'

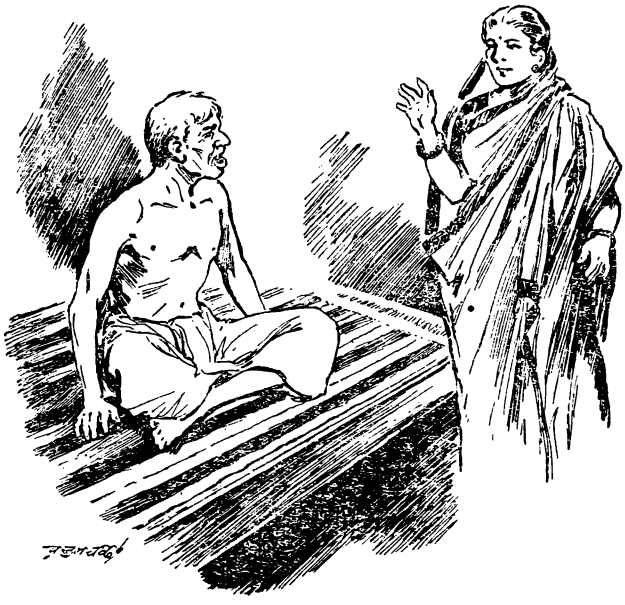

গজার দাদু হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে সময় লাগে। [পৃঃ ১৮০

কোন্নগর থেকে কলকাতা অবশ্য খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়। তবু গজার মামার মনে হলো দীর্ঘ। কারণ সারাক্ষণ এমন মলিন মুখে বসে রইলো গজা, দেখে মামা ভাবলেন, যাক গে আমার আরও তিরিশটা টাকা, আর একটা ঠিক ওই রকম প্যাণ্ট আমি কিনে দেবো ওকে।

তাই হাওড়ায় নেমেই বললেন, 'গজা, চল আমরা একটু দোকান ঘুরে যাই—'

'দোকান? কেন মামা?' গজা প্রায় আঁতকে ওঠে। 'আবার এখন কেন দোকান টোকান—'

কুমকুম

'চল না।'

ভাবলেন কাছেই বড়বাজার, অগাধ মাল। এখানে আর খুঁজতে হবে না।... কিন্তু কি করে হবে? গজার কপাল যে।

একটা দোকানে ঢুকে পড়েন মামা, জিজ্ঞেস করেন, 'লাল রঙের ডেক্রনের হাফপ্যাণ্ট আছে? এই ছেলের মাপে?'

'লাল! লাল প্যাণ্ট! এর মাপে?'

দোকানী একবার ছেলে আর একবার তার মামার দিকে নিরীক্ষণ করে তাকিয়ে গম্ভীরমুখে বলে, 'না নেই। ডেক্রন কেন, পপলিন শাস্‌কিন্‌ ছিট সাটিন্‌ কোনো কিছুরই নেই। এত বড় ছেলে—'

'বড় বড় করবেন না মশাই—' মামা রেগে উঠে বলেন, 'আপনার নেই তাই বলুন!'

আবার অন্য দোকান!

'লাল ডেক্রনের হাফপ্যাণ্ট আছে? এর মাপে?'

'না।'

আবার আর এক দোকান, 'লাল ডেক্রনের হাফপ্যাণ্ট আছে? এর মাপে?'

'না!'

'না।'

'না।'

'না।'

বড়বাজারের দোকান শেষ হয়ে গেল।

একজন বললে, 'ও জিনিস রেডিমেড পাওয়া যাবে না। কাপড় কিনে অর্ডার—'

মামা রেগে উঠলেন, 'পাওয়া যাবে না? বললেই হলো? নিজে কিনেছি কলেজ স্ট্রীট থেকে—'

'তা হলে কলেজ স্ট্রীটেই যান—'

কুমকুম

একজন বললে, 'লাল ডেক্রন প্যাণ্ট? কলকাতায় পাবেন না। বম্বেয় পেতে পারেন। সেখানে স্টারেরা অনেক সব কিম্ভূত কিম্ভূত পোশাক পরে!'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গজা বলে, 'আমার জন্যে আর কত কষ্ট করবে মামা? আর কত অপমান সইবে? আমি প্যাণ্ট চাই না।'

মামা, এদিকে ক্ষেপ্ চুরিয়াস হয়ে উঠেছেন, 'আমি কিনবোই।'

'মামা আমার কান্না পাচ্ছে।'

'আমারও। কিন্তু প্যাণ্ট না নিয়ে আমি ছাড়ছি না—'

'মামা লাল বোধ হয় পাবে না। অত পছন্দসই জিনিস পাওয়া যায় না—এদিকে কত বেলা হয়ে গেল।'

মামা এবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। অবহিত হলেন।

সত্যি বটে বেলা একটা বাজে। ঈষৎ মনমরা সুরে বললেন, 'আচ্ছা বেশ। আর একটা দোকান দেখবো। শেষ চেষ্টা, লাস্ট ট্রাই।'

দোকানে উঠলেন। গুছিয়ে পাখার নীচে বসলেন, ধীরে সুস্থে বললেন, 'লাল ডেক্রনের হাফপ্যাণ্ট আছে? এই ছেলের মাপে?'

দোকানী একবার ছেলেকে অবলোকন করলো। তারপর প্রসন্ন মুখে বললে, 'আছে, বসুন। ওরে···বাইশের ডেক্রন হাফপ্যাণ্ট!···লাল।'

একটা ছোকরা একগাদা প্যাকেট এনে ফেলে, প্লাস্টিকের প্যাকেট। নীল সবুজ চকোলেট কালো, ঘি রং, ক্রীম রং, অরেঞ্জ, হলদে হাফপ্যাণ্টের বাজার একেবারে।

'কিন্তু লাল?'

'লাল। আছে বই কি!' দোকানী সব নীচের প্যাকেটটা টেনে বার করে, আপনার কপাল ভাল; এই একটা মাত্রই আছে—'

'আছে! তার মানে ভগবানও আছেন।'

মামার মুখটা আহ্লাদে জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে। সাধনার সিদ্ধি, তপস্যার বর।

মামা পকেট থেকে টাকা বার করেন। বত্রিশ টাকা ষাট নয়া পয়সা। আগেরটা

কুমকুম

তিরিশ ছিল, তা থাক, ঠিক মনের মতনটি যে পাওয়া গেছে, এই ঢের। সাধে কি আর বলছিলেন তিনি ভগবান আছেন!

কিন্তু ভগবান কি সত্যিই আছেন?

থাকলে কি গজা অমন করে আর্তনাদ করে উঠতো, 'মামা' বলে?

কী হলো? গজার কি হঠাৎ পেট ব্যথা করে উঠলো?

গজাকে কি বিছেয় কামড়ালো?

পাশের কেউ কি গজার পা মাড়িয়ে দিল?

নাঃ সে সব কিছু না। শুধু ভগবান নেই তার নিদর্শন!

প্যাণ্টটার একটা পকেটের নীচে ইঞ্চিখানেক কাটা!

'কাটা! বলেন কি! অসম্ভব।'

দোকানী প্যাণ্টটাকে দু হাতে তুলে আলোর মুখে ধরে নিরীক্ষণ করে দেখে মুখটা প্যাঁচার মত করে বলে, 'দেখছি বটে! কী ভাবে হলো বুঝতে পারছি না। একেবারে ফ্রেশ মাল, কাল এসেছে।'

'আর নেই অন্য আর কোথাও?' মামা ভেঙে পড়ে বলেন।

দোকানী মনোভঙ্গ স্বরে বলে, 'থাকবে না কেন? এই তো দেখুন এর থেকে, সবই এক মাপ!'

'ওসব তো দেখলাম! কিন্তু লাল?'

'আর নেই!'

'এত বড় দোকানে মাত্র একটা—'

'কি করবো বলুন? উঠে যায়। এই চকোলেটটা নিন না, খোকাকে মানাবে ভাল। ফরসা রং—'

মামা প্রায় কেঁদে ফেলে বলেন, 'গজা! মজাটা দেখলি?'

'দেখলাম বই কি মামা! মজাও দেখলাম, কপালও দেখলাম। এবার বুঝলে তো? চল এখন বাড়ি চল, গিয়ে জল খাবো!'

জল!

কুমকুম

ওরে বাছারে! তেষ্টা পেয়েছে ছেলেটার, না জানি কতক্ষণ থেকেই পেয়েছে। আর মামা কি না মামা হয়ে—

'বাড়ি গিয়ে জল খাবি? কী বোকারে তুই গজা? কী খাবি বল? লেমন স্কোয়াস? পাইন অ্যাপেল? নিম্বুলা? কোকা-কোলা?'

'এত কি দরকার মামা?'

'আছে দরকার। যাচ্ছি চল। কিন্তু খালি হাতে আমি দোকান থেকে বেরোতে পারবো না গজা। এই এতক্ষণ তোকে রোদে ঘুরিয়ে—'

'কিন্তু মামা, মনের মতনটাই যখন হলো না—'

'তোরও কপাল, আমারও কপাল। তুই ওই চকোলেটটাই নে বাবা!'

গজা করুণমুখে বলে, 'নতুন একটা নিতেই তা হলে বলছ? না দিয়ে ছাড়বেই না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভারী খারাপ লাগছে আমার। দিন মশাই, দিন—ওই চকোলেটটাই দিন—'

গজা মামার পকেট চেপে ধরে বলে, 'মামা, আমি বলছি কি, কপালে যখন লাল সইলো না তখন ওই চকোলেটও থাক। ওর মধ্যেও তো লাল আছে? কে বলতে পারে আমার ভাগ্যই আবার ইঁদুরমূর্তি ধরে ওটাও কেটে দেবে কি না!'

'অ্যাঁ! কী বললি—'

'অনেক দুঃখেই বললাম মামা। আমি বলি কি ও তোমার লালের ধারে কাছেও গিয়ে কাজ নেই, ওই ক্রীমকালারটাই নাও। শনির দিষ্টি পড়বে না।'

রসমুণ্ডি খুকখুক করে হেসে বলে, 'তা হলে হলো?'

গজা ফিস-ফিস করে বলে, 'হতে কি চায়? নেহাত শনির দিষ্টিটা ছেড়ে গেল, তাই কানের পাশ দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল।'

রসমুণ্ডি মুণ্ডু দুলিয়ে হি-হি করে হেসে বলে, 'এবারে কার কৃপায় তরলি? দোকানে তো আর সঙ্গে সঙ্গে আরশোলা—'

কুমকুম

'না দোকানের জন্যে এইটা রেখেছিলাম পকেটে—' গজা ছোট্ট একটি ধারালো-মুখ পেনসিলকাটা ছুরি বার করে পকেট থেকে।

'দাদা!' চেঁচিয়ে ওঠে রসমুণ্ডি, 'বড় হয়ে নির্ঘাত তুই পকেটমার হবি! নির্ঘাত!'

গজা আত্মস্থভাবে বলে, 'বড় হয়ে যা হবো তা হবো, তা বলে এখন তো আর সার্কাসের ক্লাউন হয়ে বেড়াতে পারি না। মা ওই লাল প্যাণ্টটি না পরিয়ে ছাড়তেন ভেবেছিস? মার বাপের বাড়ির জিনিস বলে কথা! উঃ ভাগ্যিস বাড়িতে ইঁদুর-আরশোলার এত প্রাদুর্ভাব! নইলে বাবা যা চালাক ছেলে, ঠিক ধরে ফেলতেন!'

অবশেষে হল।

আবাল্যের আরাধ্য বস্তু লাভ হল! সেই ক্লাস এইট থেকে এই স্কুল-ফাইন্যাল পর্যন্ত যা প্রাপ্তির সাধনায় বেচারা টিটো কত কাতরতা কত আকুলতা কত আবেদন নিবেদন করেছে, এতদিনে সে প্রাপ্তি তার ঘটলো।

কি বলছ? ভগবান?

না, ভগবান অবশ্য নয়, কিন্তু তার চাইতে কমও কিছু নয়। অন্ততঃ টিটোর কাছে। ভগবান পাবার বাসনায় আর বেশী কী করতে পারে মানুষ? ভগবান চায়নি টিটো, চেয়েছিল একটা ক্যামেরা! হ্যাঁ নিজের নিজস্ব একটা ক্যামেরা। আর তার জন্যে কী না করেছে টিটো,—মানে আর কি, গার্জেনদের পায়ে তেল দেওয়ার ব্যাপারে! যত যা করবার সবই করেছে, সেই ক্লাস এইট থেকে আবেদন-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এতদিনে সিদ্ধ হল মনস্কামনা।

কুমকুম

হোক এক কুচি একটু বক্স ক্যামেরা, হোক তার নতুন দাম মাত্তর পঁয়ত্রিশ টাকা, আর বলুন না নতুন কাকা, "পঁয়ত্রিশ টাকার ক্যামেরা, বল না কেন টিনের কৌটো!" তবু ক্যামেরা তো! তাতে ফিল্‌ম তো পরানো যায়, এই ঢের। এই-ই টিটোর কাছে লাখ টাকার সম্পত্তি। এতেই ফটো তুলে টিটো একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে সকলকে।

ক্যামেরার সাধ তো তার শুধুই সাধ মাত্র নয়, ওই সাধের পিছনে লুকিয়ে আছে একটি শোচনীয় ইতিহাস।

আরে না না, একথা ভেবো না—টিটোর কোন প্রাণের বন্ধু নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গিয়ে দাগা দিয়ে গেছে টিটোকে, একখানি ফটোর দাগ পর্যন্ত না রেখে। আর সেই দুঃখে টিটো সংকল্প করেছে তার একশো জন বন্ধুর মধ্যে বাকী নিরেনব্বই জনের ফটো তুলে অ্যালবামে সেঁটে রেখে দেবে। সে সব কিছু না। টিটোর মনে যে গভীর দাগ, সে হচ্ছে অপমানের। সেই ক্লাস এইট থেকে সেই অপমানের জ্বালা নিয়ে বেড়াচ্ছে টিটো।

ঘটনাটা তাহলে বলেই ফেলি।

সে সময়, অর্থাৎ ক্লাস এইটের সময় টিটোর ছোড়দির সবে নতুন বিয়ে হয়েছে। জামাইবাবু আসছেন মাঝে মাঝে, আর বাড়িসুদ্ধ সকলে সেই নতুন জামাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে। এমন জামাই নাকি হয় না। জামাই-জনোচিত সমস্ত গুণই নাকি তার সর্বাঙ্গে বিকশিত হয়ে আছে! কিন্তু সত্যি বলতে কি টিটোর দু চক্ষের বিষ লাগতো ওই জামাইবাবুকে।

কেন? কারণটা কি?

কারণ বলতে গেলে গুছিয়ে বলা শক্ত। তবু বলা যায় জামাইবাবুকে বড্ড বেশী মাতব্বর লাগতো টিটোর। সর্বদাই তাঁর কেমন যেন বিশ্ব-নস্যাৎ ভাব। আর টিটোকে তো সত্যি সত্যিই প্রত্যেক ব্যাপারে নস্যি করছেন! এলে পরে ঢুকেই প্রথম ব্যঙ্গ হাসি "এই যে মার্শাল টিটো, কি খবর আপনার? ঘুড়ি ওড়ানোটি চলছে তো?"

● অবশেষে

কুমকুম

কেন রে বাপু, ঘুড়ি ওড়ানো ছাড়া আর কিছু করে না নাকি টিটো? আর টিটোর বয়সী কোন্ ছেলেটাই বা ঘুড়ি না ওড়ায়?

তা সে যাক। ক্যামেরার কথাটাই হোক।

সেবারে মাতব্বর মশাই শ্বশুরবাড়ি এলেন এক ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে। কী, —না সকলের ফটো তুলবেন। যেন টিটোদের ত্রিসীমানায় স্টুডিও নেই, যেন এযাবৎ টিটোদের বাড়ির সমস্ত দেওয়াল শূন্য সাদা খাঁখাঁ করছে, একখানিও ছবি ঝুলছে না তাতে!

রাগে গা জ্বলে গিয়েছিল টিটোর।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই ক্যামেরা আনায়, জামাইয়ের খাতির যেন আরও চতুর্গুণ বেড়ে গেল। আর বাড়িসুদ্ধু সবাই এমন হ্যাংলার মত জামাই বলামাত্রই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল যে দেখে মনে হতে পারে অভাগারা জীবনে কখনও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায়নি। আর কিছু না, জামাইয়ের গৌরব বাড়িয়েই যেন তাদের পরমার্থ।

টিটোই শুধু ছিল অবিচল।

জামাইবাবু যেই তাঁর সেই পেটেন্ট ব্যঙ্গহাসিটি হেসে ডাক দিলেন, "এই যে মার্শাল টিটো, আসুন আপনার একখানা হয়ে যাক।" তখন টিটো সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল, "কী হবে ছবি তুলে? দেয়ালে কি আর জায়গা আছে?"

তা কোথায় লজ্জিত হবি, তা নয় বাবু হোহো করে হেসে উঠে বলে উঠলেন, "দেয়ালে ফটো কি আর ভদ্রলোকে টাঙায় আজকাল? ও তো উনবিংশ শতাব্দীর ফ্যাশন। অ্যালবাম আছে কি করতে? এই যে আমি ছবিগুলো তুলছি, এর প্রত্যেকটির এক একখানি এন্‌লার্জড্ কপি তোমার ছোড়দির অ্যালবামে থাকবে। বুঝলে? মানে আর কি শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় মন কেমন করলেই খাতা খুলে বাপের বাড়ির আদি অন্ত সবাইকে দেখতে পাবে তোমার ছোড়দি। কী ফাইন অ্যালবাম কিনে দিয়েছি।"

কিন্তু টিটো এলো না।

"আমার জন্যে কারুর মন কেমন করবে না—" বলে গটগট করে চলে এলো টিটো। ওসব ঢং তার সহ্য হয় না।

—"আমার জন্যে কারুর মন কেমন করবে না।"

কিন্তু ফের আবার জামাইবাবুর ঝুলোঝুলি, "এসো এসো" করে। অথচ টিটো ও কাঠ কবুল! জামাইবাবুর ওই ফিকফিকে হাসি, গিলে কোঁচানো মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি, কাঁচীর ধুতির মাটিতে লোটানো কোঁচা, সবই টিটোর চক্ষুশূল। তদুপরি হচ্ছে চেহারা। পুরুষ মানুষের এত ফরসা হবার দরকার কি আছে বাপু? টিটোর তো দুচক্ষের বিষ। ওর মনে হয় বেটাছেলে ফরসা হলেই তাকে কেমন বোকা বোকা লাগে। সেই কথাটা সেদিন সে হঠাৎ বলেও ফেলেছিল। আর বলেছিলেন, "হ্যাঁ, যেমন রবীন্দ্রনাথ, যেমন সুভাষচন্দ্র, যেমন—" সঙ্গে সঙ্গে জামাইবাবু আর 'যেমন'টা আরও কি, সে আর শোনবার ধৈর্য হয়নি টিটোর, ছিটকে সরে গিয়েছিল সে।

● অবশেষে

মোট কথা, প্রতিপদে টিটোই অপদস্থ হচ্ছিল জামাইবাবুর কাছে, তাঁকে অপদস্থ করতে পারছিল না কিছুতেই। তাই জামাইবাবুর এই ছবিতোলার ডাক প্রত্যাখ্যান করে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল টিটো। "আমার ছবি কাউকে তুলতে হবে না," বলে শেষ বেশ যখন গটগট করে চলে এসেছিল টিটো, তখন জামাইবাবুর মুখটা কি আর কালো হয়ে চুপসে যায়নি ?

কিন্তু তারপর যা ঘটল সে এক অদ্ভুত !

ছোড়দির সেই বিখ্যাত অ্যালবাম ভরতি করার পর দেখা গেল তার পাতায় পাতায় টিটোর ছবি। ঈশ্বর জানেন কখন কোন্ মুহূর্তে টিটোর অজ্ঞাতসারে এই সব ছবি তোলা হয়েছে। হ্যাঁ মহামুহূর্তেই, কারণ সে ছবি দেখে বাড়িসুদ্ধু লোক হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

টিটো খালিগায়ে হাফ্‌প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। টিটো চোখমুখ কুঁচকে হাঁচছে, টিটো ইয়া বড় হাঁ করে হাই তুলছে, টিটো আড়ামোড়া ভাঙছে, টিটো ঘুম থেকে উঠে একচোখ বুজে চোখ রগড়াচ্ছে, টিটো ইস্কুলের তাড়ার সময় আধপোয়া ওজনের একটি ভাতের গ্রাস মুখে তুলছে, এই সব ছবি ! বাড়ির আর সবাইয়ের ছবি দু একখানা করে, টিটোর কোন্ না বিশখানা !

আশ্চর্য ! টিটোর এই লাঞ্ছনায় টিটোরই বাড়ির লোকের কী স্ফূর্তি। অদ্ভুত বিদঘুটে এই পৃথিবী। কারুর অপদস্থতাতেই অন্যের সুখ ! জামাইবাবুর হাসিটাও যাচ্ছেতাই রকম বিদঘুটে। সেই বিদঘুটে হাসি হেসে তিনি টিটোকে বলেন, "দেখলে তো শালাবাবু, তুললাম কিনা তোমার ছবি ? অহংকার না করলে ভাল ছবিই হতো তোমার।"

"ভাল ছবিতে দরকার নেই আমার।" বলে চলে এসেছিল টিটো।

কিন্তু পিছনে সে কী সমবেত হাস্য !

নিজেদের ছেলেমেয়ে অপদস্থ হলে লোকে কি করে যে এত স্ফূর্তি পায়, টিটোর বুদ্ধির তা অগম্য।

যাক সেইদিন টিটো প্রতিজ্ঞা করেছিল জামাইবাবুকেও একবার দেখে নেবে সে।

মানে আর কি দেখিয়ে দেবে সবাইকে। হলই বা জামাই সাজা নাড়ুগোপাল, হাঁ করে হাইও তো তোলেন কখনো সখনো মহাপ্রভু! আর খেতে বসে গালের চামড়া কুঁচকে যখন মুরগির পা চিবোন, তখন এমন কিছু সুন্দর দেখায় না। দুপুরবেলা চর্ব্যচোষ্য খাওয়ার পর যখন হাত-পা বিছিয়ে শুয়ে নাক ডাকান তখনই বা কী মনোরম? আর কোন কায়দায় যদি একমুঠো নস্যি নাকের সামনে এগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেই অপূর্ব 'হাঁচিমুখ'খানিও তো, অবিনশ্বর করে রাখা যায়!

সবই যায়, শুধু যদি একটি ক্যামেরা থাকে নিজের নিজস্ব।

তদবধি টিটোর ক্যামেরার বায়না।

কিন্তু টিটোর গার্জেনরা এমনিই হৃদয়হীন, আর টিটোর ভাগ্য এমনিই মন্দ যে, তুচ্ছ একটা পঁয়ত্রিশ টাকার জিনিস পেতে এতদিন লাগল। জামাইবাবু কি আর এখন তত ঘন ঘন আসেন!

যাক তবুও মন্দের ভাল। তবু তো হলো।

জিনিসটা দিলেন রাঙাকাকা। বললেন, "এই নে, আনলাম কিনে। অনেক-দিনের বাসনা তোর, অনেকদিনের শখ। দিলাম মিটিয়ে। আমার ছেলেবেলায় একটা পার্কার পেনের শখ ছিল, তা দিয়েছিলেন আমাকে আমার ছোটমামা আমার ম্যাট্রিকের রেজাল্ট দেখে খুস হয়ে। তা তোর এই স্কুল-ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরোলে," মুচকে হেসে বললেন রাঙাকাকা, "প্রাইজ দেওয়াটা কে বলতে পারে ঠাট্টার মতন দেখাবে কিনা। আর কে বলতে পারে তুই তখন সন্নিসী টন্নিসীই হয়ে যাবি কিনা। তার চাইতে এখনই ভাল, কি বলিস! মানে এই আড়াইটে তিনটে মাসই তো তোদের মত ছেলেদের সুখের কাল। নে মিটিয়ে নে সাধ বাসনা। হেসে খেলে নে এই বেলা।"

আজ পর্যন্ত বুঝতে পারে না টিটো সংসারসুদ্ধু বড়রা ছোটদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এত সুখ পায় কেন? কই ছোটরা তো তোমাদের ব্যাপারে কিছু বলতে যায় না? বলতে গেলে তোমাদের কী অবস্থা হতো সে কথা খেয়াল করেছ কখনও? তোমরা যে নিজেরা কত অদ্ভুত কিম্ভূত আর হাস্যকর তা জানো না তাই। আর সেটা

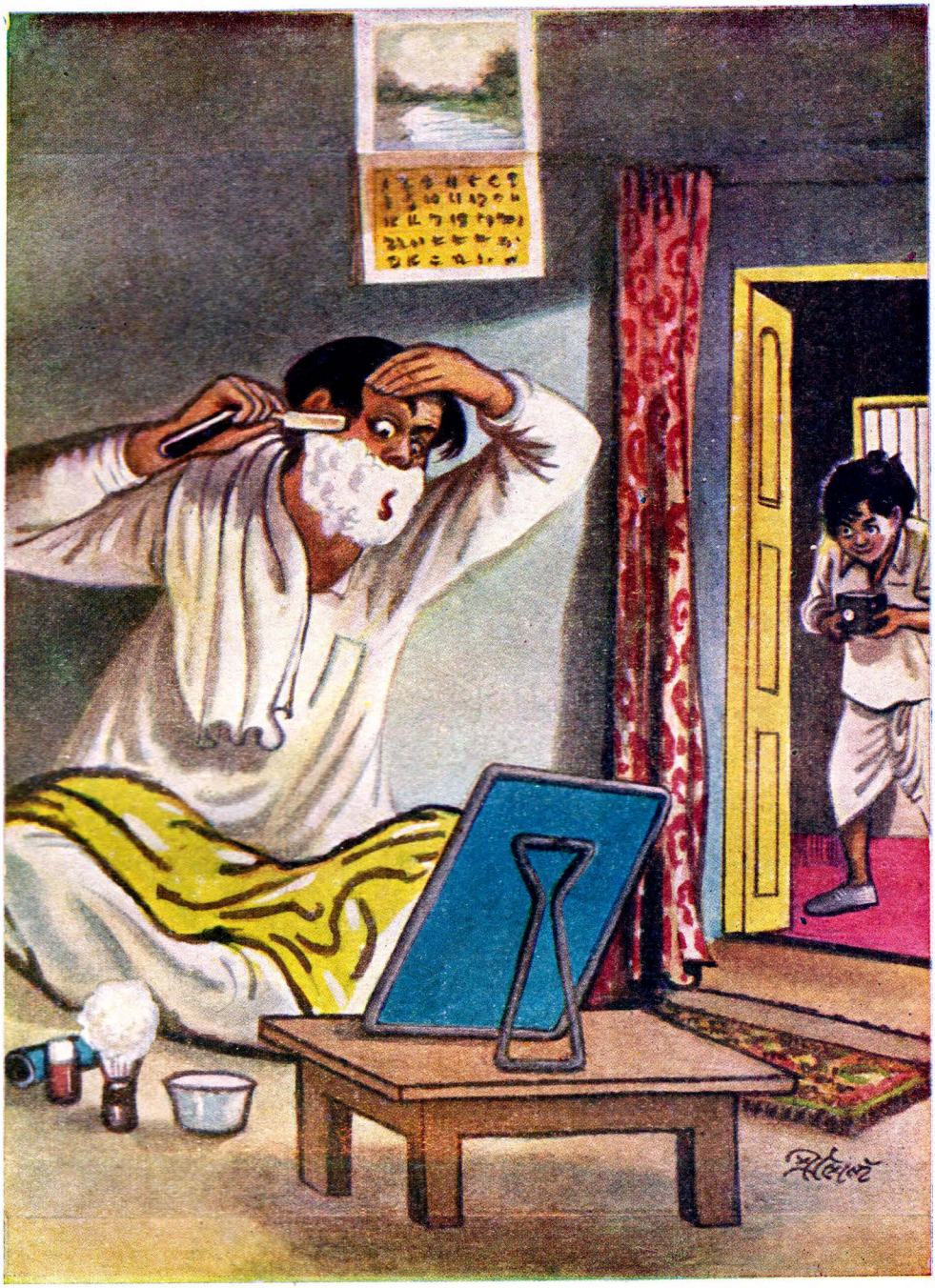

ফটো তুলছে বুঝতে না দিয়ে,—তুলে ফেললো কয়েকখানা ছবি

[পৃঃ ১৯৬

কুমকুম

ছোটদের চোখেই বেশী ধরা পড়ে। ছোটদের দয়ার শরীর, তাই সেটা জানিয়ে দেবার চেষ্টাও করে না। কিন্তু যদি করতো ?

যাক ও তো চিরকালের দুঃখ ! বড়রা চিরদিনই হিংস্র।

আপাততঃ নতুন করে আর একটু দুঃখের সৃষ্টি হল টিটোর। দিচ্ছ একটা উপহার তো ভাল মনে দাও না বাবা, তা নয় সাত সতেরো হাড় জ্বালানো কথা !

জিনিসটা নেহাত যদি ক্যামেরা না হয়ে আর কিছু হতো, নিশ্চয় টিটো "ও আমার চাই না—" বলে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে চলে যেত, কিন্তু জিনিসটা ক্যামেরা। তাই পারল না। প্রাণ ধরে বলতে পারল না—'আমার চাই না।'

আকুল আগ্রহে নিল হাত পেতে।

আর সত্যি বলতে জিনিসটা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাজীবনের যত না পাওয়ার দুঃখ হরে গেল টিটোর। তার মনে হল সে যেন একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হল !

"রাঙাকাকা !"

"কি রে ?"

"ফিল্‌ম পরানো আছে ?"

"দূর ফিল্‌ম কি আর পরানো থাকে ? এনে পরাতে হবে।"

"কবে আনবে রাঙাকাকা ?"

"কবে আনবো ? ও আর কি, আনলেই হল। ঘোড়া যখন হয়েছে চাবুকও হবে।"

আর বেশী জ্বালাতন করতে সাহস হয় না টিটোর। শুধু ভাবে ঘোড়া হতে বছর চারেক লেগেছে, এখন চাবুক পেতে কতদিন লাগবে কে জানে !

একত্রে ঘোড়া আর চাবুক দুইই আনলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো ?

কী ভাগ্যি, দিন আষ্টেক আবেদন নিবেদনেই হলো কাজ।

এলো ফিল্‌ম।

রাঙাকাকাই এনে দিলেন।

কিন্তু তারপর ?

● অবশেষে

তারপর রাঙাকাকা ক্যামেরায় ফিল্‌মটা বেশ জুত করে জুতে নিয়ে বললেন, "দাঁড়া দেখিয়ে দিই।"

ব্যস্‌, সেই যে তিনি দেখাতে শুরু করলেন, সমস্ত রোলটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়লেন না। টিটো যতবারই আকুল আগ্রহে "আমি একটু দেখি" বলে হাত বাড়াতে যায়, রাঙাকাকা ততবারই "আঃ" বলে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, "তোরই তো থাকবে বাপু, জিনিসটা কেমন দেখতে দে।"

"একটা আমি তুলি রাঙাকাকা!"

দেখতে দেওয়া মানে যা ইচ্ছে ছবি তুলে নেওয়া। রাস্তার একটা ছাগল-ছানারই ছবি তুলে নিলেন রাঙাকাকা। চিরকালের বুড়ী ঝি ক্ষ্যান্তর মা চিরকুট্টি ময়লা কাপড় পরে বাসন মাজছে, তারও নেওয়া হয়ে গেল একটা।...যা দেখছেন তাই।

মরিয়া হয়ে অবশেষে একবার বলে ওঠে টিটো, "একটা আমি তুলি রাঙাকাকা!"

"তুলবি?" রাঙাকাকা অমায়িক হাসি হেসে বলেন, "কিন্তু ফিল্‌মের সব কটাই তো খরচা হয়ে গেল রে, এখন আর নিয়ে কি করবি?" বলে সহাস্য মুখে ক্যামেরাটা তুলে রাখেন ড্রয়ারে। চাবি দিতেও ভোলেন না।

● অবশেষে

কুমকুম

"এখন হাত দিসনি খারাপ হয়ে যাবে, এ রোলটা প্রিণ্ট করতে দিয়ে আসবো, তখন এনে দেব আর একটা রোল। ক্যামেরা কেনা মানেই হাতি কেনা, এই হচ্ছে কথা। ফিল্‌ম রে, প্রিণ্ট রে, ভাল হল তো করাও এনলার্জ, নানান্‌খানা! এই তো —ক'মিনিটের মধ্যে কতগুলো পয়সা গেল। যা দাম হয়েছে—আজকাল রোলগুলোর।"

টিটোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হল এই উপদেশ অমৃত। ন্যায্য উত্তর দেবার উপায় নেই, যে হেতু সে ছোট। এ বাড়িতে ওপরওলাদের মুখের ওপর কথা বলা নাকি মহাপাতক!

দেখা যাক মার কাছ থেকে পয়সা বাগিয়ে—! যাক তা তো হল না হয়, কিন্তু জামাইবাবু? জামাইবাবুকে না পেলে তো ক্যামেরাই মিথ্যে!

রাত্রে শুয়ে ডাকে, "মা!"

পাশের খাট থেকে মা বলেন, "কি রে?"

"ছোটদি জামাইবাবু আর আসে না কেন?"

টিটোর মুখে জামাইবাবু!

ভূতের মুখে রামনাম!

মা হেসে বলেন, "ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার আবার কি। আত্মীয়লোক, অনেক দিন না দেখলে মন কেমন করে না?"

"ওরে বাবা, তোর আবার মন কেমন!" মা আরও হাসেন, তারপর বলেন, "আসবে কি, যা দূরে বদলি হয়ে গেছে জামাই। আসবে, এই সামনের জামাই-ষষ্ঠীতে আসবে ছুটি নিয়ে।"

"জামাইষষ্ঠীতে!" টিটো হতাশভাবে বলে, "সে তো সেই দুর্গাপূজোর সময়।"

"ওমা শোন কথা! দুর্গাপূজোর সময় কিরে? এই তো ক'দিন পরে।"

"ক'দিন পরে!" পুলক গোপন করতে পারে না টিটো। "কদিন পরে মা?" টিটোর কণ্ঠে আগ্রহ ব্যাকুলতা।

"বাবাঃ তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আজ রাত্তিরে হলেই ভাল হয়। এই তো আজ একাদশী গেল, এরপর অমাবস্যা আসবে, তারপর তো—"

● অবশেষে

কিন্তু টিটোর ওই আন্দাজী হিসেব ভাল লাগে না, সে ঝট করে উঠে পড়ে আলোটা জ্বেলে ফেলে।

"কি হল? উঠলি যে?"

"বাংলা ক্যালেণ্ডার ছিল না একটা?"

"কী মুশকিল! খেপলি নাকি? ওদের নিয়ে কিছু স্বপ্নাদেশ পেলি নাকি তাও তো বুঝছি না। বাংলা ক্যালেণ্ডার তো খাবার ঘরের দেয়ালে—"

ততক্ষণে টিটো খাবার ঘরে চলে গেছে।

আশ্চর্য আশ্চর্য! কে বলে ভগবান নেই?

কী অলৌকিক সংঘটন! জামাইষষ্ঠী পড়ছে রবিবারে! অর্থাৎ টিটোর ছুটির বারে। সারাটা দিন ধরেই সুযোগ পাবে টিটো।

এখন শুধু দিন গোনা, আর একটা ফিল্‌মের রোল কেনা। তার জন্যে আবার চালাতে হবে আবেদনের যুদ্ধ। তা হোক। যুদ্ধে জয়ী হবেই টিটো!

তারপর? তারপর যুদ্ধে জয়ী হল টিটো। মার কাছ থেকে আদায় করলো পয়সা। কিনে আনল ফিল্‌ম। আর জামাইবাবুও এলেন যথা সময়ে।

তারপর?

বুঝতেই পারছো—এতদিনের নিরুদ্ধ প্রতিশোধ বাসনা কিভাবে করিতকর্মা করে তুললো টিটোকে। ক্যামেরাটা কাউকে না দেখিয়ে, ফটো তুলছে বুঝতে না দিয়ে,—তুলে ফেললো কয়েকখানা ছবি। বেশ মহামুহূর্ত দেখেই তুললো।

এদিকে বাড়িসুদ্ধ সবাই তাকে মুহুর্মুহু প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করছে, "কই রে তোর অত সাধের ক্যামেরা কি হল? কিনতে না কিনতেই শখ মিটে গেল? জামাইবাবুদের ছবি তোল একটা!"

রাঙাকাকা বললেন, "ভেঙে-টেঙে ফেললি নাকি?"

আর নতুন কাকা জামাইয়ের আড়ালে বললেন, "আসল কথা বুঝছো না, জামাইয়ের অমন দামী ক্যামেরা আছে দেখেছে, তার সামনে সস্তার বক্স ক্যামেরা দেখাতে বাবুর লজ্জা হচ্ছে।"

● অবশেষে

অবশ্য টিটো বলতে পারতো "তুমি নিজেই তো ওটাকে বলেছ 'টিনের কৌটো'।" কিন্তু বলল না। বলে কি হবে? বড়রা তো সব সময়ই পরস্পরবিরোধী কথা বলে, সে কথার উল্লেখ করলে কি লজ্জিত হয়, না ঘাট মানে? উলটে বরং বলবে "ডেঁপো" বলবে "উদ্ধত"। অতএব টিটো চুপ করে থাকে, আর রাঙাকাকা লম্বা এক লেকচার ঝাড়েন। "ওই তো ওই জন্যেই আমরা বাঙালীরা উচ্ছন্ন যেতে বসেছি। অবস্থার অতিরিক্ত ফ্যাশন করতে হবে! কেন রে বাপু? যে যেমন সে তেমন। জামাই মাসে হাজার টাকা রোজগার করে, তুই করিস তাই?" আরও অনেক ভাল ভাল কথা বললেন তিনি।

যাক এসবে কিছু এসে যায় না টিটোর। এতদিনের বাসনা চরিতার্থ হয়েছে তার, এতেই সে খুশী।

এখন শুধু প্রিণ্ট করিয়ে আনা!

জামাইবাবু থাকতে থাকতেই করাতে হবে।

হ্যাঁ, তা সে করিয়েও ছিল।

জামাইবাবু থাকতে থাকতেই প্রিণ্ট করিয়ে এনেছিল। ফিল্মটা ফুরোবার জন্যে রাস্তায় এলোমেলো ছবি তুলে, গুছিয়ে নিয়েছিল কাজ।

চার চারখানা ছবি সে তুলেছে—

একখানা হচ্ছে জামাইবাবু যখন গাল কুঁচকে মাংসের হাড় চিবোচ্ছেন, একখানা তিনি যখন চর্ব্যচোষ্য খেয়ে খালি গায়ে পড়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন দিন দুপুরে, আর একখানা যখন বাবুসাহেব একগাল সাবানের ফেনা মেখে, আর একগালে ক্ষুর বুলিয়েছেন, এবং চরম শেষখানি হচ্ছে যখন "রাত্রে ট্রেনে মোটেই ঘুম হয়নি" বলে বিরাট বদন ব্যাদান করে হাই তুলছেন।

এইখানাই মারকাটারি হবে, কারণ ছবিগুলোর এক একটা ক্যাপশান তৈরি করে ফেলেছে সে ইতিমধ্যে। এই বদন ব্যাদান ছবিটার ক্যাপশান ঠিক করেছে টিটো "সগোষ্ঠীর বিশ্বরূপ দর্শন"।

সগোষ্ঠীই সত্যি! ঠিক সেই সময় বাড়িসুদ্ধু প্রায় সকলেই সদ্য আগত জামাইকে ঘিরে বসেছিলেন। হাজার টাকার জামাই। সোজা সমীহ তো নেই সকলের!

● অবশেষে

কত কৌশলে আর কত তাক করে যে টিটো আত্মগোপন করে থেকে তুলেছে এটা। আর আর ছবিগুলোর ক্যাপশান হচ্ছে "আহা কী সুন্দর!" "ঘুম না অজ্ঞান?" আর একখানা "মানুষ কি একদা হিংস্র বন্য প্রাণী ছিল, না আজও আছে?"

রাস্তায় তোলা ছবিগুলো দেখে নেয় তাড়াতাড়ি।

ক্যাপশান সমেত ছবিগুলি জামাইবাবুকে উপহার দেবে সে। জামাইবাবুর চাইতে বেশীই করবে। ছবির সঙ্গে ক্যাপশান, "চাঁদের ওপর চুড়ো, সোনার ওপর সোহাগা!" তারপর ছবির দোকানে গেল টিটো।

"হয়েছে?"

"হ্যাঁ এই যে। কিন্তু —মানে আপনি বলেছিলেন সবগুলোই প্রিণ্ট করতে, তাই—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" পয়সা মিটিয়ে দিয়ে চটপট বেরিয়ে আসে টিটো দোকান থেকে।

ধীরে সুস্থে এসে বসে একটা পার্কের বেঞ্চে।

রাস্তায় তোলা আজেবাজে ছবিগুলো দেখে নেয় তাড়াতাড়ি। একটা গাড়ি,

কুমকুম

একটা ঝাঁকা মুটে, একটা ডাস্টবিন, একটা শালপাতা-খেগো গরু,—তারপর এসে পড়ে আসলে !

কিন্তু এ কী ?

এসব কি হয়েছে ? কেমন করে কি হল ?

কোন্ ছবিটা জামাইবাবুকে উপহার দেবে টিটো ? কিসে কি ক্যাপশান বসাবে ?

গালে সাবানের ফেনা 'আহা কি সুন্দর'—ছবিটার অসৌন্দর্য কোথায় ? এ তো জামাইবাবু তোয়ালে দিয়ে গাল মুছছেন ! দিব্যি স্বাভাবিক পরিষ্কার ভাব। আর এই 'ঘুম না অজ্ঞান' এই বা কেমন করে দেওয়া যাবে ? দিলে আগে তো ছোড়দির হাতেই পড়বে ! আর ছবি দেখার পর ছোড়দি কি জীবনে আর কখন ছোট ভাইকে ক্ষমা করবে ? না করাই সম্ভব, কারণ জামাইবাবুর সেই স্তব্ধ স্থির ঘুমে পাথর দেহের ছবিটির যা ভঙ্গী হয়েছে, তাতে এর ক্যাপশান হওয়া উচিত, "নিদ্রা না মহানিদ্রা ?" নাক ডাকাটা তো ক্যামেরায় ধরা পড়ে না।

টিটো যে টিটো, তারই প্রাণটা কেমন করে উঠল ছবিটা দেখে। এ ছবি বার করা চলে না।

আর "মানুষ কি একদা হিংস্রপ্রাণী ছিল" ছবিটাই বা এমন বদলে গেল কি করে ? মাংসের হাড় হাতে করে কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন জামাইবাবু। মুখের ভাব স্নিগ্ধ হাস্যময় মোলায়েম।

হাতের বস্তুটা ?

বোঝবার উপায় নেই। সন্দেশও হতে পারে, চকোলেটও হতে পারে। অর্থাৎ টিটো যতক্ষণে দৃশ্যটি তাক করেছে, ততক্ষণে দৃশ্য দৃশ্যান্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

কিন্তু সব শেষখানা ?

জামাইবাবুর হাঁ করা মূর্তিটা ? যার নাম 'সগোষ্ঠীর বিশ্বরূপ দর্শন'। সেটা এ দৃশ্যে পৌঁছাল কি করে ?

● অবশেষে

কুমকুম

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে টিটো নিজেই হাঁ করে।

এ কী রহস্য ?

সমস্ত ছবিখানাই যে টিটোকে বদন ব্যাদান করে গ্রাস করতে আসছে। অন্ততঃ টিটোর তাই মনে হল। টিটোকে গ্রাস করতে আসছেন রাঙাকাকা, নতুন কাকা, নতুন খুড়ী, বড়দা-মেজদা, বড় জ্যাঠা, জেঠীমা, এমন কি বুড়ী ঝি ক্ষ্যান্তর মা পর্যন্ত।

হ্যাঁ সেদিনকে সব্বাই এঁরা ছিলেন আসরে, জামাইয়ের কাছেপিঠে গা ঘেঁষেই বসেছিলেন, আর সকলেরই ছবি উঠে গেছে।

উঠেছে বিরাট নিটোল একটি হাঁ সমেত। শুধু জামাইবাবু বাদে। জামাই-বাবুর মুখে প্রসন্ন হাসির আভাস, মুখের পাশে দুই আঙুলে তুড়ির ভঙ্গী। আর বাকী প্রত্যেকে ওই যা বললাম—হাঁ করা।

অর্থাৎ সগোষ্ঠী একযোগে বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন। মানে আর কি হাই তুলছেন।

ব্যাপারটা বুঝতে তোমাদের অবশ্য দেরি হল না, কিন্তু টিটোর অনেক দেরি হয়েছিল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে বুঝেছিল, আর কিছু নয় সেই তাক-এর ব্যাপার। ক্যামেরার শাটারটা টিটো তাক মাফিক টিপতে পারেনি, তাক করতে করতে একটুখানি দেরি হয়ে গিয়েছিল।

তারপর তো পড়েই আছে—

প্রকৃতির অনেক অবোধ্য রহস্যের সেই রহস্যটি।

হাইয়ের হিংসুক হাই।

জামাইবাবু হাই তোলার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে প্রতিযোগিতা। কিন্তু টিটো যতক্ষণে তাক করেছে ততক্ষণে মূল গায়েনের গান শেষ হয়ে গেছে, চলছে—দোয়ারদের পালা। কি ? বুঝতে পারছ না ? না পারো তো একবার সভার মধ্যে বড় সড় একটি হাই তুলে দেখো।

ভুচুমামাদের তিনকুলে কস্মিনকালে কারো কুকুর পোষার শখ ছিল না। ভুচুমামার মা মানে ফন্তি দিদিমা, যে বাড়িতে কুকুর পোষে, সে বাড়ির ছায়া মাড়াতেন না, রাত্রে রাস্তার কুকুরের ডাক শুনলে তিনতলার ঘরে শুয়ে দাঁতকপাটি খেয়ে ভিরমি যেতেন, আর দৈবাৎ কোথাও কুকুরের মুখোমুখি হয়ে গেলে, আচমকা এমন চেঁচানি চেঁচিয়ে উঠতেন যে, বেচারা কুকুরই ভয় খেয়ে চোঁ চাঁ দৌড় দিত।

আর বটুক দাদু তো, মানে ভুচুমামার বাবা হঠাৎ কুকুরের হাওয়া গায়ে লাগলে তিন ডুব দিয়ে গঙ্গাস্নান করতেন। বলতেন, 'কুকুর ছুঁলে তিন জন্মের পুণ্য ক্ষয় হয়।"

এহেন মা-বাপের গুণধর বংশধর ভুচুমামা গোটা চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কুকুরকে 'কু' ভেবে এসে হঠাৎ একদিন 'পেল্লাদ কুলে দৈত্য' হলেন।

কুকুর পুষলেন।

পুষলেন, পুষলেন, তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কারণ ফন্তি দিদিমা আর বটুক দাদু তাঁদের কুকুরভীতি আর কুকুরনীতি ইহধামে রেখে দিয়ে স্বর্গধামে প্রস্থান করেছেন। এখন ভুচুমামা কুকুর পোষণ করুন কি কুকুর তোষণ করুন, কার কি এসে যাচ্ছে?

কুমকুম

কিন্তু যাচ্ছে এসে। মাথাব্যথা ভুচুমামার ভাগনে-ভাগনীদের!

কুকুর পোষা ইস্তক ভুচুমামার হাবভাব সব মারাত্মক রকমের বদলে গেছে। যে ভুচুমামা লম্বা কোঁচা লুটনো কাঁচির ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি ছাড়া পরতেন না, হঠাৎ তিনি হাফপ্যাণ্ট আর কলার-দেওয়া স্মার্ট গেঞ্জি পরে ঘুরতে শুরু করলেন, আর জীবনে যিনি সিগারেট খেতেন না তিনি সহসা পাইপ খেতে আরম্ভ করলেন।

পরনে গেঞ্জি-হাফপ্যাণ্ট, হাতে চেন, মুখে পাইপ, ভুচুমামার এই নবকলেবর দেখে ভুচুমামার ভাগনে-ভাগনীরা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। তা কাঁদতেই ইচ্ছে করে তাদের—ডাক ছেড়ে কাঁদতে।

শুধু তো হালচালেই নয়, বোলচালেও যে বদলে গেছেন ভুচুমামা। ভাবতে পারা যায় ভুচুমামা গল্প বলা ছেড়ে দিয়েছেন? না গল্প আর বলেন না ভুচুমামা। ওই সব ভাগনে-ভাগনীদের ভূমিষ্ঠ হবার আগে, ভুচুমামা যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে 'নিখিল ভারত' ভ্রমণ করে এসেছিলেন, তখন যেসব রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, তার কাহিনী থেকে এক একটি বর্ণনা করতেন ভুচুমামা সন্ধ্যা হলেই।

ভুচুমামা একটা ইজিচেয়ারে শুতেন। ভুচুমামার চোখ দুটো বোঁজা আর পা দুটো সোজা থাকতো। ভাগনে-ভাগনীদের কাজ ছিল সেই সোজা পা-কে টেনে টেনে আরও সোজা করা, আঙুলগুলো কটাকট শব্দে মটকে দেওয়া, আর ভুচুমামার চুলের মুঠি ধরে আস্তে আস্তে চাপ দেওয়া।

এই সেবার পুরস্কার স্বরূপ রোজ একটি করে গল্প বলতেন ভুচুমামা।

কাজটা অবশ্য শ্রমসাপেক্ষ ছিল, কারণ 'হয়েছে থাক' একথা তো বলতে জানতেন না ভুচুমামা। তবু যতই শ্রমসাপেক্ষ হোক, ভূগোল মুখস্থ করা, কি হাতের লেখা করা, অথবা অঙ্ক কষার চাইতে তো বেশী নয়?

ভুচুমামার সেবায় আত্মনিয়োগ না করলে তো ওই সব বিচ্ছিরিগুলো নিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হতো?

এ বাবা মাতুলসেবা। ধর্মকাজ!

তার মানে মায়ের কাছে সাত খুন মাপ। ভুচুমামার আশ্রয়ে এসে পড়তে না পারলেই তো ওই বিচ্ছিরিগুলোর জন্যে খুনোখুনি কাণ্ড শুরু করেন মা। উপরিলাভ ওই গল্প।

ভুচুমামা অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, অনেক শিখেছেন। তাই ভুচুমামা বলতেন, 'দেখ ভারতবর্ষের পথে পথে অলৌকিক ছড়ানো, অলিতে-গলিতে ঝোপে-

ভাগনে-ভাগনীদের কাজ ছিল সেই সোজা পা-কে টেনে টেনে·····[পৃষ্ঠা ২০২

জঙ্গলে অলৌকিকের চাষ, তাই 'এ হয় না ও অসম্ভব' বলে তর্ক তোলাটা বুদ্ধুমী! চোখে না দেখলে আমিই কি বিশ্বাস করতাম—'

এর পরেই ভুচুমামা ভয়ংকর অবিশ্বাস্য একটি সত্য ঘটনার কাহিনী শুরু করে দিতেন।

ভুচুমামার ভাগনে-ভাগনীদের মা শুনতে পেলে বলতেন, 'কবে অত সব জায়গায় গেল ভুচু? আমি তো কোনো কালে রিষড়ের ওধারে যেতে দেখি নি ওকে।'

● লায়ন দি গ্রেট

কুমকুম

ভুচুমামা আবার সে কথা শুনতে পেলে দুঃখ করে বলতেন, 'স্মৃতিশক্তিটা একেবারে গেছে তোর মার! মেমারি বলতে কিছু নেই।'

সে যাক মার 'মেমারি' থাকলেও যা, না থাকলেও তা। মা তো জীবনে গল্প বলবেন না। ভুচুমামাই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁর ভাগনে-ভাগনীদের। কিন্তু গেছে সেই সুখের দিন।

কারণ ওই কুকুর পোষা।

এখন ভুচুমামার মুখে কুকুর-প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোনো প্রসঙ্গ নেই। এমন কি ক্রিকেট ম্যাচের সময় পর্যন্ত ভুচুমামা নির্বিকারচিত্তে রেডিও বন্ধ করে রেখে কুকুরের গায়ে সাবান মাখান।

কুকুর পোষার পর থেকে 'বিশ্ব সারমেয় সংস্থা'র সদস্য হয়েছেন ভুচুমামা, আর 'আন্তঃ কুকুর কল্যাণ কমিটির মুখপত্র 'দি ডগ'-এর গ্রাহক হয়েছেন।

'দি ডগ'-এর মলাটে একটি আমেরিকান সাহেবের ছবি আছে, পরনে কলার-দেওয়া স্মার্ট গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট, মুখে তামাকের পাইপ, হাতে চেনে বাঁধা কুকুর। পত্রিকাটিতে নাকি কুকুর পালন সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব আর কুকুর সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য নিয়মিত ছাপা হয়, এবং কুকুর-ঘটিত যত রোমাঞ্চকর কাহিনী আর ছবি থাকে।

ওই ম্যাগাজিনটি থেকেই 'লক্ষণ বিচার' করে ভুচুমামা ধরতে পেরেছেন, ভুচুমামার কুকুরটি বিশ্বের সেরা কুকুর বংশীয়। নেকড়ে তুল্য সেই কুকুরটাকে কোলে টেনে নিয়ে ভুচুমামা তার কান উলটে ধরে বলেন, 'এই দেখ, এই যে কানের পিঠের লালচে বাদামী রং? এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে এ খাঁটী রাজবংশ। এর মা স্প্যানিশা, বাবা ফরাসী। এর একটা দিদি এখন কুইন এলিজাবেথের কাছে আছে, আর একটা ছোট বোন ডিউক অফ কনটের মেয়ের কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে।'

তাছাড়া তার মাসী পিসী মাসতুতো বোন পিসতুতো বোন দিদিমা ঠাকুমা সকলের বংশপরিচয়ই ভুচুমামার মুখস্থ, কিন্তু আর কেউ মুখস্থ করতে পারে না।

পারবে কি, যেই ভুচুমামা সেই বংশ-পরিচয় আর 'দি-ডগ' নিয়ে তেড়ে আসেন,

কুমকুম

ভুচুমামার ভাগনে-ভাগনীদের সকলেরই যে হঠাৎ পেট ব্যথা করে ওঠে, মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়, পায়ে ঝিঁঝি ধরে।

বসে শুনতেই পারে না।

ভুচুমামার সেই সন্ধ্যার আসরটি অতএব ভেঙেছে। একটা নেকড়ে বাঘের কাছাকাছি বসে, তার গরম গরম নিঃশ্বাসের উত্তাপ অনুভব করতে করতে কে সারা সন্ধ্যা 'কুকুরায়ণ' গান শুনবে বসে বসে?

তার থেকে অনেক কম কষ্টের ভূগোল, হাতের লেখা, অঙ্ক। পরীক্ষা এসে পড়েছে না?

কিন্তু তাতে ভুচুমামার কতটুকুই ক্ষতি হয়েছে? ভুচুমামা সারা সন্ধ্যে ধরে 'লায়নের' সঙ্গেই জমিয়ে গল্প করতে পারেন। আর আমাদের ডেকে ডেকে অবহিত করান, 'এই দেখছিস্? লায়ন তোদের থেকে অনেক বেশী বোঝে। ভাবছি ওকে এবার বর্ণ পরিচয় ধরাবো। ওর যা মেধা, তোদের আগেই ও হায়ার সেকেণ্ডারি দিতে পারবে।'

ভুচুমামার কুকুরের নাম 'লায়ন দি গ্রেট'; ডাকনাম শুধু 'লায়ন'। লায়নের আসবাবপত্র দেখলে তাক লেগে যায়। শাটিনের বিছানা, পলিথিনের বাথটব, স্টেনলেস স্টিলের থালা-বাটি, তাছাড়া টুথব্রাশ শেভিং সেট আরশি চিরুনি, সাবান পাউডার, জুতো মোজা, গরম জামা মাফলার।

ভুচুমামার দিদি বলেন, 'আহা নিজের তো সংসার নেই, ছেলেমেয়ের সাধ মেটাচ্ছে।'

ভুচুমামা শুনে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'সাধ মেটানো? আরে! এ তো অবশ্য কর্তব্য। কুইন এলিজাবেথের পুষ্যি কুকুরের ভাইকে কি আমি ভিখিরির মত মানুষ করবো?'

করেন না।

রাজপুত্রের মতই মানুষ করতে থাকেন। ভুচুমামার ভগ্নীপুত্ররা বেজার মুখে

কুমকুম

আশপাশ থেকে দেখে লায়নের জন্য গ্রেট ইস্টার্ন থেকে মাংস আসছে, ফারপো থেকে পাঁউরুটি। আর দেরাদুন থেকে আসল 'দেরাদুন রাইস' আনিয়ে ভাত রাঁধা হচ্ছে।

কিন্তু সে যাক, বিপদ হচ্ছে লায়নকে কিছুতেই বাঁধবেন না ভুচুমামা। চেনটা তাঁর হাতে সর্বদা ঝোলে বটে, কিন্তু লায়নের গলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নয়। লায়ন মুক্ত-জীব হয়ে ঘুরে বেড়ায় বাড়ির সর্বত্র।

কিন্তু আসল বিপদ আরো আছে, লায়নকে দেখে কেউ ভয় পাচ্ছে দেখলেই রেগে আগুন হয়ে উঠবেন ভুচুমামা। না, ভুচুমামার কুকুরকে দেখে কোন মতেই ভয় পাওয়া চলবে না, আর 'কুকুর' বলা চলবে না।

ভুচুমামার এক বন্ধুর স্ত্রী একদিন বেড়াতে এসে বলেছিলেন, 'আপনার কুকুরটাকে একটু বাঁধুন ভুচুবাবু', সেই সূত্রে চিরকালের মত বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে গেছে ভুচুমামার। আর ভুচুমামার পিসতুতো দাদা বনুমামা যে দিন বলেছিলেন, 'ওরে ভুচু, কুকুর বাঁধ'—সেদিন তিন ঘণ্টা ধরে ধিক্কার শুনতে হয়েছিল বনুমামাকে।

কুকুরকে যারা কুকুর বলে, তারা কত নীচ, কত নোংরা, কত অমার্জিত অসভ্য অসংস্কৃত, তা শুনতে শুনতে বনুমামা পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

তদবধি বনুমামা আর আসেন না।

বন্ধু আর বন্ধুর বউ তো নয়ই।

কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শী আরো তো আছে বিস্তর? তারা এসে করবেই সভয় দৃষ্টিপাত। ভুচুমামা তাতে কৌতুক বোধ করবেন, অমায়িক হাসি হেসে বললেন, 'কিছু বলবে না, কিছু বলবে না!···লায়ন, ওঁদের আদর করে ডেকে আনো তো।'

অসম্ভব বুদ্ধিমান্ লায়ন তার প্রভুর কথা ঠিক বুঝে, আর আধহাত লম্বা জিভটা বার করে এগিয়ে আসে আদর জানাতে।

বলাই বাহুল্য যাঁরা আসেন তাঁদের তখন বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় হয়। ভুচুমামা দরাজ

গলায় বলবেন, 'আরে ভয় কি ? ভয়ের কিছু নেই।...লায়ন, ওঁরা ভয় পাচ্ছেন, ওঁদের হাত ধরে নিয়ে এসো।'

লায়নের হাত নেই, অতএব লায়ন তার দাঁত দিয়ে হাতের অভাব পূর্ণ করতে এগিয়ে যায়, আর ভুচুমামা মহোৎসাহে বলেন, 'দেখছো তো কি রকম কথা বুঝতে পারে ? অসম্ভব বুদ্ধি। একদিনে বর্ণপরিচয় শেষ করেছে। আশ্চর্য ! আমাদের হতভাগা দেশ ! দেশে এত অজস্র ট্রেনিং কলেজ আছে, একটা কুকুর ট্রেনিং কলেজ নেই !'

নেই যখন, কী আর করা !

ভুচুমামা নিজেই ট্রেনিং দেন।

আর শুনতে পাওয়া যায়, লায়ন গড়গড় করে 'এ বি সি ডি' পড়তে শিখে ফেলেছে। লায়ন যোগ-বিয়োগ শেষ করে গুণ-ভাগ শুরু করেছে।

লায়নের মত 'ইয়ে' পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা !' ভুচুমামা বলেন, 'বাড়ির একটা সম্পদ লায়ন !'

ট্রেনিং অন্যদিকেও দিতে থাকেন ভুচুমামা।

লায়নের মুখের মধ্যে হাতের অর্ধেকটা পুরে দিয়ে ডেকে ডেকে দেখান সবাইকে, লায়ন কামড়ায় না। লায়নের দুই কান ধরে উঠিয়ে সোজা দাঁড় করিয়ে দেন ভুচুমামা, লায়ন রাগ করে না। একটুকরো মাংস নিয়ে লায়নের মুখের সামনে রেখে দিয়ে বলেন, 'লায়ন ! খেয়ো না !'

লায়ন খায় না।

লায়নকে বাগানে নিয়ে গিয়ে চরকী পাক খাওয়ান ভুচুমামা, লায়ন বিরক্ত হয় না। লায়নের এই ট্রেনিঙের বিবরণ 'আন্তঃ কুকুর কমিটি কল্যাণ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন ভুচুমামা, আর 'বিশ্ব সারমেয় সংস্থা'র প্রতিযোগিতায় নাম পাঠালেন।

আর 'ডগ'এর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্নে আহ্লাদে ডগমগ করতে থাকেন।

এদিকে ভুচুমামার ভাগনে-ভাগনীর মা বলেন, 'হ্যাঁরে ভুচু, কুকুর নিয়ে মেতে থাকবি, ছেলেমেয়েগুলোকে একটু দেখবি না, ওদের ভবিষ্যৎ যে ঝরঝরে হয়ে গেল ! ফটা তো ক্লাসে ফেল করেছে এবার !'

ভুচুমামা গম্ভীরভাবে বলেন, 'লায়নের কাছে পাঠিয়ে দিও, লায়ন পড়িয়ে দেবে।'

'তুই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস ?' বলেন ভুচুমামার দিদি।

ভুচুমামা আরও গম্ভীর হন ; বলেন, 'এখন তাই ভাবছ, পরে দেখো ! কাগজে লায়নের ছবি ছাপা হয়েছে দেখেছ ?'

ভুচুমামার দিদি কিন্তু আদৌ বিমোহিত হন না, বলে ওঠেন, 'কাগজে ছবি ছাপার আবার বাহাদুরি কি ? ঘটিটা বাটিটাকেও ক্যামেরার সামনে ধরে ছবি তুলিয়ে কাগজে ছাপানো যায়। কুকুর তোকে তুক করেছে।'

ভুচুমামা হাসেন।

ভাবেন হবেই তো ! ফন্তি দিদিমার মেয়ে তো ! বটুক দাদুরও মেয়ে ! এর বেশী আর কী হবে ?

কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই ফন্তি দিদিমার মেয়েও লায়নের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। শুনতে পেলেন লায়ন বিলেত যাচ্ছে ! সেখান থেকে লোক আসছে লায়নকে নিয়ে যেতে। ভুচুমামাও যাচ্ছেন। লায়নের দৌলতে পরের খরচে ঘুরে আসবেন।

গালে হাত দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে ভুচু, সত্যি ?'

ভুচুমামা বললেন, 'সত্যি না তো কি মিথ্যে ? বলি নি আমি তোমাদের, লায়ন হচ্ছে শাপভ্রষ্ট দেবতা। পুরাকালে ওরই পূর্বপুরুষ মহাপ্রস্থানের পথ থেকে নেমে এসে ভারতবর্ষকে বিতৃষ্ণায় ত্যাগ করে স্পেনে চলে গিয়েছিলেন, লায়ন তাঁরই বংশধর। রাজরক্ত ছাড়া আর কোনো রক্ত নেই লায়নের গায়ে।'

দিদি এবার সমীহে স্তব্ধ হয়ে দুহাত জোড় করে একটা নমস্কার করেন। লায়নের উদ্দেশে কি তার পূর্বপুরুষের উদ্দেশে, কে জানে। তারপর দেখতে থাকেন লায়নের বিলেত যাওয়ার তোড়জোড়। ভাল সার্জের পোশাক তৈরী হয়ে আসে লায়নের জন্য, আসে বিলিতী কম্বল।

ভুচুমামার ভাগনে-ভাগনীরা ভাবে,—ইস আমরা যদি আসল রাজবংশীয় কুকুর হয়ে জন্মাতাম !

কুকুরকে যারা কুকুর বলে, তারা কত নীচ, কত নোংরা,·····

[পৃঃ ২০৬

কুমকুম

কি আর করা!

জন্মের আগের ভুল শোধরানো যায় না। তাই ওদের ফ্যালফেলে চোখগুলো একদিন হাঁ করে দেখে মোটর থেকে 'সাহেব' নামলো লায়নকে বিলেত পাঠাবার জন্যে।

আজ টেস্ট করে যাবে, কাল এসে এয়ারড্রোমে নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ ভুচুমামার প্লেনভাড়াও দেবে তারা। কুকুর পিছু একটা করে ট্রেনার বরাদ্দ!

সাহেব নামলো।

বাঙালী সাহেব অবশ্য।

বিশ্ব সারমেয় সংস্থার ক্যালকাটা ব্রাঞ্চের সেক্রেটারী। ভুচুমামার সঙ্গে সহাস্য বাক্য বিনিময় হল তাঁর, চা খেলেন, সিঙাড়া খেলেন, তারপর শুরু হল টেস্ট। শুধু ভাগনে-ভাগনী নয়, দিদি পর্যন্ত জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন হাঁ করে।

হাস্যবদন তালুকদার সাহেবের সামনে শুরু করলেন ভুচুমামা, 'লায়ন, বল, নমস্কার মিস্টার তালুকদার!'

লায়ন বার কয়েক ঘৌ ঘৌ করে উঠল।

ভুচুমামা সগৌরবে তাকালেন তালুকদারের মুখের দিকে।

তালুকদারের মুখের হাসি উজ্জ্বলতর হল।

ভুচুমামা বললেন, 'লায়ন, বল হ্যাল্লো, আপনিও যাচ্ছেন তো বিলেতে?'

লায়ন ঘৌ ঘৌ করে উঠল।

তালুকদার সাহেবের মুখের হাসি অম্লান প্রায়। ভুচুমামার মুখে আত্ম-প্রসাদের আলো।

ভুচুমামা ফার্স্ট বুক, আর বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে এলেন, বললেন, 'লায়ন, পড়।'

লায়ন ফোঁস-ফোঁস করতে করতে তালুকদার সাহেবের দিকে এগিয়ে গেল। সাহেব একটু পিছিয়ে, আলো নিভে যাওয়া মুখে বললেন, 'এটা কি রকম পড়া মশাই?'

ভুচুমামা একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'ওটা হচ্ছে টেস্ট! আপনি ওকে টেস্ট করতে এসেছেন, ও আপনাকে টেস্ট করে নিচ্ছে।'

তালুকদার কপাল কুঁচকে বলেন, 'সেটা কি?'

'দেখুন না।' বলে মৃদু হাসি হাসেন ভুচুমামা। বলেন, 'লায়ন, পড়ে শুনিয়ে দাও।'

লায়ন হাতখানেক জিভ বার করে।

নিঃশব্দে!

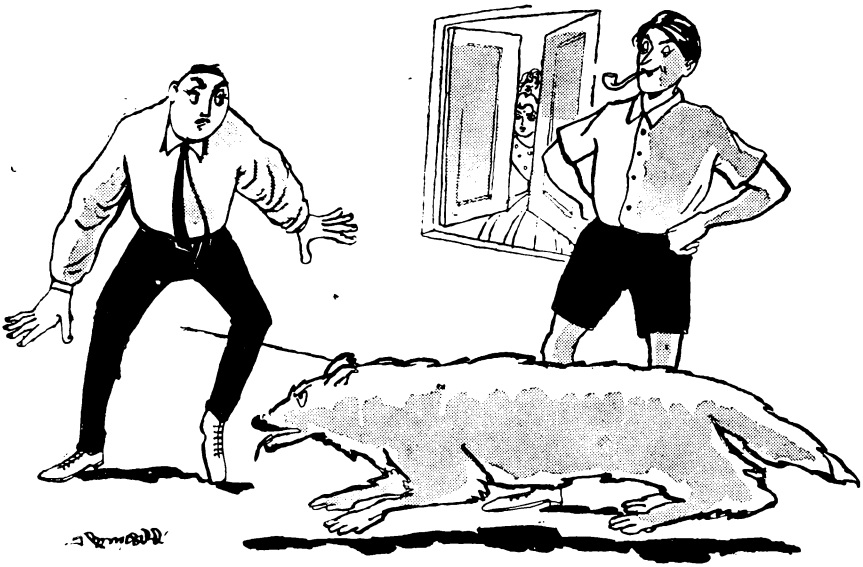

আপনি ওকে টেস্ট করতে এসেছেন, ও আপনাকে টেস্ট করে নিচ্ছে।

ভুচুমামার মুখে ফ্যাকাসে হাসি। ভুচুমামা লায়নের দু কান ধরে সোজা করে তুলে দাঁড় করাতে যান, 'লায়ন, হাতজোড় করে ক্ষমা চাও। ভদ্রলোককে তুমি পড়া শোনালে না—যাও, ক্ষমা চাও—'

লায়ন ঘ্যাক করে উঠল। দাঁড়ানর দিকেও গেল না।

তালুকদার থমথমে গলায় বললেন, 'আমি তো আপনার ট্রেনিং ঠিক বুঝতে পারছি না। মিস্টার রায়!'

ভুচুমামাও থমথমে হলেন; বললেন, 'লায়ন, তুমি আমায় অপ্রতিভ করছো! নমস্কার কর।' আবার কান ধরতে গেলেন ভুচুমামা!

লায়ন আর একবার ঘ্যাক করে উঠল।

তালুকদার সাহেবের মুখ কালো হয়ে ওঠে। বলেন, 'আমি তো ভেবে পাচ্ছি না মিস্টার রায়, আপনার এই অবাধ্য অসভ্য কুকুরকে কেন আপনি—'

'লায়ন!' রেগে আগুন হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ভুচুমামা, 'তুমি আমার মুখ পোড়াচ্ছ, তুমি আমাকে লজ্জায় ফেলছ, একবার অন্ততঃ এ বি সি ডি-টা পড়ে শুনিয়ে দাও তুমি—'

লায়ন তীব্র শব্দে ঘৌ ঘৌ করে উঠল। ভাগ্যিস ফন্তি দিদিমা নেই। থাকলে নির্ঘাত ভিরমি খেতেন।

তালুকদার সাহেব উঠে পড়ে মৃদু হেসে বলেন, 'আপনি বরং আরও কিছুদিন ট্রেনিং দিন মিস্টার রায়, তিন বৎসর অন্তর এই কম্পিটিশান হয়, পরের বারে পাঠাবেন।'

ভুচুমামার মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। ভুচুমামা তবু হলদেটে হাসি হেসে বলেন, 'বিশ্বাস করুন মিস্টার তালুকদার, এ সমস্তই শিখেছে ও, শুধু আজই কেমন 'মুড' দেখছি না। আমার মনে হচ্ছে—আপনার সামনে এইসব ছোটখাটো পরীক্ষা দিতে লজ্জা পাচ্ছে।...বাড়ির মধ্যে থেকে মাংস একটুকরো নিয়ে আয় তো কেউ, দামী পরীক্ষাটা দিক—'

মাংস আনা হল, আর যেই না ভুচুমামা সামনে ধরেছেন, হাঁউ করে খেয়ে নিল লায়ন।

ভুচুমামার মুখে কালো কম্বলের ছায়া, তালুকদারের মুখে ব্যঙ্গের ছুরি।

'মিস্টার রায় আর কটা পরীক্ষা বাকী আছে আপনার?'

ভুচুমামা মরমে মরে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একটা চাবুক এনে বলেন, 'লায়ন! দেখছ? এখনো তুমি ভদ্রলোকের সামনে ঠাট্টা-তামাশা চালিয়ে যাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ

না আমি রেগে যাচ্ছি। আর যে দুটো খেলা আছে ভাল ভাবে খেলে, এঁকে খুশী কর। লাগাও চরকী পাক, এক দুই তিন।'

চরকী পাকটা হচ্ছে, একই কেন্দ্রে স্থির থেকে বনবন করে ঘোরা!

ভুচুমামা সেই চরকী পাকের জন্যে আবার অনুরোধ জানান। লায়ন কিন্তু নির্বিকার! লায়ন নিজের কেন্দ্রে শুধু অটল। লায়ন শুধু থেকে থেকে ঘৌ ঘৌ ঘ্যাক ঘ্যাক করে উঠছে।

তালুকদার বলেন, 'থাক মশাই, ও হবে না। ফর নাথিং আমায় যে কেন চরকী পাক ঘোরালেন তাই ভাবছি। এ কুকুরকে তো আমি পাসমার্ক দিতে পারি না!'

ঘুচে গেল সব আশা!

ভুচুমামা হতাশ গলায় বলেন, 'লায়ন! আমি বুঝতে পারছি না আজ এ রকম করছো কেন তুমি! দেখ, এখনো মুড ফিরিয়ে আনো, এখনো আশা আছে—'

তালুকদার মুচকে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আর কোনো আশা নেই মশাই! সাংঘাতিক লোক আপনি, একটা বুনো কুকুরকে নিয়ে—'

ভুচুমামা বরফ নয়, গঙ্গাজল নয়, মাটি নয়, পাথর নয়। এবার অতএব চটে না উঠে পারেন না। রেগে বলেন, 'আপনি না বিশ্ব সারমেয় সংস্থার সেক্রেটারী? অথচ কুকুর কুকুর করছেন? একটু সম্ভ্রম-বোধ নেই? সংস্থার নিয়মাবলীর প্রথম পাঠ কুকুরকে কুকুর না বলা, জানেন না?'

তালুকদার বীরদর্পে বলেন, 'জানি, কিন্তু মানি না। মানুষকে মানুষ বললে দোষ হয় না, পাখিকে পাখি বললে দোষ হয় না, হাতিকে হাতি, অথবা বাঘকে বাঘ বললে দোষ হয় না, শুধু কুকুরকে কুকুর বললেই দোষ! আপনার এই কুকুরটা হচ্ছে নেহাত কুকুর বুঝলেন? পয়লা নম্বরের বুনো একটা কুকুর।...ওকে আপনি শিক্ষিত মানুষ বলে চালাতে চাইলেই তো হল না? এই কুকুরটাকে—'

মুখের কথা মুখেই রইল তালুকদারের, আঁ আঁ করে উঠলেন পরিত্রাহী স্বরে।...

তারপর?

তারপর ভুচুমামার নামে নালিশ ঠুকেছেন বিশ্ব সারমেয় সংস্থার সেক্রেটারী,

ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খ্যাপা কুকুরের কামড় খাওয়ানোর জন্য। ভুচুমামাও উলটে নালিশ ঠুকেছেন লায়নকে অপমান করার অপরাধে। বলছেন, 'খ্যাপা ছিল না, অপমানে খেপে গেছল। প্রথম থেকেই তালুকদার ওর প্রতি অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছেন। অপমানে মানুষ পর্যন্ত খেপে উঠে কামড়াতে পারে, তা ইয়ে। আর ও কি যে সে? লায়ন দি গ্রেট না?'

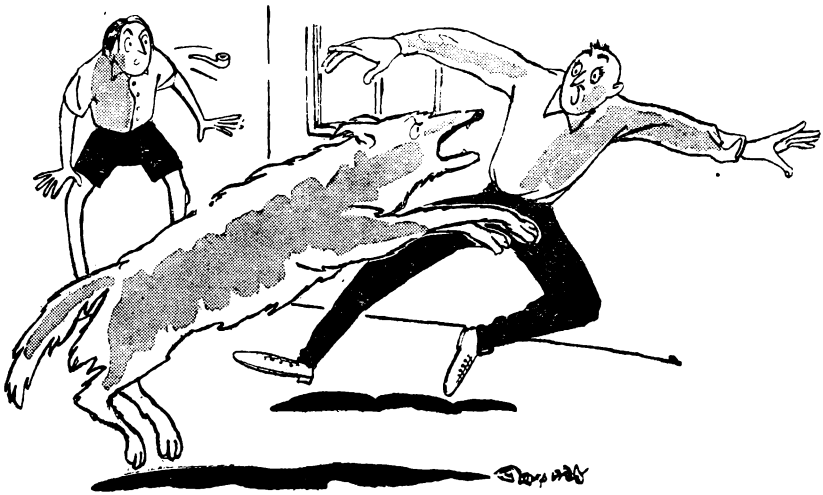

মুখের কথা মুখেই রইল তালুকদারের, আঁ আঁ করে উঠলেন পরিত্রাহী স্বরে।··· [পৃষ্ঠা ২১২

মনের মত পয়সা খরচ হচ্ছে এখন। লায়নের আদর আরো বেড়ে গেছে।

ভুচুমামার ভাগনে-ভাগনীরা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলছে, 'বৃথাই লায়নকে 'পাত্র' দেখার দিন চোখে একমুঠো লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হল রে! ওদের লোকসান হল, আমাদের লাভ হল না কিছু। একবার যে কুকুর ভজেছে, সে আর—'

আড়ালে ওরা লায়নকে কুকুরই বলে, সামনে কদাচ না। কে জানে বাবা কখন অপমানে খেপে গিয়ে—

সকালবেলা বাড়ির মলাটে বসে চা খেতে খেতে, কি খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে, দাড়ি কামাতে কামাতে, কি গোঁফ ছাঁটতে ছাঁটতে, রোজই এ দৃশ্য দেখতে পান ঘন্টুবাবু।

কী হলো? বাড়ির মলাট আবার কি জিনিস তাই ভাবছো? আরে বাড়ির মলাট হচ্ছে—তার রাস্তার ধারের বারান্দা!

বিচ্ছিরী কাগজে ছাপা, আর ছাপার ভুলে ভরা বইয়ের রংচঙে, ছবিদার মলাটের মতই, ঘন্টুবাবুর এই বাসার এই কাচ আর গ্রীল বসানো বারান্দাটি। ঘন্টুবাবু তাই ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত সারা সকাল এইখানটিতেই বসে থাকেন। নেহাত অফিসের বেলা হচ্ছে দেখলেই—

বসে থাকেন, চা খান, খবরের কাগজ পড়েন, দাড়ি কামান, আর গোঁফ ছাঁটেন। এইটিই ঘন্টুবাবুর বিলাস। সময় পেলেই কাঁচি নিয়ে আর আরশি নিয়ে পড়েন। তবে তারই ফাঁকে ফাঁকে নীচের রাস্তাটিও মুখস্থ করে ফেলেন।

সকালবেলা দুধের বোতল হাতে ভৃত্যকুল এবং বালকবালিকা-কুল, ঈষৎ বেলায় বাজারের থলি হাতে কর্তাকুল, সকাল থেকে বেলা নটা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়ানো ঝি-কুল, স্কুলের মর্নিং সেকশনের ছাত্রছাত্রী-কুল চলেছেই—রাস্তার এদিক্ থেকে ওদিকে। এসব দেখেন ঘন্টুবাবু, কিন্তু এসব তো দৃশ্য নয়?

কিন্তু ওই যে ফুটপাথ দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মোড় ঘুরছেন, ওই ফরসা বেঁটে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ? উনিই হচ্ছেন 'দৃশ্য'। যান যখন, যেন দিগ্বিজয়ে যাচ্ছেন। ঘন্টুবাবু ঘড়ি দেখেন সাতটা দশ।

তবে ভদ্রলোক এই সকলের সঙ্গে সোজা পায়ে এগিয়ে যান না, একটু এগিয়ে, ওই ডানদিকের মোড়ে ঘুরে যান। সেই যাওয়াটাই কৌতূহলের।

আবার ঘন্টুবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে, কি গোঁফ ছাঁটতে ছাঁটতে, দেখতে পান ভদ্রলোক মোড় ঘুরে ফিরছেন রাজ্যজয়ীর ভঙ্গীতে। ঘন্টুবাবু জানেন, এখন ঘড়ি দেখলেই দেখতে পাবেন আটটা দশ।

ঠিক একঘণ্টা কাঁটায় কাঁটায়।

আগে ঘন্টুবাবু বারান্দায় বসে থেকেও বারে বারে উঠে ঘরে ঢুকে ঘড়ি দেখে নিতেন পাছে অফিসের বেলা হয়ে যায়। আর ঘড়িটা মিলিয়ে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে রেডিও খুলে দিতেন। রান্নাঘরে যখন কড়া খুন্তি হাঁড়ি হাতার ঐকতান, উঠোনে ঝিয়ের হাতে বাসনের নৃত্যনাট্য, এবং ছেলেমেয়েদের পড়া মুখস্থর উচ্চাঙ্গের সংগীত, সেই সময় ঘন্টুবাবুর ওই রেডিও উন্মোচন।

ঘন্টুগিন্নী রেগে আগুন হন।

ঘন্টুগিন্নী রেগে আগুন হন।

ঘন্টুবাবু যে গিন্নীর মাথার কলকবজা বিগড়ে দেবার জন্যেই এই মোক্ষম সময় রেডিও খোলেন, সেই নিয়ে রাগারাগি করেন। বলেন, 'ঘড়ি মিলোতে ক' ঘণ্টা লাগে ?'

● ছাঁটা গোঁফ ও ঝাঁটা গোঁফ

কুমকুম

কোনো একটা প্রোগ্রাম শেষ না হলে যে মিলোনো সম্ভব নয়, একথা বোঝানো যায় না তাঁকে। মানে যেত না। এখন আর বোঝাতে হয় না। কারণ এখন আর রেডিওর চাবি খুলতে হয় না ঘন্টুবাবুকে। ওই বেঁটে ভদ্রলোকের গমন বা প্রত্যাগমন দুইয়ের যে কোনো একটা দেখলেই ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারেন। নেনও তাই।

এ পাড়ায় ঘন্টুবাবু মাস ছয়েক এসেছেন।

আর কিছুদিন দেখতে দেখতেই ওই ভদ্রলোকের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। ঘড়ি মিলোচ্ছেন ওঁর ওই আসা-যাওয়ার গতিপথে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক চিন্তা হয়েছে ঘন্টুবাবুর মাথায়। নিত্য নির্ভুল নিয়মে যান কোথায় ভদ্রলোক—পরনে যাঁর খাটো ধুতি, গায়ে দু বুকে পকেটওলা খাকি বুশকোট, পায়ে ডার্বি সু?

এই চিন্তা ঘন্টুবাবুকে ব্যস্ত করে তুলেছে।

অথচ ব্যস্ত না হলেও ক্ষতি ছিল না। যাচ্ছে যাক না।

কিন্তু তাই যদি হবে 'কৌতূহল' নামক ভূতটা আছে কেন? ঘন্টুবাবু সেই ভূতাক্রান্ত।

কোথায় যায় লোকটা?

ভদ্রলোকের নাম জানেন না ঘন্টুবাবু।

জানবার কথাও নয়।

কারণ নিজের নামটা কপালে সেঁটে, অথবা পিঠে ঝুলিয়ে যাতায়াত করেন না তিনি। তবে চেহারাটা নিয়ে যাতায়াত করেন, কাজেই সেটা নিত্য দু বার করে দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে ঘন্টুবাবুর।

ফরসা বেঁটে, দিব্য স্বাস্থ্যসম্পন্ন, বয়েস পঞ্চাশের ওধারে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, আর নাকের নীচে এ যুগে যা বিস্ময়, আর ঘন্টুবাবুর সঙ্গে বিপরীত, দু মুঠো ঝাঁটার মত খোঁচা গোঁফ। যেন সেই 'হেড্ অফিসের বড়বাবু!'

কুমকুম

ভদ্রলোকের গতিভঙ্গীতে বেশ একটা বীরপুরুষ বীরপুরুষ ভাব।

তা একপক্ষে বীরপুরুষই।

উনিশশো সাতষট্টির মধ্যভাগে, কলকাতা শহরে, প্রকাশ্য দিবালোকে, খোলা রাজরাস্তায় এহেন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বেড়ানো বীরত্বের কথা বই কি!

কিন্তু—

সেই চিন্তা ঘন্টুবাবুর। যান কোথায় ভদ্রলোক!

ঘন্টুবাবু এই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন।

প্রথমে ভেবেছিলেন, কোথায় আর যাবে এমন একটা আধবুড়ো লোক? অবশ্যই বাজারে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে হলো। বুদ্ধি বললো, বাজারে যদি তো—'বাজার' কই? আর ঝুলিই বা কই হাতে? মোটা চটের থলি, ফুলকাটা-চটের থলি, বর্ডার-টানা লাল নীল সবুজ হলদে ক্যাম্বিসের থলি, প্লাস্টিকের সাজি, বেতের বাস্কেট, নিদেন পক্ষে পুরনো-বালিশের ওয়াড়, কি গিঁট-দেওয়া ঝাড়ন! কিছুও তো থাকবে?

কিন্তু এ ভদ্রলোক মুক্তহস্ত।

তবে আর বাজার হয় কি করে?

তাহলে?

হঠাৎ একদিন ঘন্টুবাবু চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, তাহলে "গঙ্গাস্নান"। আবিষ্কারের আহ্লাদ চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল ঘন্টুবাবুর। ঠিক ঠিক, অনেকেরই নিত্য গঙ্গা-স্নানের অভ্যাস থাকে। এই তো দু পা এগিয়ে মোড় ঘুরলেই গঙ্গা! যে দিকে মোড় ঘোরেন ভদ্রলোক।

কিন্তু কই?

গঙ্গাস্নানের মতই বা কই?

তারও তো কিছু আসবাব থাকে—যেমন তেল, গামছা, বাড়তি কাপড়।

ভদ্রলোকের কাছে তো সে সবের বালাই নেই। ফেরেন যখন তখনও মাথা শুকনো। কাপড়-জামা শুকনো, গোঁফ জোড়াটি পর্যন্ত নির্জলা।

তবে আর কী করে গঙ্গাযাত্রী বলা যায়?

তবে কি টিউশানী করেন ভদ্রলোক ?

তাতে অবশ্য শুধু হাতেই আসা যাওয়া।

মানে, বিশেষ ইচ্ছে আর বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও ছাত্রের পিঠে ভাঙ্গার জন্যে বেত টেত তো নিয়ে যাওয়া যায় না ?

তাহলে তাই।

দু-চারদিন তাই ভেবেই নিশ্চিন্ত রইলেন ঘন্টুবাবু, কিন্তু আবার মাথায় চিন্তা-কীট ! টিউশানী করতে যাবেন, এমন বাড়ি কই ওদিকে ? ওই মোড়টা ঘুরলেই তো শ্মশানঘাট ! হ্যাঁ শ্মশানঘাট ! বছর তিনেক ধরে খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে এই ঘাটের কাছে ছাড়া বাসা জোটাতে পারেন নি ঘন্টুবাবু। যেখানে দিনদুপুর নেই, রাতদুপুর নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, আচমকানো বুক-চমকানো—'বলহরি হরিবোল !'

ছোটদের তো দূরের কথা, বড়দেরই সে শব্দে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এসে পর্যন্তই তাই আবার বাসা খুঁজছেন ঘন্টুবাবু।

অবিশ্যি আবার বাসা যোগাড় করতে করতে হয়তো বাসার আর দরকারই থাকবে না। ততদিনে 'বলহরি' শুনে শুনে কান এমন 'মাঞ্জা' দেওয়া হয়ে যাবে যে, না শুনতে পেলেই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে।

অথবা ঈশ্বর না করুন, ঘন্টুবাবু নিজেই 'বলহরি' হয়ে যাবেন।

সে যাক্।

একদিন তো সবাই যাবে।

কিন্তু ওই ছাঁটা-মাথা ঝাঁটা-গোঁফ কোথায় যান তার হদিস না পেলে ঘন্টুবাবুর ভাত হজম হচ্ছে না।

একদিন বিকেলে রাস্তায় নেমে গুটি গুটি ওদিকটায় একটু এগিয়ে দেখেও এসেছিলেন ঘন্টুবাবু, কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে নিত্য বেড়াতে যাবার মত কোনো জায়গাখুঁজে পান নি। মোড়টা ঘুরলেই তো পানের দোকান, ডাব-লেমনেডের দোকান, 'শবদেহের ফটো তোলা হয়'-এর দোকান, 'শ্মশানঘাট পৌরপ্রতিষ্ঠান অফিস',

● ছাঁটা গোঁফ ও ঝাঁটা গোঁফ

কুমকুম

'শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির', কাঠের গুদাম, 'যাবতীয় সরবরাহের কেন্দ্র', আর তার পরই ঘেরা পাঁচিলের মধ্যে শ্মশান।

তারপর মা গঙ্গা!

অতএব কি?

ভদ্রলোক কি পিশাচসিদ্ধ হতে তন্ত্রসাধনা করতে যান শ্মশানভূমিতে?

ঘন্টুবাবু ভদ্রলোকের অবয়ব অবলোকন করেন। চিন্তা করেন। প্রখর দিবালোকে পিশাচসিদ্ধি? অসম্ভব। আর ঘড়ি ধরে ওসব সিদ্ধাই টিদ্ধাই হয় না কি?

ঘন্টুবাবু খবরের কাগজের মার্জিনে টুকতে থাকেন তাঁর মানস চিন্তা।

কালী কীর্তনের আসর?

যোগ-ব্যায়ামের আখড়া?

তাসের আড্ডা?

দাবা? পাশা? লুডো? ডাংগুলি? লাট্টু? মার্বেল? মাছধরা? সাঁতার?

লেখেন, আর মাথা নাড়েন।

এর কোনোটাই ভদ্রলোকের চেহারা বা সাজসজ্জার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না! তবে কি হবে? ছাঁটা-গোঁফ ঘন্টুবাবু কি ওই ঝাঁটা-গোঁফের চিন্তায় চিন্তায় পেট ফুলে মারা যাবেন? বাঁচবার কোনোই পথ নেই?

আছে!

পথ আছে। শেষ পথ।

শুধু সে পথে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা!

তা শেষ পর্যন্ত সেই সাহসীর শেষ পথ গ্রহণ করলেন ঘন্টুবাবু। একদিন বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে ভদ্রলোকের প্রত্যাগমনের পথে, প্রশ্নে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

'মশাই, প্রতিদিন আপনি ঠিক একই সময়ে একটি ঘণ্টার জন্যে কোথায় যান বলুন তো?'

ঝাঁটা-গোঁফের গোঁফ দুটি আরো খোঁচা হয়ে উঠলো। তিনি ভুরু

কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'সে কথা আপনাকে বলতে বসবো কেন বলুন তো?'

'সে কথা আপনাকে বলতে বসবো কেন বলুন তো?'

ঘন্টুবাবু থতমত খেয়ে বলেন, 'আজ্ঞে না, মানে রোজ যান, দেখতে পাই কিনা!'

'দেখতে পান?'

ভদ্রলোক ঘন্টুবাবুর আপাদ-মস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন, 'শুনে, কেতার্থ হলাম। দেখেন, উত্তম করেন। ভগবান চোখ দিয়েছেন, পৃথিবীর দ্রষ্টব্য সকল দেখবেন বই কি। কিন্তু তারপর আবার কেন? এই তো আমিও তো আপনাকে দিনে দুবার করে দেখি, কই ঠেলে উঠে জিগ্যেস করতে যাই না তো,—মশাই, আপনি রোজ সকালে বসে থাকেন কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক একটু আত্মপ্রসাদের ভঙ্গীতে হাসেন।

ছাঁটা-গোঁফ ঘন্টুবাবুও ঝাঁটার হুমকিতে মনে মনে দমলেও সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলেন, 'তা অবিশ্যি করেন না। আমারও উচিত হয়নি জিগ্যেস করা। তবে কি জানেন? আমার হৃদয়ে একটু কৌতূহল বেশী, তাই—'

'কী বললেন? হৃদয়ে একটু কৌতূহল বেশী?'

হঠাৎ সেই ঝাঁটার গোছার অন্তরালে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, 'হা হা হা! অ্যাঁ।

হৃদয়ে ? কৌতূহল জিনিসটা যে হৃদয়ে থাকে তা তো জানতাম না মশাই ! তা লোক দেখছি আপনি ভালই। নিজমুখে 'হৃদয়ের পাপ' ব্যক্ত করলেন।...সবাই করে না। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে কৌতূহল মেটায়। ও সব লোককে দু চক্ষে দেখতে পারিনে বুঝলেন ? অথচ আপনি নিজের দোষের কথা ব্যক্ত করলেন। শুনে বড় আনন্দ পেলাম।'

ঘন্টুবাবু খুশী-খুশী মুখে বলেন, 'তবে তো মিটেই গেল। এখন আর বলতে বাধা কি কোথায় যান ?'

ঝাঁটা-গোঁফ মিটি-মিটি হেসে বলেন, 'হুঁ, লোক ভাল হলে কি হবে, আপনি এদিকে একটি 'ভবি' ভুলবার ছেলে নয়। কিন্তু আপনার না হয় কৌতূহল প্রবল, আমার কী দায় সে কৌতূহল মেটাবার ?'

ঘন্টুবাবু বলেন, 'তা অবশ্য দায় নেই।'

'নেই ? নিজ মুখে বলছেন ? তবে তো দায় এসেই গেল। তাহলে বলেই ফেলতে হয়। ব্যাপারটা কি জানেন ? ব্যাপারটি একটু গোপনীয়। তবে আপনার যখন 'হৃদয়ের' ব্যাপার, না বললে হয়তো ঘুমই হবে না। কৌতূহল জিনিসটা বড় সাংঘাতিক বস্তু কিনা। যাই—'লাইন' দিতে !'

লাইন দিতে।

যাই লাইন দিতে !

ঘন্টুবাবু তাজ্জব বনে যান। লাইন দেওয়ার মধ্যে গোপনীয় কি আছে ? এই তো তাঁর বাড়িতেই তাঁর দুই ছেলে সর্বদাই এতে ওতে 'লাইন' দিচ্ছে।

ঘন্টুবাবু তাই চোখ গোল করে বলেন, 'ওর মধ্যে আর গোপনীয় কি আছে মশাই ? এযুগের সবাই তো লাইন দিচ্ছে। সব কিছুর জন্যেই দিচ্ছে।'

'দিচ্ছে !' ঝাঁটা-গোঁফ উদাত্ত স্বরে বলেন, 'সব নিয়েই দিচ্ছে। চটি থেকে চণ্ডী, চাল থেকে 'চিলু'। বাপ পিতমোরা জীবনে কখনো রেল লাইন ছাড়া আর কোন লাইন মেনে চলেন নি বলেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা। এই লাইনের জাঁতাকলে পড়ে বেঁচে থাকার 'ফাইন' দিয়ে চলেছি।'

ঘন্টুবাবু বিমুগ্ধ গলায় বলেন, 'আপনি তো বেশ কথা বলেন মশাই !'

কুমকুম

ঝাঁটা-গোঁফ হঠাৎ হাসিতে গর্জে ওঠেন, 'কথা তো আপনি গজায় মশাই! জানেন না 'চাপ পড়লেই বাপ্ বেরোয়।' কথা তো ছার কথা, লাইনের মহিমায় বলে কবিতাই লিখে ফেললাম।'

'কবিতা।'

ছাঁটা-গোঁফ ওই ঝাঁটা-গোফের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। ওঁর মুখে কবিতার কথা! ওঁর মগজে কবিতার চাষ!

ঝাঁটা-গোঁফ বলেন, 'অবাক্ হচ্ছেন? তা হতে পারেন। চেহারাটা তো আমার ঠিক কবি কবি নয়! কিন্তু রূপেতে কী করে মশাই, রূপেতে কী করে? শুনবেন আমার কবিতা?'

বেশ একটু মাইডিয়ারি হাসি হাসেন ভদ্রলোক।

ঘন্টুবাবু অবাক্ গলায় বলেন, 'এই রাস্তার মাঝখানে?'

'তাতে কি?' ঝাঁটা-গোঁফ আবার হো-হো করে হেসে ওঠেন, 'আরে মশাই, এ তো রাস্তারই কবিতা।'

ভদ্রলোক হঠাৎ আঙুল উঁচিয়ে শুরু করে দেন—

'এ কী লাইন এলো দেশে দাদা,
কী লাইন এলো দেশে!
সকল 'লাইন' ঘুচিয়ে দিল লাইন সর্বনেশে।
রেশনে ও কেরোসিনে
লাইন জানি লাগে,
পাঁউরুটিতে লাইন লাগে, কে শুনেছে আগে?
হাওড়া স্টেশন তাকিয়ে দেখো—
লাইন, ট্যাক্সী পেতে,
ট্রামে বাসে লাইন দেখো, পথে যেতে যেতে।
পয়সা আছে? বিদেশ যাবে?
কথা ভারী সাদা?

কুমকুম

ট্রেনের টিকিট কিনতে গিয়ে লাইন দেখুন দাদা।
খেলার মাঠের কথা ?
কী আর বলবো মহাশয়,
সে দুর্গতি, কেবলমাত্তর মানুষ বলেই সয়।
তবে দাদা, সবার বড়ো
লাইন সিনেমার।
এ সংসারে যে লাইনটি সব লাইনের সার।
কিন্তু শুনুন চুপি, চুপি—
আরো আছে ভাই !
রোজ সকালে সেইখানেতে লাইন দিতে যাই।'

মুখে মুখে এই টানা লম্বা লাইনগুলি উচ্চারণ করে ভদ্রলোক মুচকি হেসে বলেন, 'বুঝলেন কিছু ?'

ঘন্টুবাবু হতাশ গলায় বলেন, 'সবটাই বুঝলাম, শুধু আসলটুকুই বুঝলাম না। শেষকালে চুপি চুপি যা বললেন, সেটাই তো না বোঝা রয়ে গেল !'

'না বোঝাই রয়ে গেল ?' ভদ্রলোক মৃদুহাস্যে বলেন, 'বিশদ বলতে হবে ? যাই শ্মশানে, চিতায় লাইন দিতে !'

ঘন্টুবাবু শিউরে উঠে বলেন, 'তার মানে ?'

'তার মানে ? আপনি দেখছি হালফিলের খবর রাখেন না ! শ্মশানে চিতার জন্যে মড়াদের লাইন পড়ছে জানেন না ? যে পিছনে পড়ে যাবে, তাকে রাজা দশরথের মতো বাসিমড়া হতে হবে। এ খবর শোনা মাত্তরই লাইন লাগাতে লেগে গেছি দাদা !'

'লাইন লাগাতে লেগে গেছেন !'

ঘন্টুবাবুর ছাঁটা গোঁফও প্রায় ঝাঁটা হয়ে ওঠে।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বলেন, 'লাগাব না ? মরে কি শেষে বাসিমড়া হবো মশাই ? প্রত্যহ সকালবেলা এসে পাক্কা একটি ঘণ্টা লাইন দিয়ে অধিকার পাকা করে, অধিকার-চিহ্নে একখানা থানইঁট বসিয়ে রেখে চলে আসি।'

ঘন্‌টুবাবু অবাক্‌।

'ইঁটটা থাকে ?'

গটগট করে চলে যান বীরের ভঙ্গীতে।

'থাকবে না ?'—ভদ্রলোক দৃপ্ত গলায় বলেন, 'ইঁটের গায়ে নাম ঠিকানা লিখে রাখি নি ? কোনো দিন যদি বেড়াতে যান ওদিকে, দেখবেন—একখানা দাঁড়-করানো ইঁটের গায়ে নীল কালিতে লেখা আছে—'ভাবী চন্দ্রবিন্দু শ্রীচিন্তাশীল চট্টরাজ। খেংরা-পট্টি, মেছুয়াবাজার, কলিকাতা-নয়।' আর এদিক্‌ ওদিক্‌ হয় ? বুদ্ধি হ্যাজ মশাই, বুদ্ধি হ্যাজ !'

হঠাৎ পকেট থেকে একটি গোল ঘড়ি বার করে চিন্তাশীল চট্টরাজ চমকে বলে ওঠেন, 'ইস ! কী বিচ্ছিরি দেরি হয়ে গেল ! গিয়ে তো এখন আবার বাথ-রুমের দরজায় লাইন দিতে হবে। ভাইপো ব্যাটাদের সকলেরই অফিস টাইম !'

গটগট করে চলে যান বীরের ভঙ্গীতে—ঝাঁটা গোঁফ উঁচিয়ে।

—আর ছাঁটা-গোঁফ ঘন্‌টুবাবু বিচলিত চিত্তে ভাবেন, ওই ভোঁদা লোকটার কাছে দূরদর্শিতায় হেরে যাবো ? না কি আরো সুদূরদশা হয়ে একেবারে স্বর্গের দরজায় লাইন দিয়ে ইঁট পেতে রেখে আসবো নাম-ঠিকানা লিখে ?

এই যে বাপী, মাধু, তোরা কতক্ষণ? অনেকক্ষণ? মা এসেছে? এসেছে! বেশ বেশ! বোস। পূজোর ছুটি হয়ে গেছে? হয়নি এখনো? মহালয়ার দিন থেকে হবে? বাবা! আমাদের আমলে আরো আগে ছুটি হয়ে যেত। তা' ছুটিতে যাচ্ছিস না কি কোথাও? যাচ্ছিস?...অ্যাঁ পুরী যাচ্ছিস!...পুরী যাচ্ছিস সবাই মিলে!...আরে না না, চমকাবো কেন? পুরী তো অতি উত্তম জায়গা।...

তীর্থ বলতে তীর্থ, তারপর তোদের গিয়ে স্থাপত্য শিল্পের নমুনা, এদিকে আবার শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যাপার আছে! দেখেছিলি তো সিনেমাটা? 'নীলাচলে মহাপ্রভু!' তাছাড়া কত বাজার, দোকান, যেখানে তোর মা আর পিসী পড়ে থাকবে! আর সমুদ্দুর তো আছেই। যার তুলনা নেই।

পুরী অতি উত্তম জায়গা।

কুমকুম

তবে কি জানিস, আমার—ওই পুরী শুনলেই চোখের সামনে দুলে ওঠে একটা দড়ির ফাঁস লাগানো গলা। আর লড়বড়িয়ে ঝুলে পড়া দুখানা মোজা পরা পা!···আরে ও কি কাছে ঘেঁষে আসছিস কেন? ভয় পাচ্ছিস না কি? দূর পাগলা! ও সব কি আজকের কথা? মনে কর আমি যখন এই তোদের মত বয়সের, তখনকার কথা। তার মানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাপার!

তা সেই সময় আমাদের একবার পুরী যাওয়া হয়েছিল, আর—না বাপু থাক্, ও গল্পে কাজ নেই। তোদের আবার ভয় লাগবে!

কি বলছিস? ভয় লাগবে না? বলতেই হবে গল্পটা?

তবে শোন। বোস গুছিয়ে।

আমাদের আমলে, তোদের মতন এমন বছরে তিনবার বেড়াতে যাওয়ার ফ্যাশান ছিল না। গেরস্ত লোকে জন্মের মধ্যে কর্ম হয় তো একবার পুরী যেতো কি কাশী যেতো, বৃন্দাবন মথুরা গেল তো খুব গেল! বড়লোকের কথা বলছি না অবশ্য, আমাদের মত গেরস্তদের কথা হচ্ছে।

সে আমলে আমরা ত্রিবেণী তারকেশ্বর কি চুঁচড়ো চন্দননগর যাওয়াকেই দেশ-ভ্রমণ বলতাম। শুধু আমরাই নয় অন্যরাও। সে ভ্রমণের ভ্রমণকাহিনীও বেরোতো।

হাসছিস?

আরে বাবা সত্যি, সত্যি, তিন সত্যি। মনে আছে, ছেলেবেলায় কোন একটা পত্রিকায় ছ'মাস ধরে ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী পড়েছি 'আঁড়িয়াদহে আড়াই দিন।'

তা হলেই বোঝ।

আর দেওঘর, মধুপুর, গিরিডি?

সে তো রীতিমত বিদেশ যাত্রা!

সে কাহিনী ফলাও করে লেখবার মত।

তা সেই আমলে, মা একবার ধরে বসলেন এবার ছেলেদের নিয়ে গরমের ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হোক।

কুমকুম

বাবা বললেন, 'তা আমার তো আর গরমের ছুটি নেই ?'

'নেই, নিতে হবে। এক মাস ছুটি নেবে তুমি। কখনো কোথাও যাওয়া হয় না'—

অগত্যাই বাবাকে রাজী হতে হলো।

ছুটির দরখাস্ত করলেন।

তারপর শুরু হলো—কোথায় যাওয়া হবে।

সম্ভব অসম্ভব অনেক জায়গার নাম উঠল, আবার তার খণ্ডনও হলো। এক এক জায়গায় এক এক ভয়াবহ অসুবিধে। কাশীতে গরম, দেওঘরে জলকষ্ট, মধুপুরে চোর, গিরিডিতে সাপ। তা ছাড়া এমনও সব দেশ আছে যেখানে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না।

অতএব ?

অতএব পুরী।

পুরীতে না কি অগাধ ভাড়াটে বাড়ি আছে, আর চিঠি লেখালেখি করে একটা বাড়ি ভাড়া করে ফেলা নিধুমামার কাছে না কি কিছুই নয়।

ও, নিধুমামার কথা তোরা জানিস না বুঝি ? কি করেই বা জানবি ? নিধুমামা হচ্ছেন আমার মায়ের কি রকম যেন ভাই, কিন্তু নিজের ভাইয়ের অধিক। মার যা কিছু ফরমাশ খাটতে এক পায়ে খাড়া। সত্যি বলতে, ওই বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে মা তো বাবার থেকে নিধুমামার ভরসাই বেশী করছেন।

অবশ্য আরো একটি ভরসাস্থল আছে মার, তিনি হচ্ছেন কুলুকাকা। কুলুকাকাও বাবার কি রকম যেন ভাই, নাম কালীপ্রসাদ, অপভ্রংশে কুলু।

কুলুকাকা আর নিধুমামা দুজনকেই আমরা ভীষণ ভালবাসতাম, কারণ ওঁরা এলেই এমন জমিয়ে বসতেন যে মা লক্ষ্য করতে ভুলে যেতেন আমরা পড়ছি কি গল্প গিলছি।

তা আসতেন ওঁরা মাঝে মাঝেই।

আর সেই আসার দিনগুলি আমাদের কাছে সুখের দিন বলে পরিগণিত হতো।

কুমকুম

তবে ভারী মজা লাগতো—যদি কোনোদিন দুজনেই এক সঙ্গে এসে হাজির হতেন। লেগে যেত বেশ একটি ধুন্ধুমার।

মানে ঝগড়াঝাঁটি কি আর?

শুধু বাক্‌যুদ্ধ!

দুজনেরই হচ্ছে বিশ্বনস্যাৎ ভাব, আর অন্যকে ডাউন করবার তাল, তাই ইনি ওঁকে আর উনি এঁকে নস্যাৎ আর ডাউন করতে থাকেন, (মানে স্মার্ট আর অতি বক্তাদের যা হয় আর কি!) আর আমরা সেই মনোরম পরিবেশটি উপভোগ করি।

তবে মাঝে মাঝে যেন নিধুমামাই জিতে যান। কারণ ব্যঙ্গাত্মক ভাষার উপর তাঁর দখলটা বেশী। এবং তর্কে পরাস্ত হওয়ার মুখে ব্যঙ্গটাই তো জেতবার প্রধান অস্ত্র।

কুলুকাকা একটু গোঁয়ার প্যাটার্নের, তাই চটে উঠে হেরে যান।

সত্যি বলতে, আমাদের সেটা তেমন ভাল লাগে না, ইচ্ছে হয় নিধুমামা হারুন, কিন্তু হয় না বড় একটা।

তা আমাদের যখন পুরী যাওয়ার তোড়জোড় চলছে, তখন কুলুকাকার মামার বাড়িতে কার যেন বিয়ে, মহাব্যস্ত। কাজেই অনেক দিন আসছেন না। নিধুমামাই নিরঙ্কুশ কাজ করে চলেছেন।

প্রথম কাজ তো বাড়ি ঠিক করা, তা সেটা তিনি করে ফেলেছেন।

ভাড়া একটু বেশী। মানে তখনকার দিনে বেশী, এখন সে ভাড়া শুনলে তোরা চোখ গোল করে ফেলবি। তা সে যাক্, ভাড়া বেশী হলেও বাড়ি চমৎকার। একেবারে সমুদ্রের ধারে, পুব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, ঈশান নৈর্ঋত, বায়ু, অগ্নি ও ঊর্ধ্ব—এই ন'টা দিক্‌ই খোলা, বন্ধ শুধু ওই একটাই দিক্ অধঃ! তা ওটা তো আর খোলা থাকা সম্ভব নয়? বাঞ্ছনীয়ও নয়।

তাই বললেন নিধুমামা, 'ন'টা দিক নিয়েই হিমশিম খাবে তোমরা, বাকী যা ওই একটা দিক্, ওটা কিছু আর খোলা থাকা চাইবে না তোমরা? আরো একটা কত বড় সুবিধে জানো? বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়।'

শুনে তো আমরা থ।

কুমকুম

কোন্ মুখো তবে বাড়িটা? পিছন দিক্ তো থাকবেই একটা, নিধুমামা বললেন, 'ওই তো মজা! এমন কৌশল করা প্ল্যান, যে সব ঘরই সমুদ্র মুখো। আছে, পিছন দিকে রান্নাঘর চাকরের ঘর এই সব আছে।'

'কটা ঘর নিধুমামা, কটা ঘর?'

হইচই করে উঠি আমরা।

মানে আমরা পৌনে এক ডজন ভাইবোন।

হ্যাঁ রে বাপু, আমাদের আমলে এক ডজন পৌনে ডজন ভাইবোন প্রায় সকলেরই থাকতো, অন্ততঃপক্ষে আধ ডজন। তোমাদের মত এখন 'তুই আর মুই' হতো না। কাজে কাজেই নিজেদের একটা দল ছিল আমাদের, নিজস্ব জগৎও ছিল একটা। আমরা ভাইবোনেরা পরস্পরের সুখদুঃখ বুঝতাম, ঝগড়া ভাব দুই মিলিয়ে বেশ ভরাট ভরাট ভাবে থাকতাম।

'কটা ঘর, নিধুমামা, কটা ঘর?'

তা ছাড়া কোনো একটা অন্যায় করে লুকোবার উপায় ছিল না, অনেক জোড়া চোখ সদা জাগ্রত, মিথ্যে কথা বলে পার পাওয়া যেত না, অনেকগুলি বিচারকর্তা সদা সতর্ক। কারুর মধ্যে হিংসে দ্বেষ কি স্বার্থপরতা দেখা গেলে ধিক্কারের স্রোতে ধুয়ে যেত সে সব।

কাজেই—কিন্তু আরে, হচ্ছিল বাড়িতে কটা ঘর তার কথা, এ আবার কি আবোলতাবোল বকছি? বুড়ো হওয়ার দোষই ওই।

● সেই পা

কুমকুম

যাক্ সবাই মিলে হইচই করে জেনে নিলাম দোতলায় চারখানা ঘর। নীচ-তলাটা তেমন সুবিধের নয়, বাড়ির কেয়ারটেকার না কে যেন থাকে। ভাড়াটাড়া ঠিক করে। তা যাক্, চারখানাই বা কম কি?

আমরা ছোটরা তার থেকে একখানাও তো পাবো। আর সব ঘর থেকেই যখন সমুদ্র দেখা যায়, ভালমন্দের প্রশ্ন নেই।

বাবা আর দাদারা একটা ঘরে শোবে, মা আর দিদিরা একটা ঘরে, আমরা ছোটরা এক ঘরে, আর নিধুমামা একলা একটা ঘরে।

নিধুমামার একলার একটা ঘর দরকার, উনি ভোরবেলা ডাম্বল ভাঁজেন, ডনবৈঠক করেন, আধ সের করে ছোলা ভিজে খান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে গল্প শোনার জন্যে অর্ধেক রাত পর্যন্ত যে আমরা নিধুমামার ঘরেই আড্ডা গাড়বো তাতে আর সন্দেহ কি।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন শুধু বাবার ছুটি শুরুর দিনটি এসে পড়ার দেরি।

আমরা তো সব সময় আকাশে ভাসছি।

পুরী যাচ্ছি আমরা!

সারারাত রেলগাড়ি চড়ে!

কী রোমাঞ্চ! কী পুলক! কী উত্তেজনা! হাসছিস তোরা? তা হাসলে কী করবো? যা সত্যি তাই বলছি। রেলগাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা তো শ্রীরামপুরে মামার বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত!

তখন অমন তোদের এখনকার মত ট্রেনের টিকিট কাটা নিয়ে ধুন্ধুমার হতো না। আগে থেকে কাটাই হতো না। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসের কথা জানি না, চক্ষেও দেখিনি। যেতাম ইণ্টারে, দেখতাম স্টেশনে গিয়ে একেবারে যাত্রাকালে টিকিট কেনা হতো। অন্য সবাইরাও তাই করতো দেখেছি।

'চারখানা থার্ড ক্লাস টিকিট দেখি, কাটোয়া!'

'ছ'খানা ইণ্টার ক্লাস টিকিট দিন তো, বড়িবাটি!'

আমার বাবা বলেন, 'এগারোখানা ইণ্টার ক্লাস দেখি, শ্রীরামপুর!'

কুমকুম

ভেবে রোমাঞ্চিত হচ্ছি এবার বাবা বেশ গম্ভীর গলায় ডাঁটের সঙ্গে বলতে পারেন, 'বারোখানা ইণ্টার ক্লাস দিন তো! পুরীর।'

হ্যাঁ বারোখানা তো লাগবেই নিধুমামা যে যাবেন সঙ্গে।

কিন্তু বারো নয়, কিনতে হলো তেরোখানা। কারণ—

হ্যাঁ, সেই কথাই বলি—যেদিন যাওয়া তার দিন চারেক আগে হঠাৎ কুলুকাকা এলেন, এবং সব তত্ত্ববার্তা পেয়ে দুই চোখ গোল আর নিথর করে বলে উঠলেন, 'পুরী যাচ্ছ তোমরা? আর তার জন্যে তিরিশ টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া করছো? তি-রি-শ টাকা! কেন, আমায় একবার বলা যেত না?'

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তুমি বিয়েবাড়িতে ব্যস্ত—'

'তা জানি ছিলাম ব্যস্ত। সত্যিই ব্যস্ত! ঘোরতর ব্যস্ত! এই কালীপ্রসাদ বাবু ছাড়া আর কেউ তো আঙুলটি নাড়েনি। সে যাক্, তবু—তিরিশ টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া করবার আগে, একবার অন্ততঃ আমাকে—।'

মা ভয়ে ভয়ে বলেন, 'কিন্তু বাড়ি ভাড়ার কথা তোমায় বলে কি হবে, তা তো ঠিক—'

'আমায় বলে কি হবে? চমৎকার। কেন, ওখানে আমার এক বন্ধুর পিসেমশাইয়ের বাড়ি পড়ে নেই? বিরাট বাড়ি ওপর নীচেয় ষোলখানা ঘর, চওড়া বারান্দা। আমি অনুরোধ করলে গ্ল্যাড্‌লি দেবে। যত ইচ্ছে হাত পা ছড়িয়ে থাকবেন, একটি পয়সা ভাড়া লাগবে না।'

মা আরো ভয়ে ভয়ে বলেন, 'কিন্তু ওখানে যে বলা হয়ে গেছে—'

'হয়ে গেছে বলে কি চোরদায়ে ধরা পড়ে গেছেন? লিখে দিন যাওয়া হল না ভাড়া ফেরত পাঠাও!'

'বাঃ তারপর যখন দেখবে গেছি—'

'দেখবে? কে দেখবে? তারা চেনে আপনাকে?'

'কিন্তু নিধু কি মনে করবে, তাই ভাবছি!'

কুমকুম

'ওঃ তা যদি ভাবতে থাকেন, তাহলে কিছু করার নেই।' বলে কুলুকাকা টেবিলে 'টরে টক্কা' করতে থাকেন।

আর এইবার বাবা স্টেজে নামেন।

একে জ্ঞাতি ভাই, তায় আবার একটি পয়সা ভাড়া লাগবে না, তাছাড়াও ষোলো ঘরের আকর্ষণ!

প্রত্যেকটি সদস্য একখানা ... করে ঘর নিলেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে।

বাবা গম্ভীর গলায় বলেন, 'তা কুলু যদি বিনিভাড়ায় অতবড় বাড়ি যোগাড় করতে পারে, নিধু কি মনে করবে বলে সেটা ছাড়তে হবে?'

মা গুম হয়ে গেলেন।

বাবা অত লক্ষ্য করলেন না, বললেন, 'কই তোমাদের সেই বাড়ির ঠিকানা? চিঠি কেন, একখানা টেলিগ্রামই করে দিই।'

ঠিকানা তো আমাদের মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল, গড়গড় করে বলে দিলাম, 'বিজয় সরকার, 'সিন্ধু নিলয়' স্বর্গদ্বার, পুরী।'

বাবা চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

কুলুকাকা আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'কি বউদি, সিন্ধু নিলয়ের শোকে কাতর হচ্ছেন না তো?'

'না না সে কি?' মা সামলে নেন।

কুলুকাকা হাস্যমুখে বলেন, 'না তাই বলছি—আপনার তো আবার ভাইয়ের ব্যাপার! তবে এবাড়ির নামেরও বাহার কম নয়, নাম হচ্ছে 'সৈকত আবাস'। কি পছন্দ হচ্ছে না? আরে সে বাড়ি কি? ঘরের মাপ কি! দালানটায় একসঙ্গে একশো লোককে খেতে বসিয়ে দেওয়া যায়।'

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না।

এই মোক্ষম সময়ে নিধুমামা এলেন, আর সমস্ত ঘটনাটি শুনলেন। বাবা যে টেলিগ্রাম করতে চলে গেছেন তাও শুনলেন।

শুনেটুনে বললেন, 'চমৎকার!' বললেন, 'ফার্স্ট ক্লাস! মার্ভেলাস! তবে কুলুবাবু আপনিও চলুন। কারণ আপনার পিসীমার বন্ধুর—'

'থামুন মশাই থামুন, পিসীমার বন্ধুর নয়, বন্ধুর পিসেমশাইয়ের—'

'ওই হল একই কথা। আপনাকে না দেখলে আমাদের ঢুকতে দেবে কি না কে জানে! ভাড়ার রসিদ তো কিছু নেই? হ্যাঁ, সে থাকতো 'সিন্ধু নিলয়ে'। রসিদটি নাকের সামনে ধরে দেখিয়ে গটগট করে ঢুকতাম। আর এ? সেই যে গান আছে না 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না' এ প্রায় তাই। আপনিই নিয়ে যাবেন হাত ধরে।'

কুলুকাকা ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'নিধুবাবু, আপনি মাত্রা ছাড়াচ্ছেন।'

নিধুমামা বলেন, 'পাগল! মাত্রার কাছাকাছিই পৌঁছইনি।'

কথার পিঠে কথা জমে, তবে শেষ পর্যন্ত এও ঠিক হয় কুলুকাকাও যাবেন।

দিদি বলে, 'ওখানে গিয়ে দিনরাত এক বাড়িতে থাকা। ভয় হচ্ছে কুলুকাকা আর নিধুমামায় না ফাইট্ হয়ে যায়।'

তবে আমরা দিদির কথায় ভয় পাই না। দিদি ভুলে যেতে পারে, রাতদিন গল্পের বই পড়ে পড়ে নিজের নামই ভুলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা তো ভুলিনি শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে লোকে সব ঝগড়াঝাঁটি ভুলে যায়। ভুলে যায় হিংসে দ্বেষ, মুছে ফেলে শুধু 'ভাব' করে।

আমরা তাই বলাবলি করি, 'ভালোই হল, ও বাড়িতে সর্বদা বড়দের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে হবে না। সবারই আলাদা আলাদা ঘর পাওয়া যাবে!'

যাক্ অবশেষে সেই শুভদিন এল।

বাবার ছুটি শুরুর দিন।

বাক্স গোছানো শেষ!

বিছানাপত্র বাঁধা রেডি!

কুমকুম

দুদিক থেকে দুজন এসে গেছেন। কুলুকাকা আর নিধুমামা।

অতএব 'দুর্গা দুর্গা'!

আমরা তো সারারাত না ঘুমিয়ে কাচের জানলা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে চোখ ফেলে বসে রইলাম।

আর কুলুমামা সারারাত্তির ওঁর সেই বন্ধুর পিসেমশাইয়ের বাড়ির চাবির গোছাটা বাজাতে লাগলেন। এনেছিলেন কিনা।

কিন্তু সেই চাবির গোছা কি কোনো কাজে লেগেছিল?

দরজায় দরজায় কি তালা লাগানো ছিল?

অথবা তালা লাগানো কোনো দরজা ছিল?

ছিল না।

দরজার পাল্লা বলে কিছু ছিল না কোথাও।

সদর দরজাতেও নয়।

দরজার জায়গায় শুধু পাঁচ ফুট চওড়া আর সাত ফুট লম্বা একটা ফোকর হাঁ হাঁ করছে।

অথচ সেই ফোকরের মাথায় 'সৈকত আবাস' লেখাটি বেশ জ্বলজ্বল করছে।

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি সবাই।

সেই ফোকরের ভিতর দিয়ে উঠোন ভরতি ক্যাক্‌টাসের শোভা দেখি।

তখন তো ওই কাঁটা গাছগুলোকে তুলে এনে ঘরের টেবিলে সাজানোর রেওয়াজ ছিল না, তাই দেখে উৎসাহিত হলাম না কেউ।

বাবা নীরব হেঁট মুণ্ড!

শুধু খানিক পরে নিধুমামা ব্যঙ্গের গলায় বলেন, 'এটা কি, কুলুবাবু?'

অতএব কুলুকাকা গম্ভীর হলেন। বললেন, 'তা একটু আধটু তো কসুর

থাকবেই। বিনি ভাড়ার বাড়ি কি আর আপনার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'ভল্ট' হবে? তবে বাড়িখানার মাপের দিকে তাকিয়ে দেখছেন?'

তা মাপটি সত্যিই বিরাট।

ঠিক যেন একটা পাকা চুল-দাড়ি, আর গায়ে ফাটা চটাওলা, বুড়ো থুত্থুড়ো দৈত্য হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে আছে।

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, 'কুলুঠাকুরপো, বাড়ির দরজা কই?'

কুলুকাকা সান্ত্বনার গলায় বলেন, 'আহা দেখতেই তো পাচ্ছেন ঝড়ে উড়ে গেছে। সমুদ্রের হাওয়া তো বড় সোজা নয়!'

বললেন বটে, কিন্তু সমুদ্রের চেহারা তো দেখছি না ধারে কাছে। শুধু গর্জনটা যেন আসছে কোথা থেকে।

কাতর হয়ে সে প্রশ্ন করলাম আমরা।

'কুলুকাকা, সমুদ্দুর কই?'

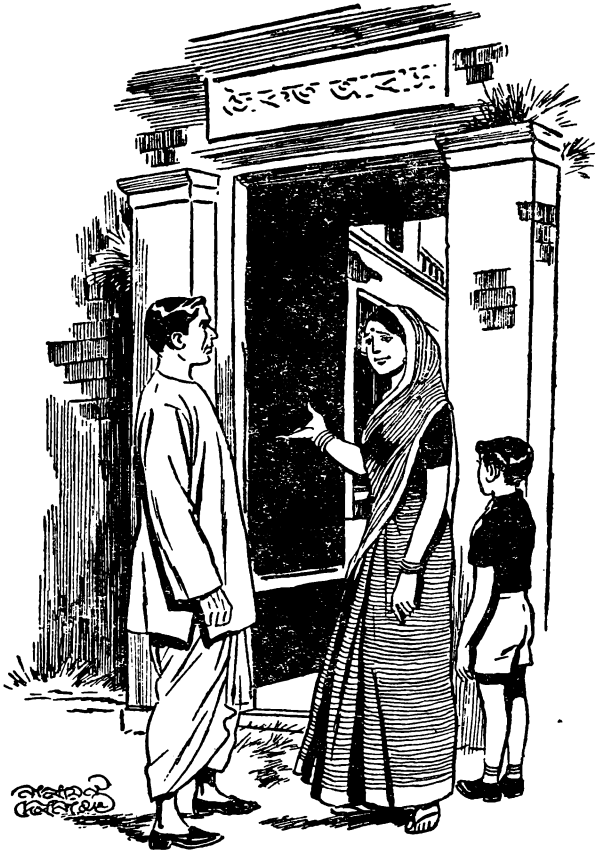

'কুলুঠাকুরপো, বাড়ির দরজা কই?'

কুলুকাকা এবার আত্মস্থ হন। ব্যঙ্গের গলায় বলেন, 'তাই তো দেখতে পাচ্ছি না তো। সেটাও বোধহয় ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বলি গর্জনটা শুনতে পাচ্ছিস, না কি পাচ্ছিস না?'

'তা তো পাচ্ছি।'

কুমকুম

'তবে? ওতে আশা মিটছে না? বলি বেড়াতে বেরোবে না তোমরা? সমুদ্দুরের ধারে? না কি ঘরের কোটরে বসে থাকবে? বাড়িখানার নাম 'সৈকত আবাস', বুঝলে? সৈকত মানে জানো? না জানো তো বলে দিচ্ছি, মানে হচ্ছে সমুদ্রতীর!···এখানটা নয় তা? বালি নেই! তীরের বালি? বরং 'সিন্ধু নিলয়'টাই ফাঁকিবাজি। সমুদ্রের মধ্যে কিছু আর দাঁড়িয়ে নেই বাড়িটা!'

বাবা এতক্ষণ অন্যমুখো হয়ে গাড়ি থেকে মালপত্র নামাচ্ছিলেন। এখনো অন্যমুখো হয়েই বলে ওঠেন, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথার মানে মুখস্থ করার দরকার আছে খুব? ভিতরে গিয়ে করলে হয় না?'

তখন আমরা সেই ফোকর দিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু 'ভিতরের' কথা বলবো কি? বলে ফেলবো?

বলা উচিত?

শুনে হয় তোদের পেট ফাটবে, নয় তোদের প্রাণ ফাটবে।

সারা বাড়িতে কোনো ঘরেই কোনো দরজা জানলার পুরো দুখানা পাল্লা নেই। কোনোটার একখানা একেবারেই নেই একখানা ঝুলছে, কোনোটার দুখানাই ঝুলছে। আর সারা বাড়িতে শুধু বাদুড় আর চামচিকের 'ইয়ে—'! মানে বছরের পর বছর এই প্রাকৃতিক কর্মটি করে আসছে। তারা এবাড়িতে। ধরে নিতে হবে, ছেলেমেয়ে নাতিপুতি নিয়ে বাসও করছে এই দৈত্য দেহের ফাটলে ফোকরে কোথাও।

কুলুকাকা তারস্বরে তাঁর বন্ধুর পিসেমশাইয়ের ছেলের নিন্দে করতে থাকেন, বাড়ি মাঝে মাঝে না সারালে হবে কেন বলে উদ্দেশে ধমক দেন, আর নিধুমামা হেসে হেসে বলেন, 'বিনি পয়সায় পেলে বিষও খাওয়া যায়, তাই না জামাইবাবু?'

বাবা নীরব।

কুমকুম

কুলুকাকাও তখন নীরব।

মুখ দেখে মনে হচ্ছে বিষটা তাঁর সর্বাঙ্গে ছড়াচ্ছে।

ভগবান গো, কত আহ্লাদ করেই ট্রেনে উঠেছিলাম!

প্রত্যেকে নিজস্ব এক একটা ঘর নিয়ে হাত পা মেলে থাকবো, জানলা দিয়ে সমুদ্দুর দেখবো, বেড়াবো খাবো, আর পালা করে কাকা আর মামার কাছে গল্প শুনবো, তার বদলে এ কী!

মা তো জোর গলায় ঘোষণা করে দিলেন, 'এই বাড়ি পরিষ্কার করে রান্নাবান্না করার ক্ষমতা আজ আর আমার নেই, মহাপ্রসাদ কিনে এনে খাওয়া দাওয়া করবে তোমরা। রোজই করতে হবে হয়তো!'

কাজেই খাওয়ার ঘরেও তেঁতুল গোলা।

অথচ ছুটিতে চেঞ্জে যাওয়া, জীবনের প্রথম বেড়ানো এই আহ্লাদে মা ওই রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আনেননি হেন জিনিস নেই। নারকেল কোরবার কুরুনি থেকে নিমকি কাটার ছুরিটি পর্যন্ত।

তাছাড়া এক একদিন এক একরকম নতুন রাঁধবেন তার মসলাপাতি বাসনপত্র।

তার বদলে কিনা মহাপ্রসাদ!

আহা হা অমনি দোষ ধরছিস? মহাপ্রসাদে অবহেলা করিনি বাপু। তবে কি না বড্ডই বেলা হতে থাকে যে!

প্রসাদ আর আসে না। পেট জ্বলে খাক হয়ে যায় যেন।

কি করা যায়?

হাতের এক্তারে একটা জিনিস আছে, বেড়ানো।

তা সেই দুপুর রোদ্দুরেই বেড়াতে বেরোলাম আমরা। জ্বালা দিয়ে জ্বালা নিবৃত্তি এই আর কি!

বাবা বললেন, 'রাস্তা হারিয়ে ফেলবি', মা বললেন, 'সমুদ্দুরে ডুবে যাবি।' আমরা সে কথা শুনতে না পাওয়ার ভান করে কেটে পড়লাম। তোদের মতন

কুমকুম

এমন নির্ভীক তো ছিলাম না আমরা! আমাদের আমলে কেউই ছিল না। দুষ্টুমি যা করা হতো, ওই লুকিয়ে চুরিয়ে কৌশল করে। তোদের মত 'বেশ করবো, খুব করবো, করলে কি হয়?' এ বলতে জানতাম না বাবা!

সে যাই হোক, বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখি সমুদ্দুর!

তারপরই দেখি 'সিন্ধু নিলয়। স্বর্গদ্বার।'

সেই আমাদের সম্পত্তি। আহাহা—কী বাড়ি। আট কোনা গড়ন, সব কোণে বারান্দা, ছবির মত সুন্দর! জানলা দরজায় নতুন রং রোদ্দুরে যেন জ্বলছে। দেখে প্রাণটাও জ্বলে উঠল।

এই বাড়িখানিতে থাকতে পেতাম আমরা! মা ঝপাঝপ পোঁটলা খুলে রান্নাবান্না লাগিয়ে দিতেন। এমন খালি পেটে মহাপ্রসাদের আশায় হতাশ হয়ে রোদে বেড়াতে বেরোতে হতো না। আর সমুদ্দুর দেখতে আধ মাইল হাঁটতে হতো না!

উঃ!

একেই বলে কপাল।

বাবাও তাই বলেন, 'বৃথা কারো দোষ দিও না, আসলে দোষ কপালের!'

কুলুকাকাও বলেন, 'তাই বল মেজদা! সেই কথাই বোঝাও এঁদের। আরে বাবা, কপাল ছাড়া পথ নেই। নচেৎ ওই পিসে মশাইয়ের ছেলেটা এত মুখ্যু হয়? ভাঙা বাড়িখানা একটু সারিয়ে রাখবি তো হতভাগা?'

'সেই বাড়িটা আর একবার দেখলে হতো না নিধু?' মা কাতর বচনে বলেন, 'সেই সিন্ধু নিলয়।'

নিধুমামা গম্ভীর হন, 'নিয়েছি খোঁজ, ভাড়াটে এসে গেছে।'

এসে গেছে?

এরই মধ্যে এসে গেছে?

ওত পেতে বসেছিল নাকি?

তা ছিল নিশ্চয় নইলে—

মা চুপি চুপি বলেন, 'আজই ফিরে যেতাম আমি, নেহাত তোদের কুলুকাকা কি মনে করবে, তাই যেতে পারছি না। ঢের শিক্ষা হয়েছে আমার, আর বিনি-পয়সার জিনিসে নেই আমি।'

কিন্তু ফিরে যাবার কথায় কেউই উৎসাহ বোধ করি না।

বেড়ানো হবে না?

ঝিনুক কুড়নো হবে না?

স্কুল খুললে কি নিয়ে গল্প করবো ক্লাসে?

আর পাড়ার বন্ধুরাই বা কি বলবে?

একেই তো মোটঘাট দেখে হাসছিল ওরা। বলছিল 'এক বছরের জন্যে যাচ্ছিস বুঝি তোরা?'

নাঃ ফিরে যাওয়া হবে না।

আরো বাড়ি খোঁজা হোক না বাবা।

শুনে কুলুকাকা বললেন, 'শ্রীক্ষেত্রে এসে ওই কর্মই কর তাহলে? কোথায় বাড়ি কোথায় বাড়ি! কী আশ্চর্য! সামান্য একটু থাকা-খাওয়ার কষ্টে এত বিচলিত? অথচ মানুষ যুদ্ধে যায়, বনে গিয়ে তপস্যা করে। বিনি পয়সায় একটা বাড়ি পাওয়া গেছে, বলতে গেলে প্যালেস, তার একটু খিল ছিটকিনি নেই বলে'—

নিধুমামা এ সুযোগ ছাড়েন না। বলে ওঠেন, 'ধরুন যেমন একটা মড়া! চোখ কান হাত পা সবই আছে, নেই শুধু প্রাণটুকু! এই আর কি!'

কুলুকাকাও ছাড়েন না, ওই মড়া নিয়ে কি সব ছড়া গেঁথে ডাউন করেন নিধুমামাকে। চলতেই থাকে ওই বাক্‌যুদ্ধ।

নিধুমামা বলেন, 'যাই হোক তাই হোক ভাবতাম আপনার কিছু কিঞ্চিৎও বুদ্ধি হ্যাজ, সে ধারণাটা বদলালো! অমনি পেলে টিঞ্চার আইডিন খাবো, মুফতে পেলে জলবিছুটি খাবো, এটা তো আর বুদ্ধিমানের কথা নয় ব্রাদার!'

তার পিঠে কুলুকাকা, তার পিঠে আবার নিধুমামা, তার পিঠে আবার কুলুকাকা

চালাচ্ছেনই কথা, শেষ পর্যন্ত বাবা যখন বলে উঠলেন, 'তোমরা একটু থামবে দয়া করে?'

তখন থামলেন।

কিন্তু কেউই হার মেনে নয়।

তবু পড়ন্ত বিকেলে সবাই মিলেমিশে একবার বেড়াতে বেরোনোও হলো, আর আমরা কৌশল করে ওই 'সিন্ধু নিলয়'টা দেখিয়ে দিলাম মাকে বাবাকে, কুলুকাকাকে।

আর সেইটা দেখে পর্যন্ত মা আর কথা বললেন না, মুখ হাঁড়ি করে থাকলেন।

কুলুকাকাও যেন দমে গেলেন।

বেড়িয়ে ফেরার সময় দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়ে নেওয়া হল।

আর তারপরই এল এক ভয়ংকর প্রশ্ন।

রাত হয়ে গেছে, দুটো বই হ্যারিকেন নেই সঙ্গে, আর এই বিরাট ভাঙা বাড়ি। কে কোথায় শোবে? ঘরে ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে শোওয়া মাথায় থাক, একটা ঘরেই দু কোণে দুটো আলো বসিয়ে জেগে বসে থাকা ছাড়া গতি নেই।

শুধু চোরের ভয়ই নয়, রাত্রে আবার ভূতের ভয়েও গা ছমছম করছে। অতএব সবাই একত্রে থাকা হোক।

ওরই মধ্যে একটা ঘর সাফ করিয়ে নিয়ে সারি সারি বিছানা পাতিয়ে ফেলেছিলেন মা, হ্যারিকেন ধরে ধরে বিছানা চিনিয়ে দিলেন সবাইকে, আর কপাট ভাঙা জানলা দরজার ফোঁকরগুলো ঢেকে দিলেন বিছানার চাদর ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে। আলোটা কমিয়ে দিলেন।

শোওয়া হচ্ছিল যা হোক স্বস্তি করে, ঘুমিয়ে পড়লেই চুকে যেত, কিন্তু তা হল না। যা হয় আর কি! একটা কুগ্রহর মুহূর্তে সব ওলটপালট হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেই কুগ্রহর মুহূর্তেই মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তিরিশটা টাকাই জগতের সেরা দামী হল!'

বললেন অবশ্য বাবাকে, কিন্তু বাবার উত্তরের আগেই হঠাৎ নিধুমামা

কুমকুম

সেই অন্ধকারেই একটা তোরঙ্গ বাজিয়ে বেশ ওস্তাদী গলায় গেয়ে উঠলেন, 'যদি পাই রোজ এমন বিনি পয়সার ভোজ! দাদা গো দাদা, যদি পাই আমি খাসা এমন বিনি পয়সার বাসা!·····ও দাদা গো—যদি থাকে মাথায় ঘিলু, তবে কেন নাম কুলু!'

তোরঙ্গর আওয়াজটা যেন একটু বেশীই হয়ে যায়।

হয় তো ভয় করছিল নিধুমামার, গানটা সেই ভয় ভাঙার চেষ্টা। কুলুকাকা নিমিত্ত মাত্র।

কিন্তু কুলুকাকা তা বুঝলেন না।

কুলুকাকা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে কাল সকাল বেলাই বি, এন, আর, হোটেলে চলে যাবেন আপনারা! পয়সার যখন অভাব নেই! তবে কালীপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে এই শেষ!'

বলেই হঠাৎ নিজের শতরঞ্জিসমেত বিছানাটা গুটিয়ে গাটিয়ে কাঁধে ফেলে আর সুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গটগটিয়ে একটা ভাঙা ফোকর দিয়ে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশে জ্যোৎস্না ট্যোৎস্না কিছু নেই, কে জানে কোন্ পথে পা বাড়ালেন!

এখন উপায়!

বাবা গম্ভীর গলায় বলেন, 'সবাই জানে ও চিরকেলে গোঁয়ার। তবু ওর পিছনে লেগে—'

বাকিটা বললেন না, কিন্তু নিধুমামার পক্ষে ওই শক্তিশেল।···উনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ক্ষমা চেয়ে ডেকে আনছি।' কিন্তু ঘর থেকে দালানে পা দিয়েই, 'উঃ কী অন্ধকার!' বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রাগের মাথায় লোকে বাঘের মুখে যেতে পারে, সহজ অবস্থায় তো পারা যায় না তা।

বাবা বললেন, 'থাক্ তুমিও আবার বেরিয়ে আমায় জব্দ কোরো না।'

● সেই পা

তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, 'কুলু কুলু, চলে এসো!' মা ভাঙা ভাঙা গলায় 'কুলু ঠাকুরপো, কুলু ঠাকুরপো' করতে লাগলেন, আর আমরা তো সমবেত কণ্ঠে তান ধরলাম 'কুলু কা—কা— !'

কিন্তু কোথায় কুলুকাকা ?

শুধু সেই স্বর সমুদ্রের গর্জনের আর বাতাসের গর্জনের সঙ্গে মিশে যেন ভয়ানক একটা আর্তনাদের মত হা হা করে বেড়াতে লাগলো। না, খুঁজতে বেরোনো গেল না।

প্রকাণ্ড ওই দালানটা, আর চামচিকে ভরতি ঘুটঘুটে অন্ধকার সিঁড়িটা পার হয়ে কে যাবে খুঁজতে? আর যাবেই বা কোথায়? স্টেশনে? ধর্মশালায়? না সমুদ্রগর্ভে?

হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, 'যখনি দেখেছি তেরো জন, তখনই এটি জানতাম! এখন হয়েছে তো? তোমাদের বাসনা মিটেছে তো?' বলে ঝুপ করে শুয়ে পড়লেন।

বোঝা গেল না কিসের বাসনা।

বেড়াতে আসার?

না কুলুকাকার কোনো একটা ভয়াবহ পরিণামের?

নিধুমামা তো অনেকক্ষণই কাঠ হয়ে গেছেন, মা-ও তাই। আমরা পাথর। শুধু সমস্ত রাত ধরে যেন ওই পোড়োবাড়ির সমস্ত ভাঙা ফোকরে ফোকরে এক ডজন পেত্নী মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগলো।...আরে তোরা অমন খামচে ধরছিস কেন আমায়? ভয় করছে? আরে সত্যি তো আর পেত্নী নয়? শুধু বাতাসের গোঁ গোঁ।

তার সঙ্গে সমস্ত জানলা দরজার চৌকাঠগুলোর ঠকাঠক শব্দ। যেন গাদা গাদা চোর ডাকাত ভূত প্রেত এক সঙ্গে এসে হানা দিয়েছে!

বুঝতেই পারছিস ঘুমের কোনো প্রশ্ন নেই।

সারারাত সবাই জেগে বসে।

তার সঙ্গে ভাবনা কুলুকাকা রাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। অথচ খুঁজতে যেতে পারা গেল না।

উঃ সে যে কী অভিজ্ঞতার রাত!

তবে সব ভয়ংকর রাতই এক সময় শেষ হয়। সকালের আলো ফুটলো। আমরা সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম কুলুকাকাকে খুঁজতে!

কিন্তু কোথায় কুলুকাকা?

যে লোক সাত ঘণ্টা আগে হারিয়ে গেছে, তাকে কে পাবে? আর হারিয়ে যাবে বলেই যে চলে গেছে তাকে পাওয়া আরো শক্ত বইকি।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এসে নিধুমামা হতাশ গলায় বললেন, 'বাড়িটার মধ্যে ভাল করে খুঁজেছিস তোরা? রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, কয়লার ঘর, চিলে কোঠার ঘর।'

চিলে কোঠার ঘর! সেটা কি জিনিস?

ও, মানে সিঁড়ির ঘর।

কই সেটা তো দেখা হয় নি।

ছাদের সিঁড়িটা ভীষণ ভাঙা বলে বাবা প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আমরা ছুটছিলাম।

কিন্তু পৌনে এক ডজনের পদাঘাতে যেন দুলে উঠল সিঁড়ি!

নিধুমামা বললেন, 'থাক্ থাক্ আমিই যাচ্ছি।'

বললেন।

গেলেনও।

কিন্তু তারপর?

তারপরই ঘটলো সেই ভয়ংকর ঘটনা।

ছাত থেকে অমানুষিক একটা চিৎকার শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিধুমামা সিঁড়ি কাঁপাতে কাঁপাতে আর গাঁক গাঁক করে চেঁচাতে চেঁচাতে নেমে এলেন!

দেখে মনে হল রাক্ষসে তাড়া করেছে ওঁকে।

'ও নিধু কি হয়েছে? কি হল ছাতে?'

কুমকুম

মার এই কাতর প্রশ্নে নিধুমামা দু'হাতে দুই রগ চেপে ধরে আর একবার গাঁ গাঁ করে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'কুলুবাবু আছেন। এই বাড়িতেই আছেন। সিঁড়ির ঘরে!'

আছেন!

এ্যাঁ! আছে কুলু!

মা বলে ওঠেন, 'তবে অমন চেঁচাচ্ছিস কেন? মেরেছে তোকে? কই দেখি গিয়ে। কত খেপেছে যে মারধোর করছে।'

নিধুমামা আরো জোরে গাঁক গাঁক করে উঠলেন, 'যেও না, দেখতে পারবে না। পুলিস ডাকতে হবে।'

নিধুমামা অজ্ঞানের মত হয়ে গেলেন।

কি রে বাবা, এ সব কী গোলমেলে কথা!

দেখতে পারবে না!

পুলিস ডাকতে হবে!

মানে কি এর?

তোরা বুঝছিস কিছু মানে? বুঝছিস না? তা আমরাও তখন বুঝিনি। বুঝলাম পরে। যখন সত্যিই পুলিস এল।

নিধুমামাই ডেকে আনলেন, জ্ঞান ফেরার পর।

পুলিসের পিছন পিছন পা টিপে টিপে উঠে গেলাম আমরা। আর চিলে কোঠার সেই সরু দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে পেলাম সেই দৃশ্য। পুরীতে কেউ বেড়াতে যাচ্ছে শুনলেই আজও সে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

জানলাহীন ঘুটঘুটে একটা ছোট্ট ঘর, তার মধ্যে রাশিকৃত পচা বাঁশ, ভাঙা টিন, মরচে পড়া কোদাল শাবল, আর তারই একধারে ছাদের আড়া থেকে ঝুলছে একটা ধুতি পাঞ্জাবি পরা দেহ, ঝুলছে একটা দড়ির ফাঁস লাগানো গলার নীচে থেকে। আর ধুতির নীচে নড়বড়িয়ে ঝুলছে মোজা পরা দু খানা পা। মাথা থেকে একটা সাদা চাদর গলা পর্যন্ত মোড়া, ঠিক যেমন মোড়া থাকে সার্কাসের বা ম্যাজিকের মড়ার।

কুমকুম

ও মড়া কার ; চিনতে কি দেরি হয় ?

কুলুকাকার মোজা, কুলুকাকার ধুতি পাঞ্জাবি।

তার মানে এই কথাই বলেছিলেন কুলুকাকা কাল।

'কালীপ্রসাদ রায়ের এই শেষ।' হায় হায় এই 'শেষ' ছিল কুলুকাকার কপালে ?

পুলিসের উপস্থিতির মর্যাদা কেউ রাখলাম না ! একযোগে সবাই নিধুমামার মতই অমানুষিক চিৎকার করে উঠলাম। মা পর্যন্ত 'ও কুলুঠাকুরপো, এ তুমি কী করলে গো। আমি তোমার মার কাছে কী বলবো গো' বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। চুপ হলাম—শেষ পর্যন্ত পুলিসের ধমকে।

তারপর শুরু হল পুলিসের জেরা।

সে যদি বলতে বসি তো—একটা মহাভারত।

মানে প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা, সবাইকে একসঙ্গে, এবং রীতিমত সন্দেহের ভঙ্গীতে। ওই নিরীহ লোকটাকে হত্যা করবার উদ্দেশেই যে আমরা এই বাসের অযোগ্য বাড়িটায় এসে উঠেছি আর ওকে ঝুলিয়ে রেখে চলেই যেতাম, এই যখন সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ নিধুমামা বলে উঠলেন, 'তবে কষ্ট করে গিয়ে আপনাদের ডেকে আনলাম কেন ?'

ও, তাও তো বটে।

দুজন পুলিস মুখ চাওয়াচায়ি করে আবার নতুন ভঙ্গীতে জেরা শুরু করলো। এবং অবশেষে সাব্যস্ত হল, নিধুমামার দুর্ব্যবহারেই লোকটা দুঃখে অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

অতএব নিধুমামারও গলায় না হোক হাতে দড়ি পড়লো।

পুলিস বললো, 'ছোটরা সব সরে যাও। দড়ি কেটে লাশ নামানো হবে।'

কিন্তু সরে কোথায় যাবো ?

নীচে ?

একলা ? অসম্ভব !

হতে পারি ন'জন, তবু একলা ছাড়া কি ?

কেউ নামি না ! সবাই হাতের কোণে ঠেলা মারি। পুলিস বেশ বীরদর্পে ঘরে ঢুকতে এগোয়, আর ঠিক এই সময় একটি নাট্য মুহূর্ত দেখা দেয়। আর একবার তেমনি অমানুষিক চেঁচিয়ে ওঠেন নিধুমামা।

কী ?

কী ?

কী ?

কি জানিস ? সিঁড়ির সামনে কুলুকাকা হাস্যবদন, তাজা চেহারা, পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরা।

পুলিস থমকায়।

বলে 'ইনি কে ?'

নিধুমামা ভাঙা গলায় বলে ওঠেন, 'ওই তো কা—কালীপ্রসাদ বাবু ! যিনি সুইসাইড্ করেছেন !'

এই দেখ বাপী মাধু, তোদের দিদা তোদের খেতে ডাকছে ! আর কি শুনবি ? এই তো লম্বা গল্প শোনা হল।

শেষটা শুনতেই হবে ?

শেষ তো পুলিসকে বৃথা হয়রানির দায়ে জরিমানা দেওয়া ! রেগে আগুন তারা। বলে, 'এমন সাংঘাতিক ঠাট্টা তো কখনো শুনিনি মশাই ? ঠাট্টা করবার জন্যে আপনি পাশবালিশের কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে গলায় প্যাঁচ দিয়ে মুণ্ডু বানিয়ে তাকে ফাঁসিতে লটকেছেন !···অ্যাঁ ! এত সময়ই বা পেলেন কোথায় যে মোজার মধ্যে বালিশের ওয়াড় ঠুশে পা বানিয়ে তাকে পিন গেঁথে গেঁথে ঝুলিয়েছেন বসে বসে !···আর আপনাদেরও বলিহারি মশাই, একটা পাশবালিশকে আপনারা মানুষ ভেবে পুলিস ডাকলেন !'

তাঁরাও যে তাই ভেবে 'লাশ' নামাতে যাচ্ছিলেন, সে কথা আর কে তুলবে ? তাহলে হয়তো আবার এক পালা জরিমানা হয়ে যাবে।

ওরা চলে গেলে কুলুকাকা মিটিমিটি হেসে বললেন, 'আর লাগতে আসবেন আমার সঙ্গে?'

নিধুমামার হাতের দড়ি খোলা হয়েছে, তবু নিধুমামা হাত জোড় করেই রইলেন। বললেন, রক্ষে করুন। হার মানছি বাবা! আর আপনাকে ডাউন করতে চাই না! আপনি শুধু সাংঘাতিকই নয়, মারাত্মক।'

আর মা? বাবা? আরে আবার সকলের কথা বলতে বসলে তো রাত কেটে যাবে! বুঝে নে কে কি বললো। তবে কুলুকাকা যেন নিধুমামাকে টেক্কা দিয়ে অনেক বেশী উঠে গেলেন আমাদের চোখে! আর মিথ্যে বলবনা, নিধুমামা জব্দ হওয়ায় বেশ একটু খুশী হয়ে গেলাম আমরা।

সেই দিনই সেই সিন্ধু নিলয়ে চলে এলাম আমরা! কারণ সকাল-বেলাই সে বাড়ি খালি হয়ে গেছল। ভাড়াটেরা পালিয়েছিল।

পুলিস বেশ বীরদর্পে ঘরে ঢুকতে এগোয়। [পৃঃ ২৪৬

কেন?

কারণ তারা নাকি সারারাত তাদের জানলার ধারে ধারে ভুতুড়ে চিৎকার শুনেছে।

কে জানে সেটাও কুলুকাকার অবদান কিনা।

জিগ্যেস করায় তো খালি মিটিমিটি হেসেছেন, আর বলেছেন, 'পাগল!'

তা সেই আটকোণা বাড়িতে বাকি আটাশ দিন আমরা পরমানন্দেই কাটালাম। কিন্তু ওই সিন্ধু সৈকতের ধারে কাছে বেড়াতে যাইনি কোনো দিন। ওমুখো হতে গেলেই মনে হতো ওর সর্বত্র যেন ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্যে নড়বড়িয়ে ঝুলে পড়া দু'খানা মোজা পরা পা দেখতে পাবো! অদ্ভুত এই মানুষের মন বুঝলি? 'ভয়' জিনিসটা একবার যদি কোনোরকমে ঢুকে পড়লো তো একবারে খাঁজে বসে গেল। শত যুক্তিতেও সে আর নড়বে না।

তা নইলে দেখ না, এই এত বছর পরে যেই তোরা বলেছিস ছুটিতে পুরী যাচ্ছিস, অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠলো নীল মোজাপরা দুখানি ঝুলন্ত পা!

অথচ জানি সত্যি পা নয়।

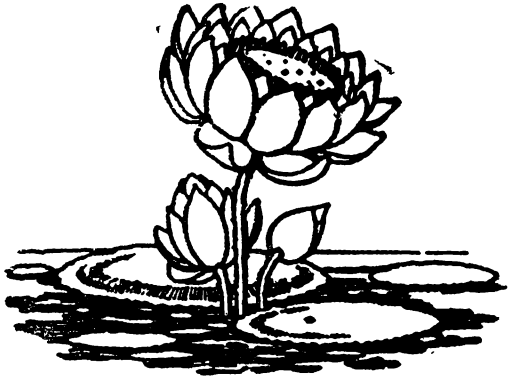

জ্ঞানচক্ষু

কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল! নতুন মেসোমশাই, মানে যাঁর সঙ্গে এই ক'দিন আগে তপনের ছোটমাসীর বিয়ে হয়ে গেল দেদার ঘটাপটা করে, সেই তিনি নাকি বই লেখেন। সে সব বই নাকি ছাপাও হয়। অনেক বই ছাপা হয়েছে মেসোর।

তার মানে—তপনের নতুন মেসোমশাই একজন লেখক। সত্যিকার লেখক।

জলজ্যান্ত একজন লেখককে এত কাছ থেকে কখনো দেখেনি তপন, দেখা যায়, তাই জানতো না। লেখকরা যে তপনের বাবা ছোট মামা বা মেজ কাকুর মত মানুষ, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।

কিন্তু নতুন মেসোকে দেখে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল তপনের।

আশ্চর্য, কোথাও কিছু উলটাপালটা নেই, অন্য রকম নেই, একেবারে নিছক মানুষ! সেই ওঁদের মতই দাড়ি কামান, সিগারেট খান, খেতে বসেই 'আরে ব্যস, এত কখনো খাওয়া যায়?' বলে অর্ধেক তুলিয়ে দেন, চানের সময় চান করেন, এবং ঘুমের সময় ঘুমোন।

তাছাড়া—

কুমকুম

ঠিক ছোট মামাদের মতই খবরের কাগজের সব কথা নিয়ে প্রবলভাবে গল্প করেন, তর্ক করেন, আর শেষ পর্যন্ত 'এ দেশের কিছু হবে না' বলে সিনেমা দেখতে চলে যান, কি বেড়াতে বেরোন সেজেগুজে।

মামার বাড়িতে এই বিয়ে উপলক্ষেই এসেছে তপন, আর ছুটি আছে বলেই রয়ে গেছে। ওদিকে মেসোরও না কি গরমের ছুটি চলছে। তাই মেসো শ্বশুর-বাড়িতে এসে রয়েছেন ক'দিন।

তাই অহরহই জলজ্যান্ত একজন লেখককে দেখবার সুযোগ হবেই তপনের। আর সেই সুযোগেই দেখতে পাচ্ছে তপন, 'লেখক' মানে কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়, তপনদের মতই মানুষ।

তবে তপনেরই বা লেখক হতে বাধা কি?

মেসোমশাই কলেজের প্রফেসর, এখন ছুটি চলছে তাই সেই সুযোগে শ্বশুর-বাড়িতেই রয়ে গেছেন ক'দিন। আর সেই সুযোগেই দিব্যি একখানি দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। ছোটমাসী সেই দিকে ধাবিত হয়।

তপন অবশ্য 'না আ-আ-' করে প্রবল আপত্তি তোলে, কিন্তু কে শোনে তার কথা?

ততক্ষণে তো গল্প ছোটমেসোর হাতে চলেই গেছে। হইচই করে দিয়ে দিয়েছে ছোটমাসি তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে।

তপন অবশ্য মাসীর এই হইচইতে মনে মনে পুলকিতই হয়।

মুখে আঁ আঁ করলেও হয়।

কারণ লেখার প্রকৃত মূল্য বুঝলে নতুন মেসোই বুঝবে। রত্নের মূল্য জহুরীর কাছেই।

একটু পরেই ছোটমেসো ডেকে পাঠান তপনকে, এবং বোধকরি নতুন বিয়ের শ্বশুরবাড়ির ছেলেকে খুশী করতেই বলে ওঠেন, 'তপন, তোমার গল্প তো দিব্যি হয়েছে। একটু 'কারেকশান' করে ইয়ে করে দিলে ছাপতে দেওয়া চলে।'

তপন প্রথমটা ভাবে ঠাট্টা, কিন্তু যখন দেখে মেসোর মুখে করুণার ছাপ, তখন আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়।

কুমকুম

'তা হলে বাপু তুমি ওর গল্পটা ছাপিয়ে দিও—' মাসী বলে, 'মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে সেটা।'

মেসো তেমনি করুণার মূর্তিতে বলেন, 'তা দেওয়া যায়! আমি বললে 'সন্ধ্যাতারার' সম্পাদক 'না' করতে পারবে না। ঠিক আছে, তপন, তোমার গল্প আমি ছাপিয়ে দেব।'

বিকেলে চায়ের টেবিলে ওঠে কথাটা।

আর সবাই তপনের গল্প শুনে হাসে। কিন্তু মেসো বলেন, 'না-না আমি বলছি—তপনের হাত আছে। চোখও আছে। নচেৎ এই বয়সের ছেলেমেয়েরা গল্প লিখতে গেলেই তো—হয় রাজারানীর গল্প লেখে, নয় তো—খুন জখম অ্যাকসিডেণ্ট, অথবা না খেতে পেয়ে মরে যাওয়া, এই সব মালমসলা নিয়ে বসে। তপন যে সেই দিকে যায় নি, শুধু ওর ভরতি হওয়ার দিনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির বিষয় নিয়ে লিখেছে, এটা খুব ভালো। ওর হবে।'

তপন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়।

তারপর ছুটি ফুরোলো মেসো গল্পটি নিয়ে চলে গেলেন। তপন কৃতার্থ হয়ে বসে বসে দিন গোনে।

এই কথাটাই ভাবছে তপন রাত দিন। ছেলেবেলা থেকেই তো রাশি রাশি গল্প শুনেছে তপন আর এখন বস্তা বস্তা পড়ছে, কাজেই গল্প জিনিসটা যে কি সেটা জানতে তো বাকী নেই?

শুধু এইটাই জানা ছিল না, সেটা এমনই সহজ মানুষেই লিখতে পারে। নতুন মেসোকে দেখে জানলো সেটা।

তবে আর পায় কে তপনকে?

দুপুরবেলা, সবাই যখন নিথর নিথর, তখন তপন আস্তে একটি খাতা (হোম টাস্কের খাতা আর কি! বিয়ে বাড়িতেও যেটি মা না আনিয়ে ছাড়েন নি।) আর কলমটি নিয়ে তিনতলার সিঁড়িতে উঠে গেল, আর তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, একাসনে বসে লিখেও ফেললো আস্ত একটা গল্প।

কুমকুম

লেখার পর যখন পড়লো, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো তপনের, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো।

একি ব্যাপার!

এযে সত্যিই হুবহু গল্পের মতই লাগছে! তার মানে সত্যিই একটা গল্প লিখে ফেলেছে তপন। তার মানে তপনকে এখন 'লেখক' বলা চলে।

হঠাৎ ভয়ানক একটা উত্তেজনা অনুভব করে তপন, আর দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে এসে—ছোট মাসীকেই বলে বসে, 'ছোটমাসী, একটা গল্প লিখেছি।'

ছোটমাসীই ওর চিরকালের বন্ধু, বয়সে বছর আষ্টেকের বড় হলেও সমবয়সী, কাজেই মামার বাড়ি এলে সব কিছুই ছোট মাসীর কাছে। তাই এই ভয়ানক আনন্দের খবরটা ছোটমাসীকে সর্বাগ্রে দিয়ে বসে।

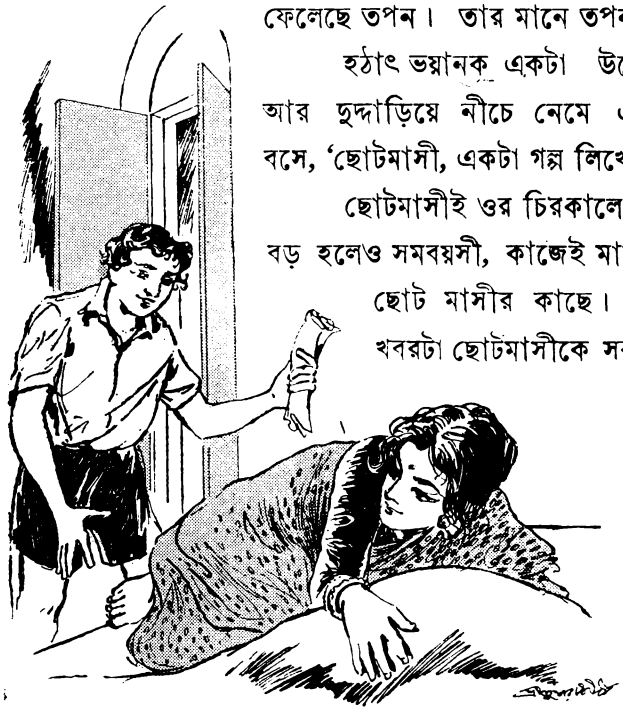

ছোটমাসীকেই বলে বসে, 'ছোটমাসী একটা গল্প লিখেছি।'

তবে বিয়ে হয়ে ছোটমাসী যেন একটু মুরুব্বি মুরুব্বি হয়ে গেছে, তাই গল্পটা সবটা না পড়েই একটু চোখ বুলিয়েই বেশ পিঠ চাপড়ানো সুরে বলে, 'ওমা এতো বেশ লিখেছিস রে? কোনোখান থেকে টুকলিফাই করিসনি তো?'

'আঃ ছোটমাসী, ভাল হবে না বলছি।'

'আরে বাবা খেপছিস কেন? জিগ্যেস করছি বই ত নয়! রোস তোর মেসোমশাইকে দেখাই—।'

কিন্তু গেলেন তো—গেলেনই যে।

কুমকুম

কোথায় গল্পের সেই আঁটসাঁট ছাপার অক্ষরে গাঁথা চেহারাটি ? যার জন্যে হাঁ করে আছে তপন ? মামার বাড়ি থেকে বাড়িতে চলে এসেও।

এদিকে বাড়িতে তপনের নাম হয়ে গেছে, কবি সাহিত্যিক, কথাশিল্পী'। আর উঠতে বসতে ঠাট্টা করছে 'তোর হবে। হাঁ বাবা তোর হবে।'

তবু এই সব ঠাট্টা তামাশার মধ্যেই তপন আরো দু তিনটে গল্প লিখে ফেলেছে। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, হোম টাস্ক হয়ে ওঠেনি, তবু লিখছে। লুকিয়ে লিখছে। যেন নেশায় পেয়েছে।

তারপর ছুটি ফুরোলো, রীতিমত পড়া শুরু হয়েছে। প্রথম গল্পটি সম্পর্কে একেবারে আশা ছাড়া হয়ে গেছে, বিষণ্ণ মন নিয়ে বসে আছে এমন সময় ঘটলো সেই ঘটনা।

ছোট মাসী আর মেসো একদিন বেড়াতে এল, হাতে এক সংখ্যা 'সন্ধ্যাতারা'।

কেন ? হেতু ? 'সন্ধ্যাতারা' নিয়ে কেন ?

বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।

তবে কি ? সত্যিই তাই ? সত্যিই তপনের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনটি এলো আজ ?

কিন্তু তাই কি সম্ভব ? সত্যিকার ছাপার অক্ষরে তপনকুমার রায়ের লেখা গল্প, হাজার-হাজার ছেলের হাতে হাতে ঘুরবে ?

পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে ?

তা ঘটেছে, সত্যিই ঘটেছে।

সূচিপত্রেও নাম রয়েছে।

'প্রথম দিন' (গল্প) শ্রীতপন কুমার রায়।

সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়, তপনের লেখা গল্প পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ওর লেখক মেসো ছাপিয়ে দিয়েছে ! পত্রিকাটি সকলের হাতে হাতে ঘোরে, সকলেই একবার করে চোখ বোলায় আর বলে, 'বারে, চমৎকার লিখেছে তো।'

মেসো অবশ্য মৃদু মৃদু হাসেন, বলেন, 'একটু আধটু 'করেকশান' করতে হয়েছে অবশ্য। নেহাত কাঁচা তো ?'

মাসী বলে, 'তা হোক, নতুন নতুন অমন হয়—'

ক্রমশঃ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।

ওই করেকশানের কথা।

বাবা বলেন, 'তাই। তা নইলে ফট করে একটা লিখলো, আর ছাপা হলো,—'

মেজকাকু বলেন, 'তা ওরকম একটি লেখক মেসো থাকা মন্দ নয়। আমাদের থাকলে আমরাও চেষ্টা দেখতাম।'

ছোট মাসী আত্মপ্রসাদের প্রসন্নতা নিয়ে বসে বসে ডিম ভাজা আর চা খায়, মেসো শুধু কফি।

আজ আর অন্য কথা নেই, শুধু তপনের গল্পের কথা, আর তপনের নতুন মেসোর মহত্ত্বের কথা। উনি নিজে গিয়ে না দিলে কি আর 'সন্ধ্যাতারা'র সম্পাদক তপনের গল্প কড়ে আঙুল দিয়ে ছুঁতো?

তপন যেন কোথায় হারিয়ে যায় এই সব কথার মধ্যে। গল্প ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদটা হবার কথা, সে আহ্লাদ খুঁজে পায় না।

অনেকক্ষণ পরে মা বলেন, 'কই তুই নিজের মুখে একবার পড় তো তপন শুনি! বাবা, তোর পেটে পেটে এত!'

এতক্ষণে বইটা নিজের হাতে পায় তপন।

মা বলেন 'কই পড়? লজ্জা কি? পড়, সবাই শুনি।

তপন লজ্জা ভেঙে পড়তে যায়।

কেশে গলা পরিষ্কার করে।

কিন্তু এ কী!

এসব কি পড়ছে তপন?

এ কার লেখা?

এর প্রত্যেকটি লাইনই তো নতুন আনকোরা, তপনের অপরিচিত।

এর মধ্যে তপন কোথা?

তার মানে মেসো তপনের গল্পটিকে আগাগোড়াই করেকশান করেছেন।

মাসী বলে, 'তা হোক, নতুন নতুন অমন হয়—'

ক্রমশঃ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।

ওই করেকশানের কথা।

বাবা বলেন, 'তাই। তা নইলে ফট করে একটা লিখলো, আর ছাপা হলো,—'

মেজকাকু বলেন, 'তা ওরকম একটি লেখক মেসো থাকা মন্দ নয়। আমাদের থাকলে আমরাও চেষ্টা দেখতাম।'

ছোট মাসী আত্মপ্রসাদের প্রসন্নতা নিয়ে বসে বসে ডিম ভাজা আর চা খায়, মেসো শুধু কফি।

আজ আর অন্য কথা নেই, শুধু তপনের গল্পের কথা, আর তপনের নতুন মেসোর মহত্ত্বের কথা। উনি নিজে গিয়ে না দিলে কি আর 'সন্ধ্যাতারা'র সম্পাদক তপনের গল্প কড়ে আঙুল দিয়ে ছুঁতো?

তপন যেন কোথায় হারিয়ে যায় এই সব কথার মধ্যে। গল্প ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদটা হবার কথা, সে আহ্লাদ খুঁজে পায় না।

অনেকক্ষণ পরে মা বলেন, 'কই তুই নিজের মুখে একবার পড় তো তপন শুনি! বাবা, তোর পেটে পেটে এত!'

এতক্ষণে বইটা নিজের হাতে পায় তপন।

মা বলেন 'কই পড়? লজ্জা কি? পড়, সবাই শুনি।

তপন লজ্জা ভেঙে পড়তে যায়।

কেশে গলা পরিষ্কার করে।

কিন্তু এ কী!

এসব কি পড়ছে তপন?

এ কার লেখা?

এর প্রত্যেকটি লাইনই তো নতুন আনকোরা, তপনের অপরিচিত।

এর মধ্যে তপন কোথা?

তার মানে মেসো তপনের গল্পটিকে আগাগোড়াই করেকশান করেছেন।

অর্থাৎ নতুন করে লিখেছেন, নিজের পাকা হাতে কলমে! তপন আর পড়তে পারে না। বোবার মত বসে থাকে। তারপর ধমক খায়, 'কিরে তোর যে দেখি পায়া-ভারী হয়ে গেল। সবাই শুনতে চাইছে তবু পড়ছিস না? না কি অতি আহ্লাদে বাক্য হরে গেল?'

তপন গড়গড়িয়ে পড়ে যায়। তপনের মাথায় ঢোকে না—সে কি পড়ছে। তবু 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে যায়। আর একবার রব ওঠে তপনের লেখক মেসো তপনের গল্পটি ছাপিয়ে দিয়েছে।

মা বলেন, 'কই পড়? লজ্জা কি?' [পৃঃ ২৫৪

তপন বইটা ফেলে রেখে চলে যায়, তপন ছাতে উঠে গিয়ে শার্টের তলাটা তুলে তুলে চোখ মোছে। তপনের মনে হয় আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন। কেন? তা জানে না তপন।

শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীর ভাবে সংকল্প করে তপন, যদি কখনো লেখা ছাপতে দেয় তো, তপন নিজে গিয়ে দেবে। নিজের কাঁচা লেখা। ছাপা হয় হোক, না হয় না হোক।

তপনকে যেন আর কখনো শুনতে না হয় 'অমুক তপনের লেখা ছাপিয়ে দিয়েছে।' আর তপনকে যেন নিজের গল্প পড়তে বসে অন্যের লেখা লাইন পড়তে না হয়। তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের!

———

মিষ্টুর খুকু

(১)

মামার বাড়িতে আমি প্রায়ই আসি, কিন্তু এবারে নানা কাজে প্রায় বছর দুই পরে এলাম, এসে দেখি অদ্ভুত সুন্দর একটি নতুন মানুষ।

মামাতো ভাইয়ের দুবছরের মেয়ে মিষ্টু।

রোগা পাতলা একটুখানি মেয়ে, শুধু মাথার উপরকার চুলের ঝাঁকড়াটা বিরাট। চুলের ঝাঁকড়ায় মুখটাই খুঁজে পাওয়া দায়। আর কি গিন্নী গিন্নী পাকা পাকা কথা। বাড়ির সকলকে সে বকছে শাসন করছে, দেখে হেসে অস্থির হয়ে যাই। আর হেসে মরি তার 'খুকু' সামলান দেখে। একটি খুকু নিয়ে মিষ্টু নাজেহাল।

(২)

নতুন মানুষ হিসাবে প্রথমটা আমায় একটু সন্দেহের চোখে দেখেছিল মিষ্টু। তারপর অবশ্য চটকরেই ভাব হয়ে গেল। একটু বেশীই হয়ে গেল, কারণ বাড়িতে সবাই কাজের জ্বালায় ছুটোছুটি করছে, আমিই শুধু ছুটির মানুষ, মন দিয়ে ওর সব গল্প শুনি।

তা গল্প মিষ্টুর বেশির ভাগই ওর খুকুকে নিয়ে।

গোল গোল মোটাসোটা হাতটি ঘুরিয়ে বলে, আহা রে !

[পৃঃ ২৬৯

কুমকুম

'খুকু তার দালায় আমাল প্যান্ ছালো নতুন তাতু থালি থালি তাঁদে, ধুমোয়না কিথ্যানা।' নয়ত 'ও নতুন তাতু, খুকুটাকে একটু ধলোনা, নান্নাতা কলে নিই।'

আবার ঠিক ওর মায়ের মত ভঙ্গী করে খুকু কোলে নিয়ে সুর করে ঘুম পাড়াবে 'আয় ধুম আয়', নয়তো বকুনি দেবে 'দুধ খাও না দুত্তু মেয়ে, লোগা হয়ে দাবে দানোনা।'

আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই তো হেসে কুটি কুটি।

একদিন এসে বললো, 'খুকুতা দিন দিন রোগা হয়ে দাত্তে নতুনতাতু, তি তলি বলতো?'

হাসি চাপতে প্রাণ যায়। তবু গম্ভীর হয়ে বলি, 'কি আর করবে ওষুধ খাওয়াও।'

'ওষুদ? ও আইদিন্ তা পেলে তাও তাহলে।'

মিষ্টুর জগতে ওষুধের একমাত্র নাম আইডিন। অতএব আইডিন খাইয়ে মোটা করে তুলবে। কত আর হাসব আমরা।

কিন্তু যে খুকুকে নিয়ে মিষ্টুর এতবড় সংসার সে খুকুটি কি জানো? তোমরা হয়তো বলবে, 'কি আবার, নিশ্চয় খুব ভালো একটা বড় ডল্। আর না হয়তো তার পা ভাঙা অবশিষ্ট মূর্তি।'

আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়।

খুকুর খুকুটি হচ্ছে ময়লা ময়লা ছোট ছিটের পাশবালিশ।

বোধ হয় মিষ্টুরই নেহাত ছোটবেলাকার জিনিস। মিষ্টুর মা এখন বাতিল করে দিয়েছেন। আমি বলি, 'কই মিষ্টু তোমার খুকু কাঁদছে না তো?'

মিষ্টু গম্ভীরভাবে বলে, "তাঁদে তো। থুনতে পাও না।"

সত্যি বলতে কি বাড়ির লোকের উপর আমার একটু রাগই হয়, মিষ্টুর খুকুর চেহারা দেখে। কেন বাপু, এত আদরের নাতনী, এত সুন্দর মেয়ে, ওর একটা ভাল পুতুল জোটে না? ঠিক করলাম আমিই ওকে একটা খুব সুন্দর পুতুল উপহার দেব।

সময় করে গেলাম একদিন মার্কেটে।

পুতুলের রাজ্য তোলপাড় করে আর বেশ অনেকগুলি টাকা খরচ করে চমৎকার

প্রকাণ্ড একটা ডল্ নিয়ে এলাম। পেট টিপলে কাঁদে, শোয়ালে চোখ বোজে, বসালে তাকায়, আর একবার দুলিয়ে দিলেই অনেকক্ষণ ঘাড় নাড়ে।

(৩)

পুতুল দেখে মিষ্টু তো মিষ্টু, মিষ্টুর মা বাবা ঠাকুরমা সকলে একেবারে মোহিত।

'ওমা ওমা কি অদ্ভুত সুন্দর, কী চমৎকার দেখতে, একেবারে সত্যিকারের ফ্রক পরা যে গো।'

মিষ্টুর মা আবার বলতে লাগলেন, 'কত টাকা নষ্ট করেছ বাপু? পুতুলটা আমি তুলে রেখে দোব।'

আমি হো হো করে হেসে উঠি। 'পুতুল আবার তুলে রাখবেন কি? আপনিও দেখছি এখনো খুকু আছেন।'

কিন্তু তুলে কে রাখবে?

মিষ্টু তো ততক্ষণ নতুন খুকুকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলেছে।

বউদি যতই কাড়াকাড়ি করেন "ওরে আরে ওর পেট টিপিসনে ভেঙে যাবে।' মিষ্টু ততই আঁকড়ে ধরে, "আঃ নিওনা বল্‌তি। আমায় নতুন তাতু দিয়েথে।' যতক্ষণ না ঘুমুলো ছাড়লো না সেটাকে।

(৪)

দেখে সত্যি খুব ভাল লাগে।

যাক মিষ্টু খুকুর সংসারটা বেশ জমকালো হয়েছে।

পরদিন সকালে পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম মিষ্টু তার খুকুকে শাসাচ্ছে, 'কেন দামা পল্‌তে দুত্তমি তলতো ম্যাও বেলাল ধলিয়ে দেব।'

উঠে পড়লাম ভাবলাম দেখিগে সিল্কের ফ্রক ইজের পরা খুকুকে মিষ্টু আর কি জামা পরাচ্ছে।

(৫)

কিন্তু একি গিয়ে দেখে অবাক্ আমি!

মিষ্টুর নতুন খুকু নিতান্ত অনাদরে আধখানা দেহ শূন্যে ঝুলিয়ে খাটের ধারে পড়ে আছে, আর মিষ্টুর কোলে সেই তার লাল ছিটের বালিশ খুকু। খুকুকে তখন ভোলাচ্ছে মিষ্টু 'ও খোনা মেয়ে লাগ হয়েছে? তাই তাঁদতো তেঁদো না তেঁদো না।'

তবে কি মিষ্টু ভুলে গেছে কাল তার নতুন একটা পুতুল এসেছে! কিন্তু সামনেই তো পড়ে রয়েছে।

কাছে গিয়ে বলি, 'একি মিষ্টু, তোমার ভাল খুকু যে এখানে পড়ে? বালিশ ফেলে দাও, একে ভোলাও।'

ফেলে দেওয়ার প্রস্তাবেই বোধ হয় মিষ্টু বালিশ খুকুকে আঁকড়ে ধরে, কখনো যা না করেছে তাই করে বসল। ঠাঁই করে একটা চাপড় বসিয়ে দিল আমায়।

কাছে গিয়ে বলি, 'একি মিষ্টু, তোমার ভাল খুকু যে এখানে পড়ে।'

কুমকুম

(৬)

'একি মিষ্টু তুমি আমায় মারলে কেন?

মিষ্টু গম্ভীর ভাবে বললো, 'তুমি ত্যানো নতুন পুতুল আনলে? তাইতো আমার খুকু থোনাল রাগ হয়েছে। ওতা ফেলে দাও। ও তো বিথ্যিলি।'

শুনে আমি নেই।

তিনঘণ্টা মার্কেটে ঘুরে আর অতগুলো টাকা খরচ করে তার এই ফল।

খোশামোদ করে বলি, 'সে কিরে বোকারাম এটা বুঝি বিচ্ছিরি? বালিশ পুতুল কি চোখ বোজে? চোখ খোলে? ঘাড় নাড়ে? কাঁদে?' বলে পুতুলটা তুলে দেখাই।

মিষ্টু দৃক্‌পাত না করে অবহেলা ভরে বলে ও তো দোতানের।

হেসে ফেলে বলি দোকানী তো তোমায় দিয়ে দিয়েছে। এখন তো তোমার।

মিষ্টু ওর চিরকালের খুকুটিকে বুকে নিয়ে খাট থেকে নামতে নামতে বললো, 'না, নেবোনা ওতো অত্তি অত্তি তাঁদে, অত্তি অত্তি ধুমোয় ও তা বিথ্যিলি। আমাল খুকু থোনা নত্তি মেয়ে, ত্যামন মিতিমিতি তাঁদে, মিতিমিতি ধুমোয়।'

মিষ্টুর মনস্তত্ত্ব শুনে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকি।

মেয়েকে কারো সঙ্গে মিশতে দেয় না রিণা। কারো সঙ্গে না। মেয়ে পাছে আরো সব মেয়েদের সঙ্গে মিশে পাকা পাকা আর গিন্নী হয়ে যায় এই ভাবনায় ঘুম হয় না রিণার।

সবেমাত্র একটা মেয়ে তার, আর সবে মাত্র পাঁচ বছর বয়স মেয়ের। এই মেয়ে পাকাঘটি হয়ে উঠলে আর রইল কি রিণার? অথচ রাজ্যিসুদ্ধু মেয়েই একেবারে পাকার রাজা গো! রিণার ভাইঝিরা, রিণার দিদির মেয়েরা, রিণাদের পাড়ার অন্য সব বউদের মেয়েরা,—সব—সব। একধার থেকে পক্কান্ন!

ওদের কথাবার্তা শুনলে গা জ্বলে যায় রিণার। রিণার দিদির মেয়ে রিণার খুকুর থেকে বরং ছোটই, তবু তার যদি কথা শোনো। ফি হাত সে বলবে, 'আর পারি নে বাবা! ভাল লাগে না। পৃথিবীতে অরুচি ধরে গেল!'

রিণার ভাইঝি দুটো খুকুর থেকে একটু বড় আর ছোট, কিন্তু দুটোই সমান ওস্তাদ। দুই বোনে যখন কথা বলে তখন কে বলবে চার বছর আর ছ' বছরের দুটো

মেয়ে কথা বলছে? যেন রিণারাই দুই বোন গল্প চালাচ্ছে, এমনই ভাষাভঙ্গী ভাইঝিদের! ওইটুকু মেয়েরা বলে কিনা—'মা যা সেকেলে করে চুল আঁচড়ে দেয়, ভাল লাগে না। কিন্তু দেখেছিস ভাই, মা-টা কী দুষ্টু! একবার আমাদের নিজে নিজে সাজতে দেবে না। চিরুনি, পাউডার, স্নো, লিপস্টিক, কুঙ্কুম, নেল্‌পালিশ সব উঁচুতে তুলে রাখবে। দেখে দেখে মাথা গরম হয়ে যায়!'

হঠাৎ একদিন বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ভাইঝিদের এই আক্ষেপ শুনতে পেল রিণা, আর শুনে তারও মাথা গরম হয়ে গেল। এদের সঙ্গে যদি তার খুকু মেলামেশা করে, খুকুর আর পদার্থ থাকবে?

ভয়ে ভাবনায় বাপের বাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিল রিণা। দিদির বাড়িটা তো আগেই ছেড়েছিল—যে দিন দিদির ওই খুকুর থেকে ছোট মেয়েটাই বলেছিল, 'দুটো রসগোল্লা তুই আর খেতে পারছিস না খুকুদি! এত ঢংও করতে পারিস!' সেই দিন নিজের বাড়িতে ফিরে এসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল রিণা, 'আর বাবা, দিদির বাড়িতে নয়!'

তা মেয়ের জন্যে না হয় সাধের বাপের বাড়ি, দিদির বাড়ি যাওয়াই ছাড়ল রিণা! মা হলে অমন কত কি-ই ছাড়তে হয়!

খুকুর কাকা দেবু বলে, 'কী বউদি, তোমার বাপের বাড়ি যাওয়ার কী হল? আগে তো রাতদিন যেতে। ঝগড়া হয়ে গেছে বুঝি?'

রিণা ভয়ে ভয়ে বলে, 'ও-রকম ঠাট্টা কোরো না ভাই, খুকু এক্ষুণি শিখে ফেলবে। ঝগড়া হতে যাবে কেন? এমনি সময় পাই না।'

হ্যাঁ, শুধু পাকা পাকা সমবয়সীদের ভয়েই কাতর নয় রিণা, বড়দের ভয়েও। বলতে গেলে সারা পৃথিবীর লোকের ভয়েই। বড়রা বড়র মত ছাড়া কী রকম কথা বলবে বল? বলবেই তো! রিণা শুনলেই কাঁদো-কাঁদো হবে, 'বোলো না ভাই, ওর সামনে ও-সব কথা বোলো না। এক্ষুণি শিখে ফেলবে।' কথা শিখবে না, কাজ শিখবে না, ফুলের মত শিশুটি থাকবে তার খুকু এই বাসনা রিণার।

ফলে রিণার খুকু এই পাঁচ বছর বয়সেও কাঁথায়-শোওয়া বাচ্চাদের মতই

রয়ে গেছে। বোতলে দুধ খায়, মায়ের হাতে ছাড়া চকোলেটটি পর্যন্ত খেতে পারে না, আধো-আধো কথা বলে, আর রাতদিন কোলে চাপে !

খুকুর বাবা বলে, 'এটা যে মোটেই বড় হচ্ছে না !'

রিণা জোর গলায় বলে, 'বড় হচ্ছে না মানে ? এই তো এ মাসে ওজন নিলাম গত মাসের চেয়ে—'

হ্যাঁ, মাসে মাসে মেয়ের ওজন নেয় রিণা। আর, বলতে নেই, মেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্টই ! খুকুর বাবা বলে, 'সে বড় হওয়ার কথা বলছি না, এমনিতে যে একেবারেই বাচ্চার মত !'

রিণা মুখ হাঁড়ির মত করে বলে, 'বাচ্চা বাচ্চার মত না হয়ে পাকা ঢেঁবি হলেই বুঝি খুব ভালো ?'

কিন্তু এ তো চলছিল এক রকম, এখন খুকু এই পাঁচ বছরের হতেই খুকুর বাবা, কাকা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে খুকুকে স্কুলে দেবার জন্যে। বলছে, 'দুবছর তিন বছরে স্কুলে যায় আজকাল ছেলেমেয়েরা। আর খুকু এই এত বড় হল—'

খুকুকে কেউ 'বড় হয়েছে' বললে রিণার রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়। মনে হয় কে যেন রিণার হাত থেকে তার একটা আদরের পুতুল খেলনা কেড়ে নিচ্ছে।— কিন্তু পাঁচ-বছরকে তো আর 'পাঁচ-বছর-হয়-নি' এ কথা বলা যায় না !

আর পাঁচ বছরটা যে 'হাতে খড়ির' কাল তাও 'না' বলা যায় না।

কাজেই খুকুর বাবা, কাকার এই ঘোষণায় রিণার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।

স্কুল ?

স্কুলে যাবে খুকু ?

তার মানে সেই রাশি রাশি গাদা গাদা পাকাঘটি মেয়ের সঙ্গে মিশতে যাবে ? স্কুলের দিদিমণিরা তো শুধু পড়ানোর দিকেই মন দেবেন, ওরা কি করছে, কি বলছে, তা দেখবেন ?

এই তো রিণার ননদের মেয়ে ফুলটুশ স্কুলে গিয়ে এই শিখেছে,—রাতদিন ক্লাসের মেয়েদের বাড়ির গল্প করছে।

কুমকুম

'জানো মা, আমাদের ক্লাসে রেখা বলে একটা মেয়ে আছে, তার দিদা না, হি-হি-হি, কি মোটা। ইয়া এক হাতির মত।··· জানো মা, আমাদের ক্লাসে একটা মিতা বলে মেয়ে আছে, তার দিদি আর জামাইবাবু রোজ সিনেমা দেখে। জানো মা, আমাদের ক্লাসে একটা স্বর্ণ বলে মেয়ে আছে, তার কাকা মেম বিয়ে করেছে।··· জানো মা, আমাদের ক্লাসে একটা ভারতী বলে মেয়ে আছে, তার মা পূজোর সময় শুধু নিজের জন্যে পঁচিশটা শাড়ি কেনে।' এই সব গল্প।

রিণার খুকু যদি ওই রকম সব কথা শিখে বসে স্কুলে গিয়ে? এই রকম গল্প করে মার সঙ্গে?

রিণা মারাই যাবে।

রিণা অতএব ঘোষণা করে, 'খুকুকে আমি স্কুলে দেব না।'

'স্কুলে দেবে না! মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

খুকুর বাবা আর কাকা বলে, 'খুকুকে যদি স্কুলে দিতে না হয়, তোমাকে তাহলে পাগলা গারদে দিতে হবে। বলি রাজ্যসুদ্ধু মেয়ে যদি পাকা হয় তোমার মেয়েও তাই হবে, উপায় কি?'

রিণা প্রথমে রেগে আগুন হয়, তারপর কেঁদে আকুল হয়। 'আমার মেয়েও তাই হবে? কত কষ্টে খুকুকে 'শিশুর' মত রেখে মানুষ করছি আমি। খুকুর জন্যে বাপের বাড়ি যাই না, দিদির বাড়ি যাই না, খুকুকে নিয়ে একদিনের জন্যে সিনেমা যাই না, গিন্নী হয়ে যাবে বলে নিজে হাতে খেতে দিই না, বোতলে ছাড়া দুধ দিই না, এখনো কোলে করে সিঁড়ি উঠি, এখনো ওর বিছানায় অয়েলক্লথ পাতি। আর স্কুলে দিয়ে 'বড়' করে দেবে ওকে?'···

'তাহলে মুখ্যু একটা বুড়োখুকী হয়ে থাকুক ও, এই তোমার ইচ্ছে?' খুকুর বাবা রেগে বলে।

খুকুর কাকা বলে, 'আমার তো তাই মনে হয়!'

রিণা কিন্তু অটল। রিণা বলে—'আমি পড়াবো খুকুকে। স্কুলের থেকে ভালোই পড়াবো। সেই ক্লাস সেভেন এইটে স্কুলে দেব ওকে। ততদিনে বুদ্ধি হবে, বুঝবে

পাকামী করতে নেই, গিন্নী-গিন্নী কথা বলতে নেই, ছেলেমানুষ হয়ে থাকাটাই সুন্দর।'

খুকুর ছোটকাকা দুই হাত উলটে বলে, 'সুন্দর!'

রিণা ওতে কান করে না।

রিণা ছুটে গিয়ে খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, 'খুকু—খুকু, আমার সোনার খুকু, তোকে আমি নিজে পড়িয়ে পড়িয়ে বিদ্বান করবো, কেউ বলতে পারবে না মুখ্যু, খুকু! কেমন রে।'

খুকু মাকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলে, 'মা-মণি! মা-মণি! আমি খুব লক্ষ্মীমেয়ে হবো, কেমন?··· বাবা বলবে, খুকু আমার সোনা, কাকা বলবে, খুকু কত বুদ্ধিমান্! তাই না? তারপর বড় হয়ে কত পাস করবো আমি, বিলেত যাবো, আমেরিকা যাবো। তুমিও যাবে মা-মণি! তুমি আর আমি।'

রিণা বিগলিত স্নেহে বলে, 'দূর, আমি কি যেতে পারি? আমি তখন বুড়ী হয়ে যাবো!'

রিণা ছুটে গিয়ে খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে বলে,···

খুকু মাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে, আরো আদুরে গলায় বলে, 'না—আ-আ! তুমি যাবে। তুমি না গেলে আমি কাঁদবো।'

খুকুর মুখে ফুলের সুষমা।

কুমকুম

খুকুর চোখে দেবদূতের স্বর্গীয় আলো!

তারপর খুকু বলে, 'মা আমি আজ ছাতে যাব না—'

বিকেল বেলা ছাতই খুকুর খেলার মাঠ। পার্কে যেতে দেয় না রিণা। রাজ্যের বিচ্ছু বিচ্ছু ছেলেমেয়ে, তাদের ঝি-চাকর, কতই না জানি পাকা কথার চাষ হয় সেখানে! তার থেকে ছাতই ভালো। খোলা হাওয়াটাই পাচ্ছে, পৃথিবীর মলিন হাওয়া লাগছে না গায়ে।

কিন্তু খুকু ছাতে যেতে চায় না। বলে, 'মা, তোমার কাছে থাকি।'

মার কাছে থাকা মানেই রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, খাবার ঘরে। তাতে তো স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবার ভয়। তাই ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠিয়ে দেয়। বলে, 'আমার কাছে তো একটু পরেই আসবি সোনা।'

আজও তাই বললো।

খুকুকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ছাতে বেড়াতেও পাঠালো, কিন্তু কপালটা আজ মন্দ, তাই একটু পরেই রিণার দিদি এসে হাজির হল।

সঙ্গে সেই তার গিন্নী প্যাটার্নের মেয়েটা, শাবু,—প্রায় খুকুরই বয়সী, কিন্তু কথায় রিণাকে হারায়।

এসেই সে বলে ওঠে, 'ছোট মাসী একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে! একদিনও যায় না। বাবা তোমার যা নিন্দে করে।'

কথা শুনে গা জ্বলে যায় রিণার। নিজের দিদির মেয়ের হলেও যায়।

তবু কষ্টে, বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার সুরেই বলে, 'সময় পাই না সোনা! এসো, বোসো!' কিন্তু বসছে কে?…শাবু সেই কথাটিই বলে উঠে,—সেই ভয়ংকর কথাটি।

'খুকু কোথা!'

খুকু!

খুকুকে এখন অন্ততঃ দুঘণ্টা এই বিচ্ছু মেয়ের কাছে রাখতে হবে!…রিণা চোখে অন্ধকার দেখে।

কিন্তু উপায় কি?

বলা তো যাবে না 'খুকুর কাছে যাস না তুই!' তাই ম্লানমুখে বলে, 'খুকু ছাতে বেড়াচ্ছে। আসবে একটু পরে। তুই আবার কষ্ট করে যাবি?"

শাবু হি-হি করে হাসে, 'ছোট মাসীটা যেন কী! ছাতে যেতে আবার কষ্ট কি? আমি কি ঠাকুমা! তাই বলবো বাবা রে, কোমর গেল!'—ছুটে উঠে যায় ছাতে।

রিণা না বলে পারে না।—'দিদি, শাবুটা বড্ড পাকা হয়ে যাচ্ছে!'

দিদি রাগ করবে?

করুক!

স্পষ্ট কথা বলবেই রিণা, 'অতটুকু মেয়ে, অত কথা! অত কথা কইতে দাও কেন?'

দিদি মুখ ভার করে বলে, 'শোনো কথা! কথা কইতে আবার দিতে হয় নাকি? ভগবান্ মুখ দিয়েছেন কথা বলার জন্যে। সে কথা ওরা জানে না?'

…তাই বলবো বাবা রে, কোমর গেল!'—ছুটে উঠে যায় ছাতে।

এ কথার উত্তর আছে।

কিন্তু রিণা দিদিকে আর রাগায় না।

শুধু ভাবে একটু পরেই ছুতো করে ছাতে উঠে যাবো। দেখবো শাবুটা খুকুর সামনে বেশী কথা বলছে কিনা।

কুমকুম

দিদিকে চা-টা দিয়ে রিণা ছুতো আবিষ্কার করে, 'যাই, শাবুটাকে ডেকে আনি, সন্দেশ, বিস্কুট কিছু খাক একটু।'

দিদি হেসে বলে, 'সন্দেশ? মুখেও করবে না! বিস্কুট? ঝাল ঝাল সিঙাড়া, ডালমুট, পাঁপর ভাজা, এই সব ওর খাদ্য!'

'তার মানে তোমরাই এক একটি অখাদ্য!' বলে রেগে ছাতে উঠে যায় রিণা।

হ্যাঁ ছাতে।

যেখানে শাবু আর খুকু জমিয়ে গল্প করছে। সিঁড়ির দিকে পিছন করে স্রেফ ঠাকুমাদের মত ভঙ্গীতে পা ছড়িয়ে বসেছে ওরা, তাই রিণাকে দেখতে পায় না।

কিন্তু রিণা।

সে কি সামনে যেতে পারে না?

না, পারছে না।

পারল না।

তার খুকুর কথা তাকে মাটিতে পুঁতেই ফেলেছে প্রায়! খুকুদের কথোপকথন!

কিন্তু এই কি খুকুর গলা?

আধো নয়, আদুরে নয়, চাঁচাছোলা পরিষ্কার। শাবুকে ঠেলে ঠেলে, হেসে হেসে বলে চলেছে সে, 'আর বলিস না ভাই, আমার যা অবস্থা! মা আমার জীবন মহানিশা করে তুলেছে। আচ্ছা, বল তো ভাই, রাজ্যিসুদ্ধু মেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে—আমি গেলেই দোষ?'

'ইস্কুলে যাবি না তুই?'

'না রে! তবে আর শুনলি কি? মা নিজে পড়াবে। তার মানেই আমার দফা শেষ! সব মেয়ে মজা করে স্কুলে যাবে, আর আমি বাড়ি বসে থাকবো।'

শাবু হি হি করে হেসে বলে, 'তা তুই তো কচি খুকীই আছিস! এখনো বোতলে দুধ খাস, নিজে হাতে ভাত খেতে পারিস না, কোলে চাপিস—'

খুকু তাকে থামিয়ে দেয়।

কুমকুম

গোল গোল মোটাসোটা হাতটি ঘুরিয়ে বলে, 'আহা রে! নিজের জন্যে যেন! শুধু ওই মার জন্যেই। আমি বড় হয়ে গেলেই যে মার মনে দুঃখু হবে। আর দুঃখু হলেই বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। তাই তো বানিয়ে বানিয়ে 'বাচ্চা'র মতন হয়ে থাকি। আধো-আধো কথা বলি। যতই হোক, মা তো! আহা বেচারা! একটাই মোটে মেয়ে আমি মার, আমাকেই তো দেখতে হবে মার কিসে কষ্ট, কিসে সুখ। তাই ইচ্ছে করে ন্যাকামি করি।'

'ইচ্ছে করে ন্যাকামি করিস তুই?'

শাবু ছিটকে ওঠে।

খুকু অটল।

বলে, 'না করলে? মা তো তাহলে রাতদিন কাঁদবে! ভেবে মায়া হয় না? মায়ার জন্যেই এই করতে হয়।'

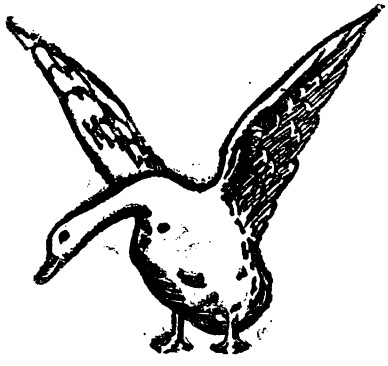

রাসুদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, 'এই, শীগ্‌গির একবার আমার সঙ্গে চল দিকি। একটা রিস্ট ওয়াচ্ কিনবো। আমি আবার ও-সব ভাল বুঝি না। কিন্তু এক মিনিট দেরি নয়, যেমন আছিস তেমনি—'

রাসুদা হ্যাঁচ করে হাত ধরে একটা টান মারলেন।

অবাক্ হয়ে বলি, 'সে কি! গেঞ্জি গায়ে—'

'আরে—বাবা, তাতে হয়েছে কি?' রাসুদা ঝেঁজে উঠলেন, 'এই হতভাগা দেশে গেঞ্জিই বা ক'টা লোকের জুটছে? বলে পরতে ছেঁড়া ট্যানাই জোটে না! ওঠ ওঠ, এক মিনিট সময় অপচয় করা চলবে না।'

হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন রাসুদা,—তাঁর গিলে করা মিহি আর্দির পাঞ্জাবিটার ইস্ত্রিটা বাঁচিয়ে।

হতাশ হয়ে বলি, 'রুগীর ওষুধ নয়,—খিদের ভাত নয়,—রিস্ট ওয়াচ্! এত জরুরী দরকার কিসের? মেয়ে নেই তোমার যে, ভাববো, কাল মেয়ের বিয়ে—'

কুমকুম

'আরে—দূর্, মেয়ের বিয়ে কি আবার একটা প্রবলেম্?' ট্যাক্সির পিঠে দেহ এলিয়ে দিয়ে রাসুদা বলেন, 'আজই রেঞ্জার্সের টিকিট কেনার শেষ দিন।'

আমার তো আজ খালি অবাক্ হবারই পালা। বললাম, 'রিস্ট ওয়াচ্ আর রেঞ্জার্স! হিসেবে ঠিক মেলাতে পারছি না তো!'

'ঘটে কিছু থাকলে তো পারবে?' রাসুদা বললেন।—'আগে কেনা আর উপহার দেওয়ার পর্ব মিটে যাক, তার পর সব বলবো ধীরেসুস্থে।'

রহস্যের হদিস পাই না। শুধু কেনা নয়, আবার উপহার!

'ঘড়িটা তোমার নিজের জন্যে নয়?'

'আমার জন্যে!' রাসুদা আকাশ থেকে পড়লেন।—'আমার জন্যে এখন এই বুড়ো বয়সে নতুন করে হাত-ঘড়ি কিনবো? বেঁচে থাক্ আমার শ্বশুরবাড়ির পাওনা ঘড়ি! সারাতে বছরে গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচা করলেই বেশ চলে যায় সারা বছর।'

রাসুদার শ্বশুরবাড়ির ঘড়ির মহিমায় বিগলিত হই। বাস্তবিক, শ্বশুরবাড়ির ঘড়িতে বছরে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকা খরচ, এ তো ভাবাই যায় না! যাকে বলে জলের দর। এই তো আমারই কাকা আর বড়দা, ওই শ্বশুরবাড়ির রিস্ট ওয়াচের পিছনে কম করে আশি-পঁচাশি টাকা খরচা করেন বছরে। তাই বললাম, 'তুমি লাকি ম্যান্।'

'এত দিন ছিলাম কিনা জানি না, অন্ততঃ এখন তো হতে চলেছি। আর সেই জন্যেই তো ঘড়ি!'

'আচ্ছা রাসুদা, অবস্থা ফিরলে লোকে দামী হাতঘড়ি পরে বেড়ায় বটে, কিন্তু অবস্থা ফেরাবার জন্যে ঘড়ি! মানেটা ঠিক—'

'নাঃ, এই তোদের বড্ড দোষ বিনু, সব জিনিসের মানে জানা চাই। কিন্তু এখন আমি সব কাহিনী বলতে বসি কি করে? ওদিকে টিকিট কেনার শেষ দিন!'

ধরতে পারছি না—রাসুদা পাগল কিংবা মাতাল কোন্টা হয়েছেন। অথচ কোনটাই হবার কথা নয়। কিন্তু কেন তবে এই সব উলটোপালটা কথা?

কুমকুম

সাবধানে বললাম, 'রাসুদা, ঘড়িটা দেবে কাকে ?'

'দেব কাকে !' রাসুদা প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন, 'দেব কাকে মানে ? যে ছেলেটা দু দুবার আমার জীবন রক্ষা করল, আর এই সেদিন কে, সি, চ্যারিটিজ্ ফণ্ডের দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিল, তাকে ছাড়া আর কাকে দেব শুনি ?'

পাইয়ে দিল ! দশ হাজার !

হাঁ করে বলি, 'পাইয়ে দিল !'

'তা দিল না ? মানে, দিয়েই তো দিয়েছিল, কেবল মাত্র একটা দামী ঘড়ি, মানে একেবারে কারেক্ট টাইম দেয় এমন একটা ঘড়ির অভাবে বেচারা—! কিন্তু বিনু, তুমি কি এবারটাও আমার মার্ডার কেস করাতে চাও ? হরদম কথা বলছ, আমার আর্জেন্সিটা বুঝছ না ?'

রেগে বললাম, 'আরে বাবা, ঘড়ির দোকান পর্যন্ত পৌঁছবে, তবে তো ? তার আগে বল সে বেচারাটা কে ?'

রাসুদা খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কেন, তুই আমার ভাগনে ভোম্বলকে চিনিস না ?'

'ভোম্বল ! মানে তোমার সেই ভাগনে ভোম্বল ? এই বিশ্বকর্মা পূজোর দিন যে ছাতে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল ?—হাফ্ প্যাণ্ট আর খেলোয়াড়ি গেঞ্জি পরে—'

'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। অত বর্ণনায় দরকার কি ? আমার তো সবে ধন নীলমণি ওই একটাই ভাগনে !'

'তা সে তোমাকে টাকা পাইয়ে দিল !'

'দিল নয়—' রাসুদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'দিতে দিতে রয়ে গেল। আর গেল শুধু একটা ভাল ঘড়ির অভাবে—'

'রাসুদা, রহস্য ভেদ হল না। ওই প্রাণরক্ষাটাই বা কি ?'

'ওঃ বিনু, তোমাদের কী অপরিসীম কৌতূহল! আমার অবস্থাটা বুঝছ না ? বলি এবারেও যদি—ওরে, বাবা ড্রাইভার, একটু তাড়াতাড়ি—'

তবু থাকতে পারলাম না।

তবু বললাম, 'কিন্তু ওই জীবনরক্ষাটা কি ? জলে ডুবে যাচ্ছিলে ?'

কুমকুম

'যাই নি, যেতে যেতে বেঁচে গেছি।' রাসুদা বলেন, 'সেই সেবার কোথাকার যেন নদীতে ভয়ংকর সেই নৌকাডুবির কথাটা মনে আছে তো?'

ছিল না। তবু বললাম, 'হুঁ, সে তো ভীষণর্ণ।'

রাসুদা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলেন, 'তবেই বোঝ! ওই ডুবো নৌকো থেকে কে রক্ষা করল আমাকে? ওই ভোম্বল! আমার সবে ধন নীলমণি একটি মাত্র ভাগনে।'

'ভোম্বল তোমাকে নৌকোডুবি থেকে বাঁচিয়েছে?'

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থেকে সেই হাফ্‌প্যাণ্ট পরা ছেলেটাকে ভাবি। রাসুদা ব্যঙ্গ-হাসি হেসে বলেন, 'না হলে কি আর আড়াইশো টাকার একটা ঘড়ি আমি ওকে উপহার দিই? শুধু কি ওই নৌকাডুবি? কুকুরে কামড়ানো থেকে বাঁচায় নি? তার পর কে, সি, চ্যারিটি—আর আজকের এই রেঞ্জার্স। ও ড্রাইভার, একটু তাড়াতাড়ি চালা বাবা!'

'রাসুদা!' আমার হৃদয়ে কৌতূহল অদম্য। থাকতে পারি না। বলি, 'রাসুদা, বুঝলাম তোমার ভাগনে তোমাকে প্রাণতুল্য দেখে। কিন্তু এত সব সে করছে কি করে? ছোট ছেলে!'

'ছোট ছেলে!'

রাসুদা বলে ওঠেন, 'ছোট ছেলের ঠাকুর্দা ও। ও না পারে কি?'

'কিন্তু—'

'আর 'কিন্তু' নয় বিনু, আর 'কিন্তু' নয়। আজকের মতন রেহাই দাও আমাকে। উঃ, কী কুক্ষণেই তোকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম! না নিলে এতক্ষণ ঘড়ি কিনে উপহার দেওয়া হয়ে যেত।'

'হয়ে যেত?'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি।

রাসুদা উদ্দীপ্ত স্বরে বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়! কিন্তু বিনু, তুমি বোধ করি ওই কুকুরে কামড়ানোর গল্পটা না শুনে ছাড়বে না?'

অভিমান ভরে বলি, 'নাঃ!'

'নাঃ! একেবারে সোজা মুখের ওপর নাঃ? তার মানে আমার সম্পর্কে কোন ইণ্টারেস্ট নেই তোমার, কেমন? অথচ ওই গল্পটা এই ভয়ংকর মুহূর্তেও, মানে যখন আমার রেঞ্জার্সটা প্রায় ফসকে যাচ্ছে তখনও, তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে আমি বলতে উদ্যত হচ্ছি। মানে, কুকুরটা যখন আমাকে কামড়াবে ঠিক করেছে, ঠিক তখন ভোম্বল আমাকে বলল—'

'সে কি রাসুদা? সবে তো এতক্ষণে মিটারে এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা!'

বাধা দিয়ে বলি, 'কুকুরটা তোমাকে কামড়াবে ঠিক করেছিল? কোন্ কুকুরটা?'

'ইস্, বিনু, তুমিই আমাকে ডোবালে! আর এও বলি, অ্যাংলো-সুইসের ঘড়ির দোকানটা কি হঠাৎ সুইজারল্যাণ্ডে উঠে গেল? এ যে অনন্ত কাল ধরে ট্যাক্সি যাত্রা করছি!'

'সে কি রাসুদা? সবে তো এতক্ষণে—মিটারে এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা!'

'থাক্ বিনু, পয়সার কথা শুনতে চাই নি।'

রাসুদা গুম হলেন। সহসা।

আমার অস্বস্তি।

বললাম, 'কিন্তু কুকুরটার কি হল?'

'আঃ মুশিকল। বলি সেটা কি কোন ব্যক্তি বিশেষ কুকুর? সে তো সমগ্র

কুকুর জাতির প্রতীক! নাঃ, সব কিছু খুলে না বললে আর তুমি বুঝবে না। শোন তবে! জ্যোতিষ শাস্তর বলে একটা শাস্তর আছে, নাম শুনেছ?'

'তা শুনেছি বই কি!'

'তাও ভাল। কিন্তু এটা শুনেছ কি, ভোম্বল শিখেছে সে শাস্তর?'

'ভোম্বল! ভোম্বল জ্যোতিষ শাস্তর শিখেছে!'

'না শিখেছে তো কি বানাচ্ছি আমি? কথাবার্তাগুলো তো তোর ভাল নয় বিনু! শিখেছে, পাস-করা জ্যোতিষীর মতনই। নতুন বচ্ছর পড়তে না পড়তে টপ টপ বলতে শুরু করে দিল, 'মামা, তোমার এ বছর নৌকো চড়া চলবে না। মামা, তোমার এ বছর গৃহপালিত জন্তু থেকে ক্ষতির আশঙ্কা। তা হলেই বোঝ! এই জানা না থাকলে এতদিনে কবে জলের তলায়, নয় তো কুকুরের পেটে পড়ে থাকতাম! জানা আছে তাই সাবধান হয়ে হয়ে বছরটা কাটিয়ে দিলাম।'

ভোম্বলের অভূতপূর্ব জ্যোতিষ বিদ্যার পরিচয় পেয়ে হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকি।

রাসুদা পুনরায় সোৎসাহে বলেন, 'কে, সি, চ্যারিটির কথাটাও বোধ হয় শোনবার জন্যে প্রাণ যাচ্ছে তোর?'

'নাঃ, রাসুদা, থাক্!'

'থাক্! বলি থাকবার কি আছে? ভোম্বল যে সেবার পাঁজিপুঁথি দেখে আমাকে 'প্রাপ্তিযোগ' কি তা বুঝিয়ে পইপই করে বলল, 'মামা, এই সময়টুকু থেকে এই সময়-টুকুর মধ্যে টিকিট কিনলে ফার্স্ট প্রাইজ তোমার অবধারিত,—এটা বুঝি একটা যে সে কথা হল? না শুনলেও ক্ষতি নেই?'

আমি মুচকে হেসে বলি, 'তা তুমি তো আর পাও নি ফার্স্ট প্রাইজ?'

'পাই নি তা আমি জানি—' রাসুদা খিঁচিয়ে বলেন, 'পাই নি কতটুকুর জন্যে জানিস? মাত্র বাইশ নম্বরের এদিক্ ওদিকে। আমার টিকিট নম্বর সাতশো বাইশ, আর ফার্স্ট প্রাইজ পেল সাতশো চুয়াল্লিশ! কেন হল ওটুকু? এই একটি কারেক্ট ঘড়ির অভাবে। মহেন্দ্রযোগ, অমৃতযোগ, প্রাপ্তিযোগ—সবই দেখেছিল ভোম্বল, দেখে নি শুধু দেয়ালের ঘড়িটা কুড়ি সেকেণ্ড স্লো চলছে। আবার এই রেঞ্জার্সের টিকিট কিনতে

● কারেক্ট ঘড়ি

চলেছি, আজ লাস্ট ডে, অথচ বাড়িতে একটা কারেক্ট ঘড়ি নেই! ভাই ভাবছিলাম, যে আমাকে নৌকোডুবি থেকে বাঁচাল, কুকুরের মুখ থেকে বাঁচাল, লটারীতে ফার্স্ট প্রাইজ পাইয়ে দেব দেব করল, তাকে একটা কারেক্ট ঘড়ি দেওয়াই হচ্ছে···আরে, আরে, এই তো তোদের অ্যাংলো-সুইসের ঘড়ির দোকান! সত্যিকার ভাল ঘড়ি একটা বেছে দিতে হবে,—যেটা একেবারে কারেক্ট টাইম দেয়। সেই ঘড়ি আর এই টিকিটের টাকা দিয়ে আসব ভোম্বলকে। ড্রাইভার, থামো থামো!'

দোকানে নামলেন রাসুদা।

অগত্যা আমিও।

রাসুদা গুছিয়ে বসলেন। সেল্‌স্‌ম্যানের সঙ্গে অন্ততঃ লাখ খানেক কথা কইলেন, অজস্র ঘড়ির নমুনা দেখলেন, অবশেষে আমাকে একটি মাত্রও কথা বলতে না দিয়ে দু'শো বাহান্ন টাকা দিয়ে একটি ঘড়ি কিনলেন। তারপর হঠাৎ চট্‌পটিয়ে বলে উঠলেন, 'তুই ততক্ষণ দামটাম মিটিয়ে দিয়ে আয় বিনু, আমি চললাম ভোম্বলের কাছে। আমার আর্জেন্সিটা বুঝছিস তো? এই নে, রইল পার্স—'

পেটমোটা পার্সটা আমার হাতে দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন রাসুদা। মুহূর্তে হাওয়া।

সেল্‌স্‌ম্যান বলে উঠল, 'এ রকম আমাদের আইন নয়। টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত মাল আমাদের দোকানের বাইরে নিয়ে যেতে দিই না।'

আমি রাগে গরগর করতে করতে বলি, 'এই তো, নিন না আপনাদের টাকা।' সঙ্গে সঙ্গে পার্সটা খুলে ফেলি।

কিন্তু পুরোনো খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে কি বাজারে জিনিস দেয়? কিনতে গেলে ছেড়ে দেয়?

তোমাদের দেয় কিনা জানি না, আমাকে অন্ততঃ দিল না। অর্থাৎ আমায় ছেড়ে দিল না। পুলিসে ফোন করল, আমায় ধরিয়ে দিল; পুলিস আমাকে নিয়ে চলে এল এখানে,—এই হাজতে।

● কারেক্ট ঘড়ি

বাড়ি থেকে টাকা আনিয়ে দোকানে দিয়ে দিলেও রেহাই নেই আমার, অপরাধ গুরুতর। অপরাধ জুয়াচুরি। নিদেন পক্ষে তিনটি মাস তো বটেই!

বলা বাহুল্য, রাসুদার আর কোনও পাত্তা নেই। তবে জানি, হয়তো দুমাস কি এক বছর পরে হঠাৎ কোন একদিন এসে উদয় হবেন রাসুদা, আর আমাকে প্রায় মারতে মারতে ঘরে ঢুকবেন। —'ছি ছি বিনু, ছি ছি! ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে হয়ে শেষটা জেল খাটলি? কাগজে পড়ে ঘেন্নায় আর বাঁচি না! নেহাত তোকে বড্ড ভালবাসি বলেই না এসে থাকতে পারলাম না। নইলে তোর মুখ দেখবার কথা নয়। যাক্, চায়ের জল চড়াতে বল দিকি! আর আর সেরটাক ভাল সন্দেশ আনা। তার সঙ্গে নোনতাও কিছু—'

পেটমোটা পার্সটা আমার হাতে দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন রাসুদা। [পৃঃ ২৭৬

জানি এ হবেই। ছ মাস পরেই। রাসুদাও এ বিষয়ে কারেক্ট ঘড়ির তুল্য।

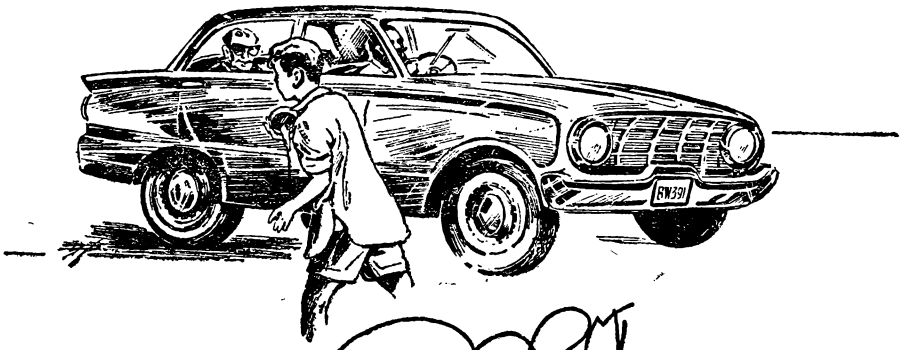

বেচারা ননীগোপাল

'বিখ্যাত হওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই—' নিশ্বাস ফেলে ভাবলো, হঠাৎ নিদারুণ রকমের বিখ্যাত হয়ে ওঠা 'কিশোর স্টার' অচিনকুমার! কাঁদো কাঁদো হয়ে ভাবলো, 'বিখ্যাত হওয়া মানেই জীবনের সাধ-আহ্লাদ সব গুবলেট হয়ে যাওয়া। অথচ বিখ্যাত হতে নামবার আগে কত কীই না ভেবেছিলাম আমি! ভগবান, কেনই বা সেদিন ঠিক সেই বিকেল পাঁচটার সময় পিসীর প্রাণে প্রেরণা জেগে উঠেছিল আমাকে ঝোলাগুড় আনতে পাঠাবার!···পিসী প্রেরণ না করলে কে যেত বিকেল পাঁচটার সময় মুদির দোকান থেকে ঝোলাগুড় আনতে!'

অথচ পিসীর প্রাণে কাউকে দোকানে প্রেরণ করবার প্রেরণা জাগলে, তার থেকে আত্মরক্ষা করতেই বা কে কবে পেরেছে? ননীগোপালও পারে নি। নইলে চেষ্টা কি করে নি? মাঠে চরতে যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল তখন।

ঘটনাটা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে আছে ননীগোপালের মনে। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি আমাদের চিরদিনের ননীগোপালই তোমাদের ওই কিশোর অভিনেতা অচিন-কুমার। যার ছবি দেখতে হুড়হুড় করে ছোটো তোমরা, ওদিকে হুড়হুড় করে টাকা আসে ননীগোপালের বাবা হরিগোপালের হাতে। হরিগোপালের হাতেই, কারণ ননীগোপাল তো সাবালক হয় নি!

কুমকুম

যাক্ ওসব সাবালক নাবালকের কথা। কথা হচ্ছে সেদিনের। ঠিক খেলতে যাবার মুখে পিসীর তাড়নায় গুড় আনতে গিয়েছিল ননীগোপাল, কিনেও ছিল, কিনে ফিরছিল তখন। হাতে একটা চটা-ওঠা কলাইকরা বাটিতে পোয়াটাক ঝোলাগুড় ছিল, আর মুখের রেখায় রেখায় ছিল সমস্ত পৃথিবীর প্রতি আক্রোশ, অভিযোগ আর বিদ্রোহ, ঠিক সেই সময় হঠাৎ ঘটে গেল সেই মারাত্মক ঘটনাটা। যেটা না ঘটলে বেচারা ননীগোপালকে বিখ্যাত হবার দুঃখ পোহাতে হত না!

ননীগোপালের ঠিক ঘাড়ের কাছে ঘ্যাঁচ করে একখানা চলন্ত গাড়ি থেমে পড়লো। দামী ঝকঝকে প্রকাণ্ড গাড়ি।

ননীগোপাল পাশ কাটাতে যাচ্ছিল, কিন্তু পাশ কাটাতে তাকে দিচ্ছে কে? ননীগোপালের জন্যেই যে নাগপাশের বন্ধন নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তিনি। মানে গাড়ির ওই মালিকটি। অথচ তখন ননীগোপাল জানেও না কে তিনি।

অতএব তিনি যখন ননীগোপালকেই উদ্দেশ করে বললেন, 'খোকা তোমাদের বাড়ি কোথায়?' তখন বেজারমুখ ননীগোপাল বিরক্ত গলায় উত্তর দিল, 'ওই ওখানে।'

'নাম কী তোমার?' ভদ্রলোকের কণ্ঠ স্নেহপূর্ণ।

কিন্তু ননীগোপালের কণ্ঠে নিমপাতার রস। কারণ হচ্ছে, প্রথম তো— 'ননীগোপাল' নামটাই তার এত অপছন্দের যে নতুন কেউ নাম জিগ্যেস করলেই রাগ ধরে যায় তার, দ্বিতীয়—ভদ্রলোকের এই অকারণ গায়ে-পড়ামি। অতএব নিমপাতার রস মাখানো কণ্ঠে উত্তর দেয় ননীগোপাল, 'ননীগোপাল মজুমদার।'

'নামটা পাল্টাতে হবে!' বলে ফেলেন ভদ্রলোক।

ননী ভুরু কুঁচকে বলে, 'কী বলছেন?'

'বলছি—নামটা অচল। মানে বলছি—সিনেমা করবে?'

সিনেমা করবে!

ছেঁড়া শার্ট আর হাফ্‌প্যাণ্ট পরা গুড়ের বাটি হাতে ধরা ননীগোপালকে প্রশ্ন করা হচ্ছে 'সিনেমা করবে?' হাতের বাটি হাতের মধ্যে কাত হয়ে যায়, আর ঝোলা

ঝোলা সেই গুড়টা ননীগোপালের শার্টের পেটে, প্যান্টের পায়ে এবং চটির আগায় পড়তে থাকে।

পড়তেই থাকে।

কারণ ননীগোপালের তো জ্ঞানচৈতন্য নেই!

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলেন, 'ঠিক তোমার মতই একটি ছেলে খুঁজছি আমি। বাবা আছেন তোমার?'

ননীগোপাল কষ্টে ঘাড় নাড়ে।

ভদ্রলোক বলেন, 'তবে চল তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি। এসো, উঠে এসো গাড়িতে।'

উঠে এসো গাড়িতে!

ননীগোপাল চোখে সরষে ফুল দেখে। বোঝা গেছে! এবার বোঝা গেছে ছেলে ধরা! গাড়িতে তুলে নিয়ে পালাবে। ব্যস্ আর দেখতে হয় না, গুড়ের বাটি হাত থেকে ফেলে ছুটতে থাকে ননীগোপাল। কিন্তু কতটুকুই বা ছুটবে? বাড়ি তো কাছেই। ননীগোপাল এসে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিরাট গাড়িখানাও ননীদের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

জোরে কড়া নড়ে ওঠে!

তারপর? নড়ে ওঠে ননীগোপালের ভাগ্যের চাকা।

তারপর এই! বিখ্যাত হওয়া!

যার জন্যে জীবন মহানিশা হয়ে যাচ্ছে ননীগোপালের!

অবিশ্যি মিথ্যে বলব না, প্রথম দিন যখন শুনলো ওই ভদ্রলোক একজন বড় সিনেমা পরিচালক, আর ননীকে পার্ট দেবার জন্যে বাবার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করে গেছেন তিনি, আহ্লাদে দিশেহারা হয়ে উঠেছিল ননী।...তক্ষুনি ছুটে যেতে চাচ্ছিল প্রাণের বন্ধু সুনীল বাবুন ঘণ্টু আর নন্দকে খবরটা দিতে। তারপর ভাবল থাক্, যদি শেষ পর্যন্ত না হয়? যদি ওরা হাসে? যদি বলে, 'গুল মারতে আর জায়গা পাস নি? আমরাও

তো রাতদিন গুড় আনছি, নুন আনছি, হলুদ আনছি, কই ঘাড়ের কাছে ঘ্যাচ করে গাড়ি তো থামে না কোনোদিন! ডেকে তো বলে না 'সিনেমা করবে'?'

হোক, ছবি হোকই আগে।

ননীগোপাল ততক্ষণ ভাবতে থাকুক কী কী সাধ-শখ মিটিয়ে নেবে সে! হ্যাঁ, শুনেছে সে, অনেকগুলো নাকি টাকা দেবে তারা ননীগোপালকে। তা বাবা অবিশ্যি সে টাকা সব ননীর হাতে দেবেন না, সেকথা ননী হাড়ে হাড়ে জানে। মামার বাড়ি থেকে পাওয়া রথ দোলের পার্বণীর টাকাগুলো পর্যন্ত বাবা তুলে রাখেন পাছে ননী নষ্ট করে ফেলে বলে।

তবু এর থেকে অন্ততঃ দশটা টাকাও কি ননীকে দেবেন না বাবা? দেবেন—এমন একটা আশা প্রাণে ফুটে ওঠে ননীর। আর দশটা টাকাই তো রাজ ঐশ্বর্য! আস্ত একটা টাকাই বা কবে খরচ করতে পেরেছে বেচারা!

ওই দশটা টাকা পেলে (দশ টাকা দিয়েই ভাবে ননী) প্রথমেই ননী খুব ভাল একটা লাটাই কিনে আনবে, আর আনবে অনেকখানি মাঞ্জা দেওয়া সুতো! ভাল একটা লাটাইয়ের বড় বাসনা ননীর।

তারপর?

ননীর চোখে ভেসে ওঠে রাঙতা মোড়া মোড়া বড় বড় চকোলেট, রাশি রাশি আলুকাবলি, ঝুড়ি ঝুড়ি ফুচকা, প্যাকেট প্যাকেট ডালমুট! ভেসে ওঠে স্কুলের কম্পাউণ্ডে বসা রামলালের হজমি গুলি, নুন, যোয়ান, আমসত্ত্ব!

জীবনে কখনো এসব আশ মিটিয়ে কিনতে পায় নি ননীগোপাল! চারটে ছটার বেশী পয়সাই পায় নি কখনো! একদিন আমসত্ত্ব একটু ফাউ চেয়েছিল বলে মারতে উঠেছিল রামলাল। এরপর, মানে ওই দশটা টাকা পাবার পর নগদ এক টাকার আমসত্ত্ব কিনে ফেলবে ননী। রামলালের নাকের সামনে ফেলে দেবে টাকাটা।

বন্ধুদেরও ভাগ দেবে অবশ্য ননী খাবারটাবারের।

ধর দু-টাকার ফুচকা কিনলো ননী, সব কি একা খেতে পারবে? না তাই খায়

মানুষ? টাকা পেলে আরও কী কী করবে ননীগোপাল, ভাবতে থাকে বিচলিত চিত্তে! তারপর ভাবতে থাকে ননী সিনেমা করছে, ননী বিখ্যাত হচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে বুকটা ধড়ফড়িয়ে ওঠে ননীর, মাথা ঘুরতে থাকে। খেতে পারে না সেদিন, ঘুমুতে পারে না। পিসী গুড়ের কথা জিগ্যেস করলে কী বলবে, বাটিটা হারিয়ে যাওয়ার দরুন কোন গল্প শোনাবে, সে সব বানাতেও ভুলে যায়।

শুধু মনের মধ্যে ভাসতে থাকে ননী লাটাই কিনছে, ননী চকোলেট কিনছে, ননী মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে বন্ধুদের নিয়ে ফুচকা খাচ্ছে, পানের দোকানে বসে স্ট্র ডুবিয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছে।

বন্ধুদের নিয়ে ছাড়া সুখ ঐশ্বর্য ভোগের কথা ভাবতেই পারে না ননী। অতএব বন্ধুদের মুখগুলো সমেতই স্বপ্ন দেখে ননী।

ননীর নাম হয়েছে, ননী বন্ধুদের পাস দিয়ে সিনেমা দেখাচ্ছে, ননী তাদের দলকে একখানা ভাল ক্যারম বোর্ড কিনে দিচ্ছে, ননী আরও কত কীই করছে!

কিন্তু স্বপ্ন দেখতে দেখতে কি ননীগোপাল স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে গেল? যেখানে সম্ভব অসম্ভবের কোনো বালাই নেই। যেখানে নিজের গায়ে চিমটি দিয়ে দেখতে হয়, বেঁচে আছি কি না!

হ্যাঁ অসম্ভবই সম্ভব হল।

একবার পর্দায় দেখা দিতে না দিতেই ননী ভীষণ বিখ্যাত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তাকে নিয়ে।

নিত্য নতুন দল আসে ননীর বাবার কাছে, নতুন নতুন ছবিতে কণ্ট্রাক্ট করতে। অবিশ্বাস কোরো না, এরকম হয় আজকাল। অবশ্য আজকাল কেন, চিরকালই। কথাতেই আছে 'কাল যে রাজা আজ সে ফকির, আজ যে ফকির কাল সে রাজা!'

ননীর ক্ষেত্রেও তাই হল।

ফকির ননী রাজা হয়ে পড়ল ক'দিনের মধ্যে। ননীর নামে 'চেকে'র হরির লুঠ

দিয়ে যায় লোকে, আর ননীর বাবা কুড়োন সেই হরির লুঠ! চেক্ চেক্ চেকের ওপর চেক্!

চেক্‌গুলো যে টাকা, সে কথা ননী যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, শুধু সংসারের রংবদল হওয়াটা বুঝতে পারে। ননীর বাবা যে ননীকে ওই 'চেকে'র মহিমাতেই 'ননী' না বলে 'অচিন' বলছেন, এটা বুঝতে পারে। চেকের কল্যাণেই দামী ছেলে হয়ে উঠেছে ননী এ বাড়িতে, বুঝতে আটকায় না।

দিদি বলে, 'এই অচিন শোন্ ভাই লক্ষ্মী সোনা।'

মা বলেন, 'অচুন বাবা আমার!'

পিসী বলেন, 'ওরে আমার অচ্যুতানন্দ!'

এতটুকু একটা ছেলেকে দিয়ে এত সুখ সুবিধে হচ্ছে সংসারের, এ কি কম আশ্চর্য কথা! আদর করবে না সবাই তাকে?

এমন কি ননীর যে আর লেখাপড়া না করলেও চলে এভাব ব্যক্ত করছে পিসী আর কাকা। যেন—টাকার জন্যেই তো পাসটাস করা, তা টাকাই যখন এসে যাচ্ছে এত, তখন আর—

এখন হীরোর ছোট ভাই হচ্ছে, এরপর হীরো হয়ে উঠবে। তখন পায় কে!

এখনই তো যা হচ্ছে—

ঝপাঝপ পট পরিবর্তন।

সংসারের পুরনো চেহারা আর কোথাও নেই। ছিটের শার্ট জিনের প্যাণ্ট থেকে নাইলন শার্ট ডেক্রন প্যাণ্ট, আমকাঠের চৌকি আর ছেঁড়া টিকিনের তোশক থেকে সাদা পালিশ খাট ডানলোপিলোর গদি, ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি থেকে মুরগির ঝোল ফ্রায়েড্ রাইস, এমন আরও কত কী। সকালের মাজনটি থেকে রাত্তিরের বিছানার ধারে রাখা জলের গ্লাসটি পর্যন্ত সবই ভোল পালটেছে।

সিনেমার ছবির মতই ঘটে যাচ্ছে এসব।

কুমকুম

ছবির দর্শক ননী।

ননী দেখছে চিরদিনের পাড়া ছেড়ে চলে এসেছে তারা, নতুন এক ঝকঝকে অচেনা পাড়ায় নতুন এক ঝকঝকে বাড়িতে। সে বাড়ির মেজে থেকে ছাত পর্যন্ত দিব্যি বড়লোক বড়লোক ভাব।

আর ওই বড়লোকদের বাড়ির মতই সাজিয়ে ফেলা হয়েছে সেই বাড়িটাকে সোফা সেটি ডিভ্যান কার্পেট দিয়ে। ছবির মত দেখতে সব।

সিনেমার ছবির দর্শক শুধু আবার দেখছেই না—শুনছেও কত কিছু। শুনতে পাচ্ছে ননীর দিদি সিল্কের শাড়ি পরে সোফায় বসে আহ্লাদে গলায় বলছে, 'ফ্রিজি-ডেয়ার ছাড়া মানুষ যে কী করে বাঁচতে পারে জানি না বাবা!'

ননীর মা মোটা শরীর নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলছেন, 'ডানলোপিলোর গদি ছাড়া ঘুমোবার কথা ভাবতেই পারি না আমি আর! বাবাঃ! একদিন দিদির বাড়ি রাত্তিরে থাকতে গিয়ে কী কষ্ট!'

... ...

ননীর কাকা বলছেন, 'দার্জিলিং যদি যেতেই হয়, 'প্লেনে' ছাড়া যাওয়ার কোনো মানে হয় না।' আর ননীর বাবা বলছেন, 'নিউ আলিপুরে একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে পঁচাশী হাজারে, ভাবছি দেখে আসি।'...বলছেন, 'গাড়িটা কেনা হল বটে, তেমন সুবিধের নয় ওটা। বদলে ফেলতে হবে।'

কিন্তু ননী? ননীর খবর ননী জানে না। ননী শুধু 'অচিনকুমারের' খোলস পরে এ হাত থেকে ওহাতে লোফালুফি হচ্ছে।

ননীর যে একটা ভাল লাটাইয়ের ভারী শখ ছিল সে কথা ভুলে গেছে ননী। ভুলে গেছে জীবনে কখনো ননী আশা মিটিয়ে কিছু কেনে নি। ভুলে গেছে পৃথিবীতে ফুচকা বলে একটা জিনিস আছে। আছে আলুকাবলি হজমিগুলি।

তা হরিগোপাল কি ননীকে কিছুই দেন না?

আরে সেকি, দেন বইকি।

নিশ্চয় দেন!

দু তিনটে চারটে একশো টাকার নোটই দেন ননীকে প্রায়ই। বলেন, 'এত পাচ্ছিস তুই, রেখে দে।'

কিন্তু একশো টাকার নোট দিয়ে কি ঝালমুড়ি খাওয়া যায়? ঘুড়ি কেনা যায়? তাছাড়া যাদের নিয়ে খেলে সুখ খেয়ে সুখ, যাদের সব কিছু দেখিয়ে সুখ, তারা কোথায়? সেই তার প্রাণের বন্ধুরা? তারা তো সেই পুরনো পাড়ায়! তাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে কখন?

এ পাড়া থেকে তো যাওয়াই হয় না।

দিদি ঝংকার দিয়ে বলে, 'তারাই বা আসে কই? তাদেরও তো মন-কেমন-করা উচিত! তোরই বা এত কিসের গরজ!'

মা আদর করে বলেন, 'যাস যাস একদিন যাস গেলেই হবে একদিন।'

আদর অসহ্য!

আদরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে ননী!

দিদি ঝংকার দিয়ে বলে, 'তারাই বা আসে কই? তাদেরও তো মন-কেমন করা উচিত!...

এর থেকে অনেক ভাল ছিল মার সেই রাতদিন বকুনি। বেলা অবধি ঘুমুতে দেখলে বকতেন মা, পড়া না করলে বকতেন, কাজ করতে না চাইলে বকতেন।

এখন?

কুমকুম

এখন ননী উঠে পড়লে বলেন, 'আহা আহা এখুনি উঠছিস কেন? আর একটু ঘুমো না। রাত অবধি খেটে এসেছিস! পড়তে বসলে বলেন, 'ঘাড় গুঁজে পড়িসনে বাবা মাথা ধরবে! নাই-বা হল এ বছর পরীক্ষা দেওয়া, শরীর আগে না পড়া আগে?'

আর কাজ করা?

সে তো প্রশ্নের অতীত!

ননী হাঁপিয়ে উঠছে।

আদরের চাপে, খাওয়ার চাপে, টানাটানির চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে একেবারে! ভেবে পাচ্ছে না কী লাভ হচ্ছে তার বিখ্যাত হয়ে?

অথচ ক্রমশঃই আরও বিখ্যাত হচ্ছে ননী! এ পাড়ার ছেলেমেয়েরা, যাদের চেনে না ননী, তারা ওকে দেখলেই ফিসফিস করে বলাবলি করছে, 'অচিনকুমার··· অচিনকুমার?'

পালালে কেমন হয়?

ভাবতে থাকে ননীগোপাল!

সেই তার পুরনো পাড়ায় চলে যাবে, মাঠে গিয়ে খেলবে! একশো টাকার ঝালমুড়ি আলুকাবলি ফুচকা আইসক্রীম কিনে বন্ধুদের খাওয়াবে, পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনবে!

পালাতেই হবে।

না পালালে তো যেতে দেবে না কেউ!

অবশেষে সত্যিই একদিন বিকেলে বাড়ি থেকে পালায় ননী! শূটিং ছিল না সেদিন, শান্তি ছিল প্রাণে। বাসে চড়ে, সেই তাদের পুরনো পাড়ায় এসে নামলো ননী, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল খেলার মাঠে।

আশ্চর্য, সবই সেই রকম আছে।

কুমকুম

সবাইয়ের জীবন !

ননীর জীবনটাই শুধু বিলকুল ধোঁয়া হয়ে গেছে।

ওরা খেলছে, সেই ভীষণ হইচই করে। ননী বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে ! আস্তে আস্তে বেড়া পার হয়।···তারপরই ঘটে যায় এক ঘটনা। কোথা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে একদল ছেলে এসে ননীকে ঘিরে ধরে, গুনগুন করে ওঠে 'অচিনকুমার অচিনকুমার !' তারপর কোথা থেকে যেন একটুকরো একটুকরো কাগজ জুটে যায় তাদের হাতে, তাই বাড়িয়ে ধরে ধরে বলে, 'একটু অটোগ্রাফ একটু অটোগ্রাফ্ !'

কে এরা ?

এদের তো চেনে না ননী ! রাস্তা থেকে এসেছে।

যাদের চেনে তারা তো ওই দূরে ওখানে। খেলছিল, এখন খেলা ফেলে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এগিয়ে আসছে না !

ননীই বা কী করে এগিয়ে যাবে ? অচিনকুমারের ভক্তরা যে ঘিরে ধরেছে তাকে ! ননী অতএব ঘাড় গুঁজে সই করতে থাকে। এদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই করতে থাকে।···কিন্তু সই করতে করতে যে বিকেল ক্রমশঃ সন্ধ্যায় গড়িয়ে যায়।···ননী দেখে মাঠের ওদিক থেকে চলে যাচ্ছে সুনীল বাবুন ঘণ্টু নন্দ।

ননী এদের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে, এরা ননীর জামা চেপে ধরে—'আমারটা আমারটা···আর একটা !···এই পাড়ারই তো ছেলে বাবা···!'

ননী এবার জোর করে হাত ছাড়ায় তাদের। দৌড়তে থাকে সেই তার প্রাণের বন্ধুদের পিছনে। হঠাৎ হিহি হিহি একটা হাসি শুনতে পায় নিজের পিছনে। যারা এতক্ষণ অটোগ্রাফ্ নিচ্ছিল তারাই হেসে উঠেছে। প্রায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, 'দেখেছিস, ডাঁট দেখেছিস ? এই তো সেদিন এই পাড়াতেই ছেঁড়া শার্ট পরে রেশনের থলি বয়ে আনতিস, কে না দেখেছে ! এখন আর পয়সার গুমরে চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না। অটোগ্রাফ্ দিচ্ছিল না যেন ভিক্ষে দিচ্ছিল ! আঙুল ফুলে

কলাগাছ হলে যা হয় আর কি! ভাবছিলাম সিনেমায় একটা চান্স দেবার কথা বলবো একবার, তো চলেই গেল গটগটিয়ে।'

ননী দাঁড়িয়ে পড়ে।

ননীর পা চলতে চায় না!

ননীর চোখ দিয়ে জল পড় পড় হয়। তবু আস্তে আস্তে ননী বন্ধুদের দিকে এগোতে থাকে! ওরা অভিমান করে চলে গেছে। ওরা কী করে বুঝবে এই বাজে বখাটে ছেলেগুলোর হাত এড়াতে পারছিল না বলেই ওদের কাছে যেতে পারছিল না ননী।

ননী ওদের অভিমান ভাঙাতে এগোয়।

একশোটাকার নোটটা আছে প্যান্টের পকেটে মুঠো করা!

ওদের সঙ্গ ধরতে দস্তুরমত ছুটতে হল।

হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পড়ে বলে উঠল ননী, 'এই তোরা চলে যাচ্ছিস যে?'

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন এইমাত্র প্রথম দেখল ননীকে, এই ভাবে বলে উঠল, 'আরে···অচিনকুমার যে? হঠাৎ এদিকে? কোনো পচাগলির শূটিং ছিল বুঝি?'

ননী তথমত খেয়ে যায়।

ননী বোকার মত একটু হেসে বলে, 'কেন শূটিং না থাকলে বুঝি আসতে নেই?'

'বাঃ। আসবে কেন? তোমার অমূল্য সময়!'

'ইশ ভারী একেবারে!' ননী জোর গলায় বলে, 'সব সময় বুঝি আমি সিনেমা করছি। চল্ না কোথাও গিয়ে বসি গে!···হ্যাঁ রে ফুচকা আর ঝালমুড়িওলা আসে না আর?'

ওরা গম্ভীর ভাবে বলে, 'আসবে না কেন, গরিব পাড়ায় ওরা ছাড়া আর কে আসবে?'

'আহা ওরকম করে বলছিস কেন? ভাবছিলাম আগের মত সবাই মিলে এক-দিন, মানে আর কি আমি—'

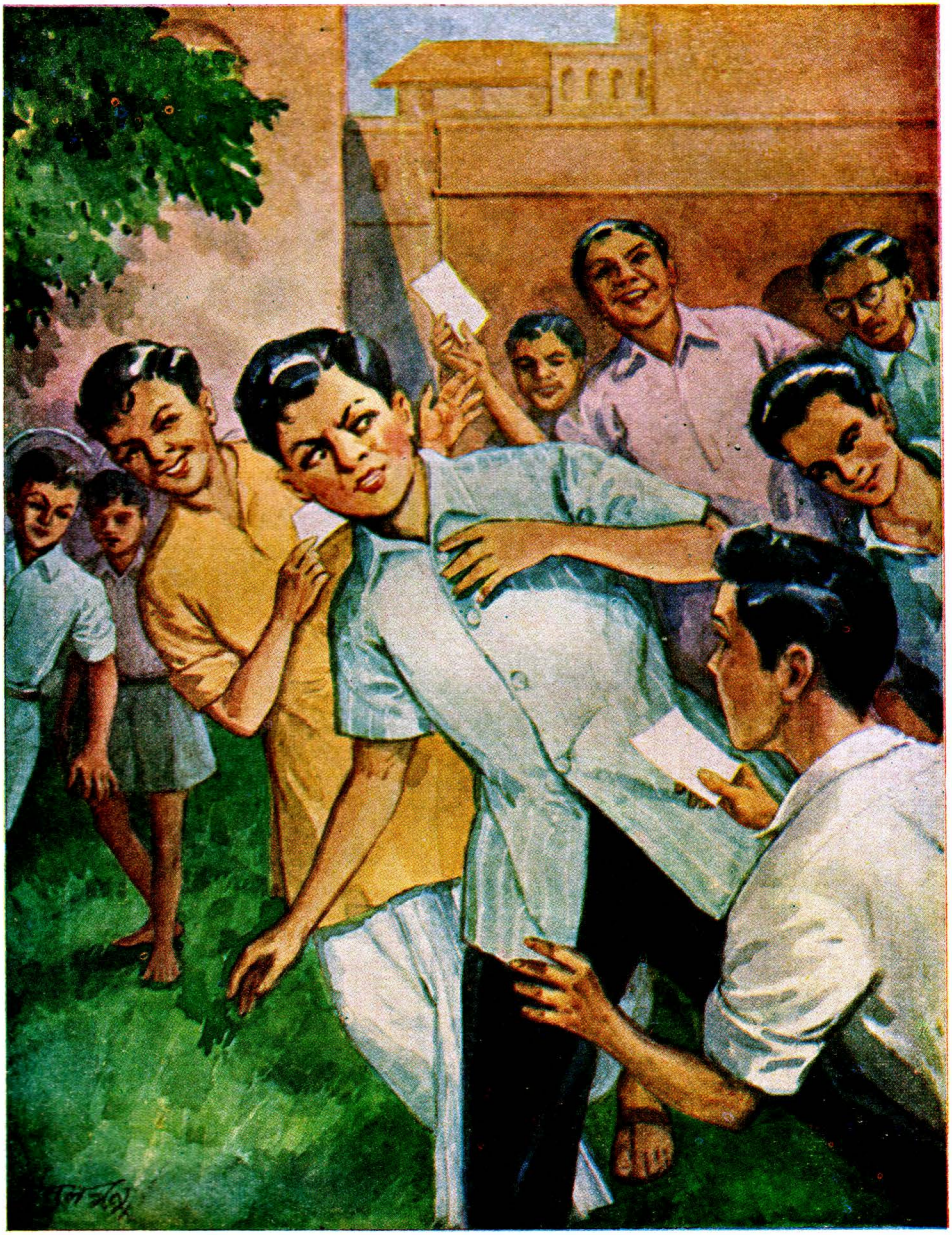

একটুকরো একটুকরো কাগজ···বাড়িয়ে ধরে ধরে বলে, 'একটু অটোগ্রাফ্··· [পৃঃ ২৮৭

বাবুন ফট করে বলে ওঠে, 'তা খাওয়াবে যদি তো ঝালমুড়ি কেন বাবা? ঢের তো পয়সা হয়েছে, রেস্টুরেণ্টে খাইয়ে দাও না!'

'রেস্টুরেণ্টে? তবে তাই চল্!' বলে ননী।

যদিও তার নিজের মনের ইচ্ছে অন্যরকম ছিল। যে সব 'ওলা'গুলোর কাছে চিরদিন দুঃখী ভাবে থেকেছে ননী, কখনো চারটে ছটা পয়সার বেশী এগিয়ে দিতে পারে নি যাদের সামনে, আর ফাউ চেয়ে অপ্রতিভ হয়েছে, তাদের কাছে একবার—মানুষের মতন হতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তা হল না। হয় না। দেখছে ননী এ পর্যন্ত।

পাড়ার ওই নীল আলো জ্বালা দামী সেলুনটায় চুল কাটার ভারী সাধ ছিল ননীর, কিন্তু পুরো একটা টাকা নেয় ওরা বলে যাওয়া হত না, সেখানে আর জীবনে কোনো-দিন চুল কাটা হল না ননীর। ফুটপাথ থেকে হঠাৎ একেবারে সাহেব পাড়ার সেলুনে উঠে গেল।

অতএব ঝালমুড়ি হল না, রেস্টুরেণ্টেই চললো সবাই।

কিন্তু যারা চললো তারা কি ননীর সেই পুরনো প্রাণের বন্ধুরা? তারা যেন আর কেউ। ননী যেন তাদের সেই চিরকালের বন্ধু নয়, যেন নতুন একটা কৌতূহলের উপকরণ।

ননী যত পুরনো কথা তুলতে চায়, ওরা তত ননীর নতুন কথা শুনতে চায়।

ননী যত বলতে চায়, 'মাঝে মাঝে ভাই পালিয়ে আসবো, খেলতে টেলতে না পেয়ে এত খারাপ লাগে,' ওরা ততই বলে, 'এক আধটা চান্স পাইয়ে দে না বাবা, এত যখন নাম করেছিস এটুকু আর পারবি না? তোর মতন কুমার-টুমার না হতে পারি, কাটা সৈনিকই হবো না হয়!'

ননী বলে, 'দুর্ ওতে কোনো সুখ নেই!'

ওরা বলে, 'হুঁ বাবা, বুঝেছি! বস্তা বস্তা টাকা আসছে, কত অ-সুখ!'

'দুর্—এত টাকায় কী হবে?' বলে ননী।

ঘণ্টু হেসে বলে, 'আহা রে রামকৃষ্ণ এলেন !'

তার পরে 'কমলা রেস্টুরেণ্টের' সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা।

ননী বলতে যাচ্ছিল, 'বল্ কী খাবি ?'

মুখের কথা মুখেই থাকে, হঠাৎ ননীর ঘাড়ের কাছে ঘ্যাঁচ করে একখানা বিরাট গাড়ি থেমে পড়ে। আর তার থেকে নেমে পড়েন ননীর বাবা।

নেমেই হইহই করে ওঠেন, 'যা ভেবেছি, তাই! এইখানে এসে জুটেছ তুমি? এখানে কী করতে? এখানে কী করতে? চল চল!...ওই যে গাড়িতে রামবল্লভবাবু রয়েছেন, মস্ত বিজনেসম্যান। উনি তোকে ওঁর একটা নতুন ছবিতে নামাতে চান। আজই কণ্ট্রাক্ট করবেন। উঠে পড়, উঠে পড়! আশ্চর্য! হঠাৎ এখানে কি জন্যে—'

ছেলেকে প্রায় টেনে গাড়িতে তোলেন হরিগোপাল।

'আ—আমি ওদের খাওয়াবো বলেছি—'

কাতর ননী শুধু এইটুকুই বলতে পারে।

হরিগোপাল বলে ওঠেন, 'তাই বুঝি? ছোঁড়াগুলো বুঝি তোকে পেয়ে বসেছিল? আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি—' ওদের চারজনের সামনে একখানা দশটাকার নোট ছুড়ে দেন হরিগোপাল। বলেন, 'অচিনের এক মিনিটও সময় নেই, তোমরা কিছু মনে কোরো না। চা—খেও—'

চারজোড়া হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায় গাড়িটা।

আর ননী?

ননী শুধু চোখের জল চাপতে চেষ্টা করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। জীবনেও যে আর কখনো বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না, একি বুঝছে না ননী?

বুঝছে না, ননীদের সেই চিরকালের ভালবাসার পাড়ায় 'ননী' নামক সদা

কুমকুম

হাসিখুশী ছেলেটার মৃত্যু হয়ে গেল।…'ননী আয়' বলে আর কেউ কখনো ডাকবে না ননীকে। চিরকাল এখন ননীকে ওই অচিনকুমারের খোলস পরেই বেড়াতে হবে।

ওদের চারজনের সামনে একখানা দশটাকার নোট ছুড়ে দেন হরিগোপাল। [পৃষ্ঠা ২৯০

হায় সেই প্রথম দিন কেন খুব বিচ্ছিরি অভিনয় করল না ননী? কেন বিখ্যাত হল! কেন দামী হয়ে উঠল?

এর থেকে তো অনেক ভাল ছিল বাটি করে গুড় আনা, থলি করে রেশন আনা, কিছু কিনতে না পাওয়া। তাহলে তো ওই যারা রাস্তায় ইঁট দাঁড় করিয়ে ক্রিকেট খেলছে, তাদের দল থেকে কেউ বার করে দিতে পারত না ননীকে। পারত না ছিনিয়ে নিয়ে যেতে।

আশ্চর্য! যাতে জীবনের সব সাধ আহ্লাদ ঘুচে যায়, সব সুখ শান্তি মুছে যায়, সেটার জন্যেই এত চেষ্টা কেন মানুষের? কেন চায় বড়লোক হতে, বিখ্যাত হতে?

মানুষ মাত্রেই কি পাগল?

———

• পাকা খেলোয়াড় •

যাচ্ছিলাম একটা ঘটকালির কাজে।

জগতের ওঁচা কাজ। অথচ না করেও উপায় নেই। মামার অনুরোধ! বলা বাহুল্য, মামার অনুরোধ প্রথমটা বেশ প্রসন্ন মনে নিতে পাচ্ছিলাম না, মামা সেটা অনুধাবন করেই ধিক্কার দিয়ে ওঠেন—হ্যাঁ রে, উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে, আর এই সামান্য তেইশ মাইল ট্রেন-জার্নি, এর জন্যে এত দুশ্চিন্তা তোর? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

বরং ঢেঁকি হজম করা সহজ, কিন্তু এতগুলো 'ছিঃ' হজম করা? না বাবা! অগত্যা এই! মামার এক খেঁদি মেয়ের বিয়ের চেষ্টায়, হাওড়া ময়দান ছাড়িয়ে, ছোটো-রেলে চেপে, ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে এমন একটি জায়গার উদ্দেশে চলেছি, জীবনে যার নামও শুনিনি।

গাড়িগুলো মাপে ছোটো—বয়সে নয়। দেখে মনে হচ্ছে, রেলগাড়ি আবিষ্কারের প্রথম যুগে যেসব মডেল তৈরী হয়েছিল, সেগুলোকে মিউজিয়ামে রাখার বদলে এই লাইনে বসিয়ে রেখে গেছে।

কুমকুম

চলেছি তো—চলেই-ছি !

তেইশ মাইল রাস্তা পার হতে যে অনন্তকাল ধরে গাড়ি চড়তে হয়, এ-অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আর আশপাশের কী দৃশ্য !···শুধু পানাপুকুর, বাঁশঝাড় আর কচুবন ! কলকাতার এত কাছে যে এখনো এমন অজ-পাড়াগাঁ আছে, জানতাম না। দেখতে দেখতে চোখ কেমন করছে। মনে হচ্ছে—জীবনে কখনো বুঝি কলকাতার রাস্তা চোখে দেখিনি, কেবল এই পথেই চলেছি জীবনভোর।

অবিশ্যি শুধুই চলছি না। থেকে-থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে থেমেও থাকছি। বিনা নোটিশে গাড়ি মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কেন থামছে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

কোথায়-বা ড্রাইভার, কোথায়-বা গার্ড !

দেখে মনে হচ্ছে না, 'কেউ কারুর কড়ি ধরে।' কিংবা কে জানে, হয়তো যাত্রীদের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের আশা মিটিয়ে দিতেই রেল কোম্পানির এই উদারতা।

ভয়ে কাঁটা হয়ে ভাবছি—যদি বিয়েটা গেঁথে যায় !

হে ঈশ্বর ! মামার ওই খেঁদি কালিন্দী মেয়েকে যেন কিছুতেই পছন্দ না করে এরা ! অবিশ্যি, এ-রকম দেশ ভিন্ন আর কোথাকার লোক পছন্দ করবে তাকে ?

কিন্তু পছন্দ হয়ে গেলে আমার কী অবস্থা হবে ? পাকা দেখা থেকে শুরু করে —মেয়ে নিয়ে যাওয়া, জামাই নেমন্তন্ন করতে আসা, কী না চাপিয়ে দেবেন মামা আমার ঘাড়ে ? ভাগনের ঘাড়ের মতো এমন 'ভার-সহ' ঘাড় আর কোথায় পাওয়া যায় ? তা ছাড়া—'সামান্য তেইশ মাইল ট্রেন-জার্নি' বই তো নয় !

দুঃখের রাত্রিও পোহায় !

তেইশ মাইল রাস্তাও শেষ হয়। এবারে গ্রামের পথে ঘুরে-ঘুরে, বাড়ি খোঁজার পালা। এমন লোককে জিগ্যেস করতে হবে, যে আবার না কোনো সন্দেহ করে

বসে। যাক্, বিধিই মিলিয়ে দেন। বছর বারো-তেরোর একটা ছেলে এদিক্-ওদিক্ তাকাতে-তাকাতে আসছিল, হঠাৎ আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। যেন আমারই প্রতীক্ষা করছিল। অবিশ্যি তা নয়, নিশ্চয়ই—নতুন লোক দেখেই। তাছাড়া—মুখে বললে অহংকার করা হয়, এ-তল্লাটে আমার মতো ভব্যিযুক্ত লোকই-বা ক'টা আছে?

এই ছোকরাটিকেই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, হরিপদবাবুর বাড়ি কোথায়, কিন্তু আমার আগে সেই আমাকে প্রশ্ন করে বসে—আপনিই শিশির সর্বাধিকারী তো? কলকাতা থেকে আসছেন?

ছোকরার মুখে একমুখ হাসির আলো।

সত্যি বলতে কি, রীতিমত অবাক্ হয়ে যাই! মা-বাপের দেওয়া নামটা—শিশিরই বটে, পদবীটাও সর্বাধিকারী সত্যি, কিন্তু আমিই 'সেই শিশির সর্বাধিকারী' এ-কথাটা বেশ একটু রোমাঞ্চকর নয় কি?

বললাম—তুমি কে বলো তো? আমাকে চিনলে কি করে?

ছেলেটা সেই হাসির আলোমাখা মুখে রহস্যের আভাস টেনে এনে বলে—আপনাকে আর কে না চেনে স্যার?

এহেন কথা শুনতে অবশ্য বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছোতে পারি না! এ জগতে—এক মামা ব্যতীত আর কেউ আমাকে চেনে কি না, এই তো সন্দেহ ছিল। আর, সে চেনাই কি সত্যি চেনা? রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—"কেউ যে কারে চিনিনাকো সেটাই মস্ত বাঁচন, তা না হলে নাচিয়ে দিতো বিষম তুর্কি-নাচন—"

কিন্তু, এ ছোকরা বলে কি?

আমাকে কে না চেনে? এত বিখ্যাত হয়ে ওঠবার মতো কবে কি কুকর্ম করেছি!

হেসে বলি—দেশসুদ্ধু লোক হঠাৎ আমাকে চিনতে যাবে কেন হে?

ছোকরা উজ্জ্বল চোখে বলে—চিনবে না? বাঃ, কাগজে-কাগজে—রোজদিন নাম

ছাপা হচ্ছে না? ছবি ছাপা হচ্ছে না? কত বড় ফুটবল খেলোয়াড় আপনি! আমাদের কত ভাগ্য যে এখানে এসেছেন।

সম্ভ্রম সমীহ আর আনন্দ—তিনের সংমিশ্রণ তার কণ্ঠে।

হরি! হরি! এই ব্যাপার!

বিখ্যাত খেলোয়াড় শিশির সর্বাধিকারীর সঙ্গে যে আমার নামের মিল আছে, সে কথাও তো কই মনে পড়ে না কখনো। অবশ্য আমি এমন খেলা-পাগল নই যে, খেলোয়াড়দের নাম ইষ্টনামের মতো জপমালা করবো!

আর, নিজে খেলা? ফুটবলকে কখনো নিজের 'ফুটের' ধারে-কাছেও আসতে দিইনি।

কিন্তু এ ছেলেটা যে এক-বুক আশা আর এক-মুখ হাসি নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নের জাল বুনছে! কি করে নৈরাশ করি?

একেই বলে—গ্রাম্য-সরলতা!

সত্যি, শহরের ছেলেগুলো এ বয়সে কী ডেঁপো আর কী এঁচোড়েপাকাই হয়ে ওঠে! আর, এ বেচারা নামের সঙ্গে নামের মিল দেখেই স্থির সিদ্ধান্ত করে বসে আছে—'আমিই সেই।'

আচ্ছা, নামটা জানলো কি করে? তাও তো বটে! কপালে তো নিজের নামটা টিকিট মেরে বেড়াচ্ছি না আমি।

তাই জিগ্যেস করি।

ছেলেটা সবিনয় সম্ভ্রমে বললে—জানি! আপনার মামা, আমার জেঠামশাইকে চিঠি দিয়েছিলেন। হরিপদবাবু আমার জেঠামশাই!

—তাই না কি? ভালো-ভালো! খুশী হয়ে উঠি—তা, তোমার জেঠামশাই বুঝি বলে দিলেন আমার কথা?

—না, না, জেঠামশাই খেলার কি জানেন? ফুটবলের নামই শোনেননি হয়তো-বা! আমিই কাগজ পড়ে-পড়ে·····চিঠিটা আসা পর্যন্ত দুদিন ধরে আহ্লাদে

ঘুম হচ্ছিলো না আমার। কতক্ষণে দেখবো আপনাকে! উঃ, কী সৌভাগ্য আমাদের, ভাবাই যায় না।···আমার বন্ধুরা তো বিশ্বাসই করছিল না। কত করে বলে-কয়ে বুঝিয়েছি তাদের। সকলে দেখতে আসবে আপনাকে!

আনন্দে যেন হাঁসফাঁস করতে থাকে ছেলেটা।

আহা, এত আশায় ছাই দেবো? এত সাধে বাদ? হয়তো—কত মুখ বড়ো করে বন্ধুদের বলে রেখেছে! এখন যদি সত্যিকথা ফাঁস হয়ে যায়, দুঃখে অপমানে মারাই যাবে।

ভারী মায়া হয়; এই সুকুমার হৃদয়ে আঘাত দেবো? তার চেয়ে 'পাকা খেলোয়াড়' হয়ে পড়লেই-বা ক্ষতি কি? নাম জাল করছি না! শুধু একটু সত্য গোপন। 'অশ্বত্থামা হত'র মতোই।

সেই ভাবেই বলি—তোমার বন্ধুরা অবিশ্বাস করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? ধরো, আমি যদি খেলোয়াড় সর্বাধিকারী না হই? এক নামে দুজন লোক হয় না?

ছেলেটা সজোরে মাথা নেড়ে বলে—ইশ! তাই বই কি? আর, চেহারা? রোজ ছবি দেখছি না কাগজে?

খেলোয়াড় সর্বাধিকারীর ছবি আমিও দেখেছি বহুবার, কোনোদিন নিজের সঙ্গে সাদৃশ্য অনুভব করিনি। আর সেটা করলেও খুব বেশী পুলকিত হবার কথা নয়; তবু খ্যাতির মোহ!···আহা, মিথ্যে খ্যাতিতেই এত তৃপ্তি, না জানি সত্যি বিখ্যাতদের কি সুখ!

কচি কিশোর মুখখানির পানে সস্নেহ দৃষ্টি ফেলে বলি—বেশ বাপু, তুমি চিনেছো-চিনেছো, পাড়াসুদ্ধু রটিয়ে বেড়াতে যেও না। তাহলে আমাকে আর তিষ্ঠোতে দেবে না কেউ!···অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে ছেঁকে ধরবে। মামার উপরোধে, মামার একটা কাজ করে দিতে এসেছি, কে জানতো বাপু, এখানে—এই গোবিন্দপুরেও তোমরা আমাকে চিনে বসে আছো!···চলো এখন—

—চলুন! বলে ছেলেটি এমন অমায়িক বিনীতভাবে আমার অনুসরণ করে, যেন গুরুর পিছনে শিষ্য!

যেতে-যেতেই দেখি, রাস্তা থেকেই একদল ওই বয়সের ছেলে জুটলো। সঙ্গে-সঙ্গে চলছে—যেন বাঘের পিছনে ফেউ!

এদের চোখে-মুখে বিস্ময় সম্ভ্রম আর কৌতূহলের চরম অভিব্যক্তি।

হরিপদ ঘোষালের বাড়ি খুব দূর নয়। ছেলেগুলো কেউ সঙ্গ ছাড়ে না, কোন্ ফাঁকে টুপটুপ করে ঢুকে পড়ে ওদেরই বাড়ি। বেরিয়ে আসেন স্বয়ং কর্তা, খেলার কথা তোলেন না, তোলেন কাজেরই কথা। অভ্যর্থনায় বিগলিত!

—আহা, এমন নইলে কুটুম্বু!

শহরের লোক কুটুম্বু-আদরের জানে কি! এ একেবারে কী আদরের ঘটা, কী খাওয়া-দাওয়ার তোয়াজ!

হে ভগবান, বিয়েটা যেন গেঁথে যায়।

মামার মেয়ের রূপের কথা তুলিই না, কেবল গুণের কথা পাড়ি।—কথাবার্তা পাকা করেই আনি। শুধু মেয়ে দেখাটি বাকী!

—আট রকম মাছের তরকারি আর ক্ষীর, মর্তমান কলা, সরতোলা ঘি, কাঁচাগোল্লা দিয়ে দাদখানি চালের ভাত ক'টি সেঁটে, শুয়ে পড়ি। সন্ধ্যের আগে ফেরার ট্রেন নেই।

ভালোই হলো!

এইসময় ছেলেক'টাকে দুটো গল্প-গাছা শুনিয়ে আরো অভিভূত করে দিই। অত আগ্রহ করে যখন এসেছে।

ডাকতে হয় না, সপার্ষদ 'মোহনলাল' (ওই নাম, হরিপদর ভাইপোর) ঘরেই হাজির। অতঃপর শুরু হয় তাদের যত-সব ছেলেমানুষী প্রশ্ন। কোথায়-কোথায়

খেলেছি আমি, প্রথম কবে 'কাপ্' পেয়েছি, এখনো বিলেত যাইনি কেন,…'বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায়' নামলে ফার্স্ট হবো কি না।

যথাসম্ভব গুছিয়ে উত্তর দিয়ে যাই—'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' করে। বহু প্রশ্নোত্তরের পর মোহনলালের বন্ধুরা তোড়জোড় করে ছোটে, অটোগ্রাফের খাতা আনতে।

বেরিয়ে আসেন স্বয়ং কর্তা, …অভ্যর্থনায় বিগলিত। [পৃঃ ২৯৭

—আর, আমি।

আমি গলদঘর্ম হয়ে, চিন্তা করতে থাকি। এই গোটা-আস্টেক ছেলের খাতায় কি লিখে দেবো!

যেমন একটা কেষ্ট-বিষ্টু ভেবেছে আমাকে, বড়মুখ করে আসছে, তেমনি বড়-দরের কিছু লিখে দেওয়া উচিত।

কিন্তু ভেবে উঠতে পারি না।

বড়-দরের কথা তো অবিরত শুনছি, দেখছি, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, পার্কের রেলিঙে, গ্যাসপোস্টের গায়ে, অথচ একটাও মনে আসছে না? আশ্চর্য!

উঃ, বিখ্যাত হওয়াও তো কম পরিশ্রম নয়! একাসনে দাঁড়িয়ে দুশো, পাঁচশো অটোগ্রাফ খাতায় সই করে যেতে, নিজের চক্ষেই তো দেখেছি।

কিছুক্ষণ পরে সাতটি রত্ন এসে হাজির। —খাতা হাতে।

অটোগ্রাফ খাতাই বটে! কারুর হাতে একটু খাতার ধ্বংসাবশেষ, কারুর হাতে শুধুই একটুকরো তেলচিটে কাগজ, কেউ-বা অঙ্ককষা হিজিবিজি খাতার মলাটটি খুলে ধরে।···হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল!

গাঁইয়া ভূত আর বলেছে কাকে!

কী আর করি! পাকা খেলোয়াড়ী-ঢঙে দিই ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে সই বসিয়ে! কেনই-বা দেবো না? কিসের ভয়? আমার নাম আমি সই করবো, একশো বার করবো! নিশ্চয়ই সে-রাইট্ আছে আমার। আমাদের বাড়ির গোয়ালাটা কি তার মা-বাপের দেওয়া—"রাজেন্দ্র পরসাদ" নামটা বদলে ফেলেছে? সই করতে জানলে, এ-নাম করতো না? "বুদ্ধু ভূতুম" বলে সই করতো?

শুধু মোহনলাল খাতা বার করে না। বলে, 'পরে নেবো'। অর্থাৎ একটু বিশিষ্ট হতে চায়।

কিছুক্ষণ পরে সাতটি রত্ন এসে হাজির। [পৃঃ ২৯৮

অনেক ভেবে-চিন্তে মনে-মনে পুরো দু লাইন কবিতা বানিয়ে ফেলি ওর জন্যে। হ্যাঁ, ওর দাবি আছে। তাছাড়া—সেইটুকু নিয়ে কী সুখের স্বপ্নেই না বিভোর থাকবে! ···হয়তো কত গৌরব করে দেখাবে বন্ধু-বান্ধবদের।···

আবার এক প্রস্থ ফল-খাবার!

কুমকুম

অতঃপর স্টেশনমুখো !

মোহনলালই তুলিয়ে দিতে যায়।···আমার পেটের মধ্যে কবিতার লাইন দুটো গজগজ করছে, যেতে-যেতে এক সময় ধাঁ করে বলে ফেলি—কই হে, তোমার অটোগ্রাফ খাতার কি হলো ?

—এই যে—সেই তার পেটেণ্ট হাসির আলো-ভরা মুখে একখানি খাতা দেখায়—ট্রেনে বসে লিখে দেবেন স্যার !

বাঃ ! চমৎকার খাতাখানি ! চামড়ার বাঁধাই, সোনার জলের বর্ডার।

ট্রেনে বসে খাতাখানি উলটে-পালটে বেশ একটু প্রশংসা করে, ধরে-ধরে গোটা-গোটা অক্ষরে লিখে দিই—"খেলায় তুমি বিশ্ব করো জয়—কোরোনা দ্বিধা, রেখোনা মনে ভয়"—দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। বেশ কেমন খেলোয়াড়-খেলোয়াড় ভাব ফুটেছে।

কি মিল, কি ছন্দ, কি অনুপ্রাস !

আর খেলোয়াড়ের উপযুক্ত উপদেশটিও হয়েছে ! একেবারে 'চার্মড' হয়ে যাবে ছেলেটা !

আমার লেখা শেষ হতেই, খাতাখানা চোখের সামনে তুলে ধরে মোহন হাসিমুখে পড়ে নেয় একবার, তারপর উচ্ছ্বসিত গলায় বলে—"কী চমৎকার হয়েছে স্যার, ঠিক আমার মনের কথাটি বলেছেন ! সত্যি, এইটাই বড় ইচ্ছে ছিল।···সেবারে কলকাতায় ভিড়ের মধ্যে মোটে আধলাইন লিখলেন—এই যে—এই পাতায়—বলেই চোরা এক হাসি হেসে আমার নাকের সামনে যা খুলে ধরে, তা দেখে চোখে সরষেফুল দেখি। সাদাপাতার মাঝখানে টানাহাতে কোনাকুনি করে লেখা—

"ভালোছেলে হও—"

শিশির সর্বাধিকারী

৬।৭।৫২

কুমকুম

জানি না গলার শব্দটা কোন্ সুর নিয়েছিলো !

জানি না কি বলে উঠেছিলাম !···শুধু এইটুকু মনে পড়ছে—নেহাত ফুটবল খেলার অভ্যাস আমার নেই বলেই ছেলেটা এ-যাত্রা বেঁচে গেল। না হলে—ট্রেন থেকে ছিটকে, কোন্ কচুবনে গিয়ে পড়তো কে জানে !

শুধু খাতাখানাই যায় সে পথে !

—আহা, আহা···ওকি স্যার—ট্রেন থেকে নেমে পড়ে হতভাগা বিচ্ছু ! নীচে দাঁড়িয়ে খ্যাক্‌শেয়ালের মতো খ্যাক-খ্যাক করে হেসে বলে—অপরাধ নেবেন না স্যার—বন্ধুগুলোকে কিন্তু খুব ঠকিয়েছি, ধরতে পারেনি। পারবে কেন, বুদ্ধিসুদ্ধির বালাই তো খুব বেশী নেই, অবিশ্যি—আপনার সাহায্যটাও কাজে লাগলো !···এতটা আশা করিনি—মনে থাকবে চিরকাল।···আর দেখাও তো হচ্ছে বিয়ের সময়, দাদার শ্যালা হবেন তো আপনি·····

ট্রেন নড়ে ওঠে !

বিয়ের ভাংচি দেবার যত রকম পন্থা আছে, সবগুলো মনে-মনে মুখস্থ করতে থাকি, তেইশ-মাইল পথ সমানে।

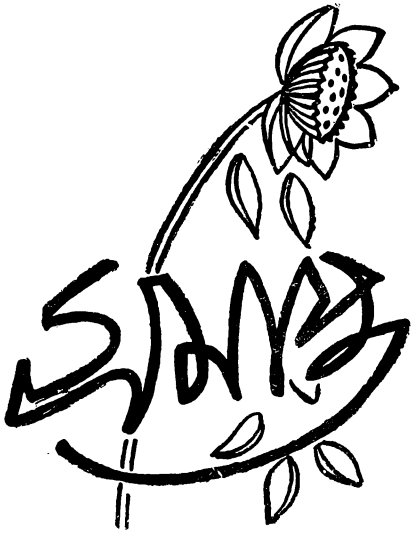

যে সব বই হাতে পেলে ছেলেরা আর কিছু চায় না, তেমনি কয়েকখানি বই !!!

● অ্যাড্‌ভেঞ্চার ●

দৃষ্টিহীনের

মরণদূতের আনাগোনা	...	২·০০
বটকালীর জঙ্গলে	...	২·০০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

হিমালয়ের ভয়ঙ্কর	...	১·২৫
দেড়শো খোকার কাণ্ড	...	১·২৫
অমানুষিক মানুষ	...	১·৫০
সাজাহানের ময়ূর	...	১·৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রক্তমুখী ড্রাগন	...	১·২৫
বিষের তীর	...	১·২৫

দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

ডাকাতের মুখোমুখী	...	১·০০
তেপান্তরের মাঠ	...	১·০০

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দৌলতখানা	...	১·২৫
শতবর্ষ পরে	...	১·৫০
শয়তানের ঘাঁটি	...	১·২৫

● রূপকথা ●

ঠাকুরমার ঝুলি	...	৩·০০
ঠানদিদির থলে	...	৩·০০
পুরনো দিনের পুরনো গল্প	...	৩·০০
ঠাকুরমার গল্প	...	১·০০

● হাসির গল্প ●

হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে	...	৩·০০
জন্মদিনের উপহার	...	৩·০০
যত হাসি ততই মজা	...	৩·০০
হাসির এ্যাটম বোম	...	৩·০০
হাসির টেক্কা	...	৪·০০

● ভৌতিক গল্প ●

ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা	...	৩·০০
রাক্ষস খোক্কস	...	৩·০০
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প	...	২·৫০

● শিকার কাহিনী ●

বাঘ ভালুকের দেশে	...	৩·০০
বনে জঙ্গলে	...	৩·০০
শিকারের গল্প	...	১·৫০

এমনি আরও অসংখ্য বই

চিঠি লিখলে বিনা মূল্যে পুস্তক তালিকা পাঠান হয়।

দেব সাহিত্য কুটীর * ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

● ছবির সাহায্যে গল্প ●

ছবিতে বিবেকানন্দ

মধুসূদন মজুমদারের লেখা মাত্র এক টাকা

- ছবিতে মৃত্যুহীন প্রাণ (বিদ্যাসাগর) ২·00
- ছবিতে অ্যাড্‌ভেঞ্চার (দেব সাহিত্য কুটীরের) ৪·00
- খাপে ঢাকা তরবার ও রক্তমাখা চাঁদ (ময়ূখ চৌধুরীর) ১·৫০
- হাসির এ্যাটম বোম (শিবরাম চক্রবর্ত্তীর) ৪·00

এ সমস্ত বইতে ছবির সাহায্যে গল্প বলা হয়েছে।

অ্যাড্‌ভেঞ্চার

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

তাতারের বন্দী ... ১·৫০
দেশ-বিদেশের হীরে জহরৎ ১·২৫
ঝিলে জঙ্গলে ... ১·২৫

● **যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত** ●

অজানা দেশে ... ১·৫০

● **রমেশ দাস** ●

অজ্ঞাত দেশ ... ১·৫০

● **অখিল নিয়োগী** ●

ঘূর্ণীপাকে ... ১·২৫

● **সুধীন্দ্রনাথ রাহা** ●

পাথরের পদ্মফুল ... ১·৫০

● **শচীন মজুমদার** ●

হারানো দিন ... ১·২৫

● **শৈলবালা ঘোষজায়া** ●

রঘু সর্দার ... ১·৫০

● **প্রভাসচন্দ্র ঘোষ** ●

দুর্গমের বিভীষিকা ... ১·০০

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

● হাসির বই ●

- হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে ... ৩·০০
- যত হাসি ততই মজা ... ৩·০০
- জন্মদিনের উপহার ... ৩·০০
- হাসির টেক্কা ... ৪·০০
- হাসির ফোয়ারা ... ৪·০০
- উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ১·২৫

● রূপকথা ●

- ঠাকুরমার ঝুলি ... ৪·০০
- ঠানদিদির থলে ... ৪·০০
- পুরানো দিনের পুরানো গল্প ৩·০০
- ঠাকুমার গল্প ... ১·০০

ছোটদের মাসিক

শুকতারা

প্রতি সংখ্যা—·৬০ পয়সা
বার্ষিক চাঁদা—৬·০০
ষান্মাসিক চাঁদা—৩·০০

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত

নূতন সংস্করণ—১৯৭০

বিশ্ব পরিচয়

সর্বপ্রকার জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ

ছয় শত পৃষ্ঠার উপর

পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও ভৌগোলিক বিবরণ

=অসংখ্য চিত্রে সুশোভিত=

পনের টাকা

নূতন বাহির হইল

একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ

মানচিত্রে ইতিহাস

অফসেটে ছাপা

রঙিন মানচিত্র ও ছবির মাধ্যমে পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত

বিশ্বের ইতিহাস

=স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যাবশ্যক=

ছয় টাকা

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প

নরওয়ে, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসের সংকলন

=প্রতিকৃতিসহ ঔপন্যাসিকদের জীবনকথা-সংবলিত=

চার টাকা

বিদেশী গল্প-চয়ন

পৃথিবীর নানা দেশের নাম-করা ঔপন্যাসিকের

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বারোটি বাছাই করা উপন্যাসের সহজ সরল অনুবাদ

চার টাকা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

চিত্রে জয়দেব

ছয় টাকা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস

পাঁচ টাকা

রাধানাথ চৌধুরী সম্পাদিত

পদ্মাপুরাণ

বা

মনসামঙ্গল

ছয় টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

দেব সাহিত্য কুটীর